ভবের খেলা।

(অপূর্ব্ব সংসার-চিত্র)

আখ্যায়ক

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

---

৬৭ নং নিমুগোস্বামীর লেন,

শ্রীচৈতন্য পুস্তকালয় হইতে

শ্রীশিবশঙ্কর ব্রাদার্স-কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

বাণীপ্রেস;

৬৩ নং নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জে, এন্, দে দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৮ সাল।

উৎসর্গ।

ভবসংসারের পালন-কর্ত্তা

শ্রীশ্রীনারায়ণ জীউর

শ্রীচরণকমলে

এই

"ভবের খেলা"

ভক্তিভাবে সমর্পিত হইল।

মুখবন্ধ।

ভব-সংসারের নাগরদোলা নিত্য নিত্য কেমন ঘুরিতেছে, কেমন দুলিতেছে, সংসারের মানব-ভাগ্য কেমন পরিবর্ত্তিত হইতেছে, মানব-চরিত্র কেমন আশ্চর্য্য-প্রকারে সংগঠিত ও চূর্ণীকৃত হইতেছে, এই পুস্তকে প্রত্যেক বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া তাহা একে একে বর্ণিত হইয়াছে। ধর্ম্মশীলের ধর্ম্ম-চরিত্র ধর্ম্মের সঙ্গে গাঁথা, তাহা বুঝাইবার আড়ম্বর করা বাহুল্য। দুষ্ট লোকের চাতুরী, প্রবঞ্চনা, ছলনা, বিশ্বাসঘাতকতা ও হিংসা-বিদ্বেষ কতদূর পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে, ধর্ম্মবিপ্লবে ও সমাজবিপ্লবে বঙ্গদেশে কিরূপ দুর্দ্দিন উপস্থিত হইতেছে, সমাজ-তত্ত্বপিপাসু, সাহিত্যানুরাগী পাঠক মহাশয়েরা এই পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে তাহার অনেকদূর তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। মাননীয় গ্রন্থকার এই পুস্তকে পদে পদে ধর্ম্মাধর্ম্মের যেরূপ চিত্র দেখাইয়াছেন, তাহা যদি বিশেষ তত্ত্বদর্শিক পাঠক মহাশয়দিগের মনোগত ভাবের সহিত ঐক্য হয়, তাহা হইলে আমরা আশা করি, তাঁহারা এই সকল সামাজিক ঘটনার সাক্ষী হইয়া থাকিবেন।

বিজ্ঞাপনে বহ্বাড়ম্বর নিতান্ত দূষণীয়, আমরা সেরূপ আড়ম্বর করিতে ইচ্ছা করি না, পুস্তকখানি ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে, আমরা তাহার বিচারকর্ত্তা নহি, তবে কেবল এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ইহার অঙ্গসৌষ্ঠব পূর্ণ করিবার জন্য

আমরা যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছি; সে যত্ন কতদূর সফল হইয়াছে, আমরা তাহা বলিতে পারি না, পাঠক মহাশয়েরাই বিচার করিবেন। সাগ্রহে আমাদের অনুরোধ এই যে, সুবিজ্ঞ পাঠক মহাশয়েরা ঔদাস্য না করিয়া ইহার প্রত্যেক চিত্রে এক একবার অভিনিবেশ পূর্ব্বক দর্শন করিয়া আমাদের বর্ত্তমান সমাজের প্রকৃতির সহিত মিলাইয়া দেখিবেন। এতৎ পাঠে যদি কাহারও কিছুমাত্র প্রীতি অনুভূত হয়, সমাজের কিছুমাত্র উপকার করিবার আশা থাকে, তাহা হইলে আমরা আমাদের সমস্ত যত্ন ও শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

শ্রীশ্রীচৈতন্য পুস্তকালয়,
শ্রাবণ, ১৩১৫ সাল।

প্রকাশক
শ্রীশিবশঙ্কর ব্রাদার্স।

প্রথম খণ্ড।
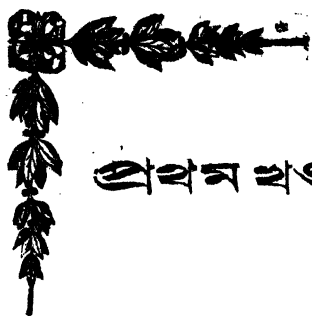
ডাইমনকুমারী নতুন বাবুর আগমনপ্রতীক্ষায় দণ্ডায়মানা।—১১১ পৃষ্ঠা
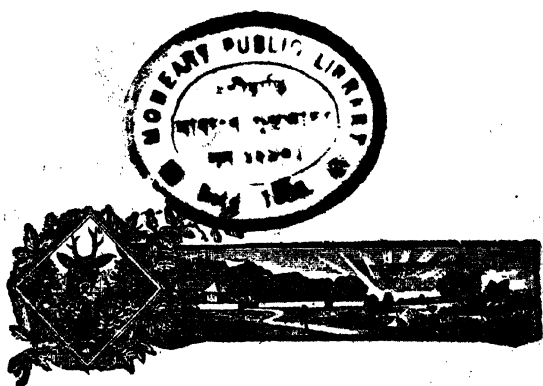
ভবের খেলা।

প্রথম কল্প।

একটী সংসার।

হরকান্ত রায় হলধরপুরের ভূম্যধিকারী। নানা স্থানে নানা জাতির নামের সঙ্গে রায় উপাধিসংযুক্ত দেখা যায়, সুতরাং হরকান্তবাবুর জাতির পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। হরকান্তবাবু ব্রাহ্মণ,—কৌলিণ্যমর্য্যাদা আছে, কিন্তু কুলভঙ্গের পর সাত আট পুরুষ নামিয়া আসিয়াছে, মর্য্যাদায় আর ততটা গৌরব নাই। তাঁহাদের বংশের উপাধি চট্টোপাধ্যায়। হরকান্তের প্রপিতামহ নবাব-সরকারে চাকরী করিতেন, চাকরীর গৌরবে রায় উপাধি হইয়াছিল, তদবধি চারি পুরুষ সেই উপাধিতেই পরিচিত;

দলিলপত্রেও এখন আর চট্টোপাধ্যায় লেখা থাকে না, রায় উপাধিতেই বিষয়কার্য্যের সমস্ত কাগজপত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

হরকান্তবাবু বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ, সমাজ-প্রচলিত সমস্ত সৎকার্য্যে তাঁহার গাঢ় অনুরাগ, শাস্ত্রীয় বচনে তাঁহার অকপট শ্রদ্ধা, স্বধর্ম্মে পরমানিষ্ঠা। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ, এই কথা বলা হইয়াছে, ইহাতে পাঠক মহাশয় যেন এমন মনে না করেন যে, গোঁড়া বৈষ্ণবদিগের ন্যায় তিনি শক্তিভক্তিবিবর্জ্জিত। গোঁড়া বৈষ্ণবেরা শক্তির নামে অভক্তি জানায়, কেবল তাহাই নহে, শক্তিপূজার জবাফুল ও বিল্বপত্রের নামেও তাহাদের ঘৃণা। হরকান্ত রায় সে ধরণের বিষ্ণুভক্ত ছিলেন না, তাঁহার বাটীতে বৎসর বৎসর দুর্গাপূজা হইত; ছাগাদি পশু বলি হইত না, এইমাত্র বিশেষ।

বাড়ীখানি সাবেক ধরণের;—দুই মহল,—অন্দর মহল ইষ্টক-নির্ম্মিত একতালা, ঘরগুলি নীচু নীচু; তালকাষ্ঠের কড়ি-বরগা, অথচ বিলক্ষণ মজবুত। সদর মহলে পূর্ব্ব দক্ষিণে উচ্চ উচ্চ মাটীর প্রাচীর, পশ্চিমে অন্দর মহলে ইষ্টক-প্রাচীর, উত্তর-দিকে মাটীর প্রাচীর দেওয়া চণ্ডিমণ্ডপ, প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে বৃহৎ আটচালা।

চণ্ডিমণ্ডপের উভয় পার্শ্বে দুইটী তুলসীমঞ্চ; মঞ্চোপরি সুপল্লব-শোভিত তুলসী-কানন; প্রতিদিন প্রাতঃকালে তুলসী-বৃক্ষের পূজা হয়, সায়ংকালে ধূপ-দীপ জ্বালিয়া আরতি হয়, সমস্ত রাত্রি ঘৃত-প্রদীপ জলে। আটচালার ঈশানকোণে মণ্ডলাকার বেদিবাঁধা একটী বিল্ববৃক্ষ; শরৎকালে মহামায়ার আগমনে সেই বিল্ববৃক্ষতলে বোধন হয়। দক্ষিণদিকে প্রাচীরের কোলে কোলে পাঁচটী নারিকেল বৃক্ষ।

বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে হরকান্তবাবু প্রথম দারপরিগ্রহ করেন; তখন তাঁহার পিতা-মাতা বর্ত্তমান ছিলেন না, তিনিই সংসারের একমাত্র কর্ত্তা। তাঁহার আর অন্য সহোদর ছিল না, সংসারে তাঁহার একটী বিধবা ভগ্নী, একটী বিধবা পিসী; পিসীর তিনটী পুত্র, চারিটী কন্যা; ভগ্নিটীর কেবল একটীমাত্র পুত্র। পরিবারের মধ্যে এই, তদব্যতীত দাসী, চাকর ও গরুর রাখাল পাঁচ সাতজন। হরকান্তের প্রতি তাঁহার পিসীমার পুত্রতুল্য স্নেহ; নববধূ বাটীতে আগমন করিলে পিসী-মা পরম সমাদরে সেটীকে কোলে করিয়া লইয়াছিলেন। কোলে করিবার যোগ্যকন্যা। বর জমীদার, কন্যাটীও জমিদারের দুহিতা। পরমাসুন্দরী, সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা, মুখখানি হাসি হাসি, সর্ব্বসুলক্ষণা। কন্যার নাম পদ্মরাণী, বয়স অনুমান দ্বাদশবর্ষ।

বিবাহের পাঁচ বৎসর পরে পদ্মরাণী একটী পুত্রসন্তান প্রসব করেন, পুত্রের জন্মোৎসবে মহা সমারোহ হইয়াছিল; অন্নপ্রাশনের সময় সেই পুত্রের রাশিনাম হয় কালীচরণ, ডাকনাম সূর্য্যকান্ত।

সূর্য্যকান্তের যখন পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম, সেই সময় হরকান্তের আর একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহার রাশিনাম নীলকান্ত, ডাকনাম চন্দ্রকান্ত।

সংসারের সকলেই শিশু দুইটীকে ভালবাসে, আদর-যত্ন করে, তাহাদের অঙ্গে একটু ধূলা লাগিলে সকলে একত্র হইয়া হাস্য করিতে করিতে "ধূলায় ধূসর নন্দকিশোর" বলিয়া অঙ্গ মুছাইয়া দেয় সাদরে চুম্বন করে, দুজনে দুটীকে কোলে করিয়া লয়।

আদর-যত্নে সুখভোগে শিশুদুটী বড় হইতে লাগিল; জ্যেষ্ঠের বয়স দশ বৎসর, কনিষ্ঠের বয়স পাঁচ বৎসর। বালকেরা বাল্য-ক্রীড়ায় রত হয়, কিন্তু ঐ দুটী বালক কোনপ্রকার বাল্যক্রীড়া করে নাই; শিশুকাল হইতেই তুলসীপূজা শিখিয়াছিল, নিত্য নিত্য তুলসীবৃক্ষে জল দিত, পুষ্প চয়ন করিয়া মঞ্চোপরি পুষ্পাঞ্জলি দিত, সন্ধ্যাকালে মঞ্চতলে প্রণাম করিয়া মাতা-পিতার উপদেশ-মত মধুরস্বরে হরিগুণগান করিতে করিতে করতালি দিয়া নৃত্য করিত, ইহাই তাহাদের বাল্যখেলা। বলিয়া রাখা উচিত, স্বামীর দৃষ্টান্তে পদ্মরাণীও অকপট হরিভক্তিপরায়ণা। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির ধর্ম্মানুরাগ অধিক; পক্ষপাতশূন্য হইয়া বলিতে হয়, হরকান্ত অপেক্ষা পদ্মরাণীর হৃদয়ের ভক্তি অধিক প্রবলা।

যে বৎসর চন্দ্রকান্তের জন্ম হয়, সেই বৎসর শ্রীপঞ্চমীর দিন সূর্য্যকান্তের হাতে খড়ি হইয়াছিল, সূর্য্যকান্ত তদবধি স্থানীয় গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় লেখাপড়া শিক্ষা করিতেছিল, তখনকার ব্যবহার মত তাল পাতা কলা পাতা শেষ করিয়া কাগজ ধরিয়াছিল, শুভঙ্করী অঙ্ক অনেক শিখিয়াছিল, হাতের লেখাও মন্দ হয় নাই। বিবাহের সভায় হেঁয়ালী ধরিত ঃ—

"আছিল দেউল এক বিচিত্র গঠন,
ক্রোধ করি ভেঙে ফেলে পবন-নন্দন,
অর্দ্ধেক পঙ্কেতে তার, তেহাই সলিলে,
দশম ভাগের ভাগ শেয়ালার তলে,
উপরে বায়াহ্ন গজ আছে বিদ্যমান,
করহ সুবোধ শিশু দেউল প্রমাণ।"

এই হেঁয়ালীতে সূর্য্যকান্ত অনেক বিবাহ-সভায় জয়লাভ করিয়াছিল, সকলের কাছেই বাহাদুরি পাইয়াছিল।

পঞ্চম বর্ষে চন্দ্রকান্তের হাতেখড়ি। বুদ্ধিমান বালক এক মাসের মধ্যে বর্ণপরিচয় করিয়া ফলা বানান লিখিতে আরম্ভ করিল। পর বৎসরে সূর্য্যকান্তের উপনয়ন হইল; পিতার আগ্রহে পুরোহিত মহাশয় প্রত্যহ আসিয়া প্রাতে ও সায়ংকালে নবীন ব্রহ্মচারীকে সন্ধ্যাবন্দনা, শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা, লক্ষ্মীপূজা ও গণপতিপূজা শিখাইয়া যাইতে লাগিলেন। তখনকার দিনে, বিশেষতঃ ধার্ম্মিকের সংসারে উপনয়ন হইলে, শাস্ত্রপ্রমাণে সর্ব্বদা শুদ্ধাচারে থাকিতে হইত। সূর্য্যকান্ত সর্ব্বদা শুদ্ধাচারে থাকে; চারি পাঁচবার বস্ত্র পরিবর্ত্তন, চারি পাঁচবার হস্ত-পদ-মুখ-প্রক্ষালন, অবকাশমতে গায়ত্রী পাঠ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে সূর্য্যকান্ত অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। চন্দ্রকান্তের উপনয়ন হয় নাই, বয়স ছয় বৎসর মাত্র, তথাপি অগ্রজের দেখা দেখি, চন্দ্রকান্তও অনেক শুদ্ধাচার শিখিল।

হরকান্তবাবুর সংসারে যাঁহারা যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের সকলেরই সমান ধর্ম্মনিষ্ঠা,—দেব, দ্বিজ, গুরুভক্তি, অতিথি-সেবা ও যথাসম্ভব দানধর্ম্মে সকলেই নিরত। বাড়ীর কর্ত্তা দাতা, ভোক্তা ও ধর্ম্মপরায়ণ হইলে পরিবারের সকলেই তাঁহার অনুকরণ করিতে যত্নবান হয়। এই পরিবারে সেই দৃষ্টান্ত সকলেই দর্শন করেন; এক একজন অর্দ্ধ নাস্তিক তাহা দেখিয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করে; সূর্য্যকান্তের বারবার বসন পরিবর্ত্তনের কথা তুলিয়া একজন নাক বাঁকাইয়া বলিয়াছিল, অতটা পিট্-পিটে হওয়া অনেক পাপের ফল; যেখানে বেশী বাঁধাবাঁধি, সেইখানেই

বেশী গোলমাল; অমুক ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর বড় বড় ছেলেরা দিন দিন পাঁচবার কাপড় ছাড়া দূরে থাকুক, এক কাপড়ে পাঁচ সাত দিন কাটায়। নিন্দুকের কথা হইলেও বড় দুঃখে স্বীকার করিতে হয়, যুগধর্ম্মে আজকাল অনেক স্থলে ঐরূপ ও অন্যরূপ বহুবিধ অনাচার প্রবেশ করিয়াছে।

জগদীশকে ধন্যবাদ, হরকান্ত বাবুর সংসারে তখনও পর্য্যন্ত একটীও অনাচার প্রবেশ করে নাই। সংসারে সুখ-শান্তি বিরাজমান, পরস্পর বিবাদ-কলহ কিছুই হয় না, ছেলেতে ছেলেতে ঝগ্‌ড়া হয়, এ সংসারে তাহাও নাই। অধিক শ্লাঘার কথা, কেহ কাহারও প্রতি কদাচ কটূক্তি করে না; এমন কি, নীচ লোকের প্রতিও কটু কথা প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ। হরকান্ত বাবু বলিয়া দিয়াছিলেন, কটুকথা মুখে আনা মহাপাপ; পুরাণে লেখা আছে, অপর ব্যক্তিকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া কটুকথা যাহারা বলে, পরজন্মে তাহাদিগকে বিষ্ঠাভোজী শূকরকুলে জন্ম লইতে হয়। হরকান্তবাবু কেবল মুখে যদি ঐ কথা বলিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় ততটা শুভফল হইত না, শাস্ত্রের দোহাই দিয়াছিলেন বলিয়া সকলেই ভয় পাইয়াছিল।

হরকান্তবাবুর সুখের সংসার; ছেলেদুটী গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় শিক্ষালাভ করিতে লাগিল, পরিবার মধ্যে শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল, বৎসরের মধ্যে পর্ব্বোৎসব ও ক্রিয়াকলাপ যথোপযুক্ত সমারোহে সম্পাদিত হইতে-লাগিল, কর্ত্তা মনের সুখে দেবার্চ্চনায় ও পাত্রবিশেষে দানব্রতে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া রহিলেন।

দ্বিতীয় কল্প।

তোমাদের বিচার ভাল !

হলধরপুর গ্রামে একজন শিক্‌দার ছিলেন, তাঁহার নাম গদাই শিক্‌দার ; জাতিতে আচার্য্য ব্রাহ্মণ, কিন্তু ব্যবহার অতি জঘন্য। জঘন্য ব্যবহারে যাহারা আমোদ অনুভব করে, তাহারা প্রায় প্রতিদিন বৈকালে শিক্‌দারের চণ্ডিমণ্ডপে জমায়েত হইয়া, দুই তিন প্রকারের হুঁকা ফুঁকিত, প্রতিবাসী লোকের গ্লানি করিত, কাহারও কাহারও কুলবালার নামে কলঙ্ক চড়াইয়া একঘরে করিবার মন্ত্র পাঠ করিত, দলে দলে বসিয়া পাশা খেলিত, আর আর যাহা যাহা করিত, তাহা ভদ্রলোকের কর্ণে তুলিয়া দিতে লজ্জা হয়। মুরুব্বি ধরণের এক একজন লোক আর্য্য-সমাজের দুই চারিটী রঙ্গের কথা উত্থাপন করিয়া হাস্যের তুফানে মা দুর্গার মণ্ডপটীকে কাঁপাইয়া দিত।

একদিন বৈকালে ঐ স্থানে ঐ দলের পাঁচ সাতজন জমা হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের প্রসঙ্গ তুলিয়াছিল। একজন বলিয়াছিল, জগন্নাথক্ষেত্র উৎকলে আছে, আজকাল আমাদের এ অঞ্চলেও স্থানে স্থানে ছোট ছোট জগন্নাথক্ষেত্র হইতেছে, জাতি-বিচার উঠিয়া যাইতেছে, ব্রহ্মজ্ঞানের ধুয়া ধরিয়া সকল জাতিই সকল জাতির সঙ্গে স্বচ্ছন্দে ভোজন করিতেছে, সকল জাতির কন্যার সহিত সকল জাতির পুত্রের আদান প্রদান চলিতেছে, কোন স্থলে মাল্য বদল বিবাহ, কোন কোন স্থলে নিকা। একপ্রকার

চলিতেছে ভাল। এইরূপ হওয়াই উচিত। ঈশ্বরের রাজ্যে সকলেই সমান, তাহার ভিতর ছোট বড়, নীচ উচ্চ ভেদ করিয়া, অপরকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, অবজ্ঞা করিয়া আপনাদের অভিমান ও গর্ব্ব প্রকাশ করা নিতান্ত দাম্ভিকতা; ঐরূপ ভেদাভেদে কেবল হিংসা প্রকাশ পায়, পরস্পরের ঐক্য কমিয়া যায়, পরের মনে দুঃখ দেওয়া হয়।

আর একজন বলিল, ঠিক বলিয়াছ দাদা? আর এক ছিলিম তামাক প্রস্তুত করিতে হুকুম দাও। পাঠক মহাশয়, এই তামাক প্রস্তুতের অর্থ কিছু বুঝিলেন?—যাহারা গাঁজা খায়, তাহারা গাঁজাকে গাঁজা বলে না,—তামাক বলে;—সত্য যাহারা তামাক খায়, তাহারা তাহাদের কাছে তামাক খাইতে চাহিলে গাঁজা-খোরেরা যদি শোনে গুড়ুক, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই গুড়ুক-খোরকে মুদীর দোকানে তাড়াইয়া দেয়।

গাঁজা প্রস্তুত হইল, বোম কেদার বলিয়া সকলে দম মারিয়া গাঁজা টানিল, মজলিস্ গরম। শ্রোতার মুখে যিনি দাদা হইয়াছিলেন, তিনি দুই তিনবার গলা শাণাইয়া, কালয়াতি আওয়াজে অথচ মিহিসুরে রাগিণী ধরিলেন, ব্রাহ্মণের ছেলেরা পইতা ফেলিয়া চাষার দলে মিশিতেছে, চাষারা আমোদ করিয়া তাহাদিগকে নরকে পাঠাইবার ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করিতেছে; কোন কোন জাতি সেই আহ্লাদে আপনারা পইতা পরিবার নজীর যোগাড় করিতেছে। ইহা হইলেও মন্দ হয় না;—ব্রাহ্মণ জাতির দর্পটা সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ হয়।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, সেটা কিন্তু ভাল হয় না। যাহাদের পুরুষানুক্রমে পইতা আছে, তাহারা যদি ফেলে, তবে ত

আপনারাই আপনাদের অভিমান ত্যাগ করে, অন্য অন্য জাতির মান বাড়ায়, সেটা কি ভাল, সেইত ভেদাভেদ রহিয়া গেল ; তবে আর মাথামুণ্ডু কি হইল ? হাঁ, ভাল কথা মনে পড়িল। শুন, বলি মজা। সাত আট মাসের কথা, একজন কুলীন কায়স্থের পুত্র—নামটা কি ভাল—হাঁ হাঁ—নসীরাম মিত্র,—ইংরাজি কলেজে তিনটে পাশ ;—সেই নসীরাম মিত্র, আমার কাছে গল্প করিয়াছিল, সে একদিন কলিকাতার মানিকতলার রাস্তা দিয়া দক্ষিণ মুখে যাইতেছিল, রাস্তার পশ্চিম ধারে দেখিতে পায়, একটা মাঠে সামিয়ানা খাটানো, অনেক লোকের মজলিস্, মজলিসের সব লোক ফরসা ফরসা পোষাক পরা মুসলমান ; সেদিন সেখানে তাহাদের খুব জাঁকালো খানার আয়োজন ; বাতাসের সঙ্গে খানার সুগন্ধ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত ; নসীরাম লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া, নিকটের একখানা দরজির দোকান হইতে চারি পয়সার দামের একটা সাদা টুপি কিনিয়া, বাঁকা করিয়া মাথায় দিয়া মজলিসে গিয়া বসিল, একসঙ্গে খানা খাইল। নসীরাম আমাকে স্পষ্টই ঐরূপ পরিচয় দিয়াছিল, বেশীর ভাগে বলিয়াছিল, খানার সমস্ত সামগ্রীই সুপক—উৎকৃষ্ট, কেবল গোমাংসটা কিছু শক্ত শক্ত—যেন দড়ি দড়ি।

গল্প শেষ করিয়া সেই লোকটী সর্ব্বাঙ্গ সঞ্চালন পূর্ব্বক দম্ভ করিয়া বলিল, শুন্‌লে দাদা ! ইহার উপর আর কি চাও ?

দাদা বলিলেন, এখন আর নূতন কিছুই না ; তবে কি না, সব জায়গায় অতটা না হ'ক, অনেক দূর অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। এই আমাদের নিজের কথাই ধর না, আমাদের ঘরে ঘরে কু-কু—কু প্রায় সর্ব্বদাই চলে। পাড়াগাঁয়ে তবুও অনেকটা

সাবধান, সহরে সরুপট্। একবার আমি সহরে তালতলা অঞ্চলে এক বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্যের বাটীতে গিয়াছিলাম, বিদ্যারত্ন মহাশয় একটা সরকারী কলেজের অধ্যাপক; বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম, সদরের উঠানে কু-ক্কু-কু চরিয়া বেড়াইতেছে, প্রাচীরের একধারে বড় বড় আট দশটা খাঁচা; তাহার ভিতর কু-ক্কু—কুর বিলক্ষণ বংশ-বৃদ্ধি। বৈঠকখানায় বসিয়া সেই দিকে আমি চাহিয়া আছি, ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া গম্ভীর বদনে বলিলেন, এত করিয়া বারণ করি, বেটারা কিছুতেই শুনে না; সইস্ কোচম্যানেরা ঐ সকল খাঁচা এই-খানেই আনিয়া রাখিয়াছে। সহিস কোচম্যানের মাথার উপর বোঝা চাপাইবার ইচ্ছায় তিনি যাহাই বলুন, তিনি নিজে সেই সকল রামপাখী উদরস্থ করেন, তাঁহার পুত্রেরা ইংরাজি পড়ে, তাহারাও প্রসাদ পায়, তাহা বুঝিতে আমার আর বাকী রহিল না। এ দেশে ইংরাজের অধিকারে দিন দিন ক্রমে ক্রমে ইংরাজি সভ্যতা আসিয়া প্রবেশ করিতেছে, দেখা দেখি আমরাও বিলাতি সভ্যতার ছায়ায় হাত পা ছড়াইয়া বিশ্রাম করিতেছি, আমাদের বংশধরেরা আমাদের অপেক্ষা অতি কম বিশগুণ সভ্য হইয়া উঠিতেছে; উত্তরোত্তর যত বংশ বৃদ্ধি হইবে, ততই সভ্যতার উজ্জ্বল আলোকমালায় দেশ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। তাহা না হইলে আমাদের এই অসভ্য দেশে শ্রীবৃদ্ধি হইবে না। তবে—তুমি যে নসীরামের ইতিহাস বলিলে, সেরূপ দৃষ্টান্ত এখনও কিছু কম। তথাপি স্থানে স্থানে অন্বেষণ করিলে সে রকম অনেক নসীরাম দেখিতে পাওয়া যায়।

আর একজন বলিয়া উঠিল, চুপ কর দাদা, আমার একটা

আসল কথা বলিবার আছে। সেই কথা বলিবার জন্যই আজ আমার এখানে আসা। আমাদের গ্রামের হরকান্ত রায় সেই সে-কেলের ধরণের বর্ব্বর লোক। কেবল ঠাকুর পূজা, তুলসী পূজা, তিলক সেবা, মালা জপা, এই সকল লইয়াই দিন কাটায়। ভণ্ডামী দেখিয়া আমার অঙ্গ জ্বালা করে। একটা কচি ছেলে, তার গলায় পইতা দিয়া লোকটা তাহার পরকাল খাইতেছে, আপনার দলে মিশাইয়া লইবার চেষ্টা পাইতেছে। বাড়ীর মেয়ে-গুলো পর্য্যন্ত এক কূপের ভেক। সে রকম লোক গ্রামে থাকিলে অল্প দিনের মধ্যেই গ্রামখানা ছারেখারে যাইবে।

হাস্য করিয়া দাদা বলিলেন, তুমি হরকান্তকে দেশ ছাড়া করিতে চাও না কি ?

লোকটী বলিল, সে আছে জমিদার লোক, আমরা আছি গরীব লোক, তাহাকে দেশ ছাড়া করা আমাদের সাধ্য হইবে না। তবে কি না—তবে কি না—বুঝ্‌লে দাদা,—তবে কি না, সেই লোকটাকে আমাদের দলভুক্ত করিতে পারিলে, তাহার পেটের ভিতর বিলাতী সভ্যতা ঢুকাইয়া দিতে পারিলে, গ্রামেরও মঙ্গল হয়, আমাদেরও বিস্তর সুবিধা হইয়া দাঁড়ায়। মৌতাতের জন্য আর ভাবিতে চিন্তিতে হয় না, উদর-দেবতার পূজাতেও ষোড়শোপচারে ব্যবস্থা হইয়া উঠে।

একমনে শ্রবণ করিয়া মুরুব্বিয়ানা ধরণে দাদা বলিয়া উঠিলেন, ঠিক বলিয়াছ ভাই! কল্যই আমি সহস্র কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হরকান্তের বাড়ীতে আগে যাইব, তাহাকে কাণে ধরিয়া বুঝাইব; পাদরী সাহেবেরা যেরূপে এ দেশের মেষপালকে প্রভু যীশুর মহিমা বুঝায়, সেইরূপে তাহাকে

আমি বুঝাইয়া পড়াইয়া সায়েস্তা করিয়া লইব, তাহার হরি বলা ঘুচাইব!

পশ্চাৎ হইতে আর একজন সম্মুখ দিকে একটু সরিয়া আসিয়া, দাদার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া, ভঙ্গীক্রমে হাসিয়া হাসিয়া বলিল, দাদা! তুমি কি হিরণ্যকশ্যপ হইতে চাও?

ক্রোধে কম্পিত হইয়া, দাদা বলিয়া উঠিলেন, দূর শালা! আমি কি দত্তি না কি? পুরাণ শাস্ত্রের সে সকল গাঁজাখোরি কথায় আমি ভ্রুক্ষেপ করি না। আমি যখন—

তাহাকে আর বলিতে না দিয়া দ্বিতীয় বক্তা বলিল, মাটী করিলে দাদা, মাটী করিলে! সব নেশা ছুটিয়ে দিলে! আমরা আপনারা যে কাজ করি, সেই কাজের কথা তুলে আমাদের সকলকেই তুমি গালাগালি দিলে! আচ্ছা, আর একবার চম্‌কে নিতে হচ্চে।

গাঁজাখোরেরা আর একদম গাঁজা টানিল! চক্ষু ঝিমাইয়া আসিল, কাহারও কাহারও স্বরবদ্ধ হইল, এক একজন প্রায় অর্দ্ধ উলঙ্গ হইয়া, চক্ষু বুজিয়া সজোরে দুই হাত দিয়া উরুদেশ চুলকাইতে আরম্ভ করিল। গতিক ভাল নয়। দাদা গাত্রোত্থান করিয়া মিহি সুরে বলিলেন, আজ তবে তোমরা ঘরে যাও, প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কল্য প্রাতঃকালেই আমি হরকান্তের নূতন দীক্ষার মন্ত্রপাঠ করিতে যাইব। এই বলিয়াই চণ্ডীমণ্ডপ হইতে নামিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন, সঙ্গীলোকেরা তাঁহার অনুগমন করিল। রাত্রি অনুমান চারিদণ্ড। মজলিস্ ভঙ্গ হইল। বোধ হয়, অন্য কোন স্থানে নূতন মজলিস বসিতে পারে।

তৃতীয় কল্প।

দাদার উপদেশ।

দাদার নাম উমানাথ তরফদার। পরদিন প্রাতঃকালে এক-খানি গামছা স্কন্ধে লইয়া, উমানাথ শূন্যপদে দ্রুতগতি হরকান্ত রায়ের বাড়ীতে উপস্থিত। উমানাথ অপেক্ষা হরকান্তবাবু বয়সে ছোট, উমানাথ তথাপি প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন,—"দাদা—দাদা—দাদা কি ঘরে আছ ?"

অন্দর হইতে বাহিরে আসিয়া হরকান্তবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গা ?"

উমানাথ তখন একটু রঙ্গ করিবার অভিলাষে তুলসীমঞ্চের পশ্চাতে গিয়া লুকাইয়া ছিলেন, হরকান্তবাবু সদর প্রাঙ্গণের চারিদিকে চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আমাকে ডাকিতেছিল ?"

তুলসীমঞ্চের পশ্চাৎ হইতে গম্ভীর আওয়াজে উত্তর হইল, "হুম !"

হরকান্তবাবু পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "হুম্ যদি মানুষের আওয়াজ হয়, তবে কিসের ভয়ে লুকাইয়া ?"

উমানাথ বাহির হইয়া আসিলেন, কপট ভঙ্গীতে সর্ব্ব শরীর কাঁপাইয়া দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে, কম্পিতকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "সত্য দাদা—সত্য দাদা! সত্যই তুমি ভবিষ্যৎ জান,—সত্যই তুমি গণক ঠাকুর! সত্যই আমি ভয় পাইয়াছি।

দেখিতেছ না, আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে,—দাঁতকপাটী লাগিতেছে,—ভয় পাইলে শীত লাগে,—শীতে আমার শরীরের রক্ত জমাট বাঁধিয়া যাইতেছে!"

চণ্ডীমণ্ডপের রোয়াকে একখানি সতরঞ্চি পাতা ছিল, পশ্চিম দিকে একটী তাকিয়া। হরকান্তবাবু উমানাথের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক চণ্ডীমণ্ডপে লইয়া গিয়া বসাইলেন, তাকিয়াটী তাঁহাকে দিলেন, নিজে একদিকে খুটি ঠেশ দিয়া বসিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভয় দাদা? আমাকে দেখিয়া ভয়টা একটু কমিয়াছে কি?"

উমানাথ বলিলেন, "খুব কমিয়াছে,—খুব কমিয়াছে,—কিছুই নাই,—এক বিন্দুও নাই। কিসের ভয়? তুমি যেখানে আছ, সেখানে কি ভয় ডর ঘেঁসিতে পারে? তবে কি জান, রাত্রে বড় একটা ভয় পাইয়াছিলাম।"

হরকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম?"

উমা। কি ক'ব দাদা, সে কথা ক'বার নয়। শেষরাত্রে আমার একটু একটু তন্দ্রার ঘোর, সেই সময়ে দেখি, আমার শিয়রে যেন একটা ভীষণ মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তন্দ্রার ঘোর, তথাপি যেন আমি চাহিয়া দেখিলাম, বিকটাকার অসুর। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কলেবর, ঠিক যেন আল্‌কাতরা মাখা, গলায় জবাফুলের মালা, কপালে চীনের সিঁদুরের দীর্ঘ ফোঁটা, মাথায় খুব লম্বা লম্বা জটা, হস্তে ত্রিশূল।

হর। কিরূপ মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইল?

উমা। ঠিক বুঝাইতে পারিব না। আমাদের কোন কেতাবে সে রকম মূর্ত্তির বর্ণনা নাই।

হর। আচ্ছা, সেইরূপ বিকট মূর্ত্তি তুমি দেখিলে; মূর্ত্তি তখনি তখনি চলিয়া গিয়াছিল, কিম্বা তোমাকে—

উমা। না দাদা, চলিয়া যায় নাই, মূর্ত্তি আমার কানের কাছে গর্জ্জন করিয়া বলিয়াছিল, তোদের গ্রামখানা পয়মাল হবে, গ্রামশুদ্ধ সমস্ত লোক মুখে রক্ত উঠিয়া মরিবে। গ্রামের হরকান্ত রায় আমার রাজ্যে বাস করে, আমার শাসন মানে না, ঠাকুর দেবতার দোহাই দিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করে, এত বড় স্পর্দ্ধা। আমি তাকে উচিত প্রতিফল দিব। বিষ্ণুপূজা, দুর্গাপূজা, ভূত-পূজা বাহির করিব। তোরা যদি হরকান্তকে শাসন করিতে না পারিস্, তোদের সকলেরই সর্ব্বনাশ হইবে। এইরূপ অভিশাপ দিয়া, ক্রোধে দন্ত বিকাশ করিয়া, ত্রিশূল ঘুরাইতে ঘুরাইতে সেই মূর্ত্তি আবার বলিল, যা—এখনই উঠিয়া যা,—হরকান্তকে আমার কথাগুলি শুনাইয়া দিগে যা,— রাত্রি প্রভাত হইলে আমার পরা-ক্রম জানিতে পারিবি। আতঙ্কে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়াছিল, চাহিয়া দেখিলাম, কিছুই দেখিতে পাইলাম না, মূর্ত্তি অদৃশ্য। নিদ্রাভঙ্গ হইল, উঠিয়া বসিলাম, কত কি ভাবিলাম, কতই ভয় পাইলাম, প্রভাতে তোমার এইখানে ছুটিয়া আসিতেছি। আমার কম্পটা তুমি স্বচক্ষে দেখিয়াছ। এখন আর কোন ভয় নাই, কিন্তু মূর্ত্তিটা কে, ভাবিয়া কিছু ঠিক করিতে পার দাদা?

হর। বোধ করি কলি-দেবতা। যে সকল কথা তোমার মুখে শুনিলাম, দুষ্ট কলি ভিন্ন সে সকল কথা আর কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু সে আমার কি করিবে? সাধ্যমতে আমি সৎকার্য্য করি, এই আমার অপরাধ, সে অপরাধে কলির বিষ-নয়নে পড়িতে পারি, কিন্তু তাহার ভয়ে সৎকার্য্য আমি ছাড়িব

না। কলিযুগে সৎকার্য্যে অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন, তাহা জানি; কিন্তু শাস্ত্রের কোন স্থানেই কলিতে সৎকার্য্য করিবার নিষেধ নাই। মহাপুরুষেরা পুণ্যফলে—পুণ্যবলে পদে পদে কলিকে পরাস্ত করিয়াছেন, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। স্বপ্নে কলি তোমাকে ছলনা করিতে আসিয়াছিল, ইহা নিশ্চয়। স্বপ্ন যদি সত্য হয়, তথাপি আমি ভয় করিব না; বাস্তবিক স্বপ্নের কথাগুলা সর্ব্বৈব মিথ্যা। সব স্বপ্ন যদিও মিথ্যা না হয়, আমার বুদ্ধিতে তোমার এ স্বপ্নটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

উমা। তাই বল দাদা—তাই বল! মিথ্যাই হইয়া যাউক, স্বপ্ন দেখিয়া সত্যই আমার ভয় হইয়াছিল। তোমার সংসার ধর্ম্মের সংসার, তোমার ভাণ্ডার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, ধন পুত্র লক্ষ্মী লাভ; এমন সৌভাগ্য সকল লোকের ঘটে না। তোমার যদি কিছু মন্দ হয়, আমার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিবে। সেই কারণে তোমাকে সতর্ক করিতে আসিয়াছি।

হর। আমি বেশ সতর্ক আছি। সজ্ঞানে কখনো কাহারো মন্দ করি নাই, কখন কাহারো মন্দ করিবও না; কটুকথা বলিয়া কখনো কাহারো মনে বেদনা দিই নাই, কখনো দিবও না; আমার বংশে কেহই কখনো কাহারো প্রাণে বেদনা দেয় নাই। আমি কেন ভয় করিব? কলি যদি মূর্ত্তিমান হইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, সাপের মতন ফোঁস করিয়া আমাকে যদি ভয় দেখায়, তথাপি আমি তিলেকের জন্যও হরিনাম ছাড়িব না, দুর্গানাম ছাড়িব না, সৎকার্য্য ছাড়িব না।

হরকান্তবাবুর মুখপানে চাহিয়া উমানাথ একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর মনে মনে

কি চিন্তা করিয়া একটু মৃদুস্বরে বলিল, "দেখ দাদা, তোমার মন্দ কেহই করিতে পারিবে না, আমি সর্ব্বদাই তোমার মঙ্গল কামনা করি। স্বপ্নের কথাটা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল, ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল; তবে কি না—তবে কি না—রাগ করিও না দাদা,—তোমাকে আমি আজ একটা উপদেশ দিতে—"

কথায় বাধা দিয়া হরকান্তবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম উপদেশ?"

উমা। উপদেশ কিছু বেশী নয়, কোন ধর্ম্ম শাস্ত্রের কথাও নয়, মোটামুটি সাংসারিক কথা। তোমার মঙ্গলের জন্যই সেই কথাটী আমি বলিতে চাই। তুমি জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান, ভক্তিমান, সংসার-তত্ত্ব তুমি অনেক জান, তোমার চেয়ে বেশী আমি কিছুই জানি না, তোমার কাছে আমি অনেক রকম উপদেশ পাইতে পারি, তথাপি একটী বিষয়ে আজ আমি—

হর। (পুনর্ব্বার বাধা দিয়া) আড়ম্বর ছাড়, ভূমিকা ছোট কর, বড় বড় গৌরচন্দ্রিকা আমি ভালবাসি না, কি কথা তুমি বলিতে চাও, শীঘ্র বল; আমার বিষ্ণুপূজার সময় আসিয়াছে।

উমা। বলি দাদা,—বলি বলি মনে করি, তবু যেন একটু একটু ভয় পাই। পাছে তুমি রাগ কর, পাছে তুমি আমাকে জ্যাটা বল, সেই ভয়ে একটু একটু থতমত খাই। আমার একটা দোষ আছে,—জান তুমি,—আমি একটু একটু গাঁজা খাই,—সেই কথা তুলিয়া পাছে, তুমি আমার কথা অগ্রাহ্য কর, তাই আমি—

হর। আবার ভূমিকা?—আবার আড়ম্বর? কেন বৃথা

সময় নষ্ট কর? আমি রাগ করিতে জানি না, কাহারও হিত-কথা অগ্রাহ্য করি না। স্বচ্ছন্দে বল, কি তোমার উপদেশ?

উমা। (মাথা চুলকাইয়া) বলি দাদা,—সমস্তই তুমি বুঝিতে পার, ইংরাজের রাজত্ব, আমরা ইংরাজের রাজ্যে বাস করি, এ রাজ্যে এখন ইংরাজি বিদ্যা না শিখিলে মানুষের মধ্যেই গণ্য হওয়া যায় না, বিষয়-বুদ্ধিও থাকে না, সাহেব-সুবার সঙ্গে দুই একটা কথা কহাও যায় না, সভ্যতাও শিক্ষা হয় না।

হর। তাহাতে কি হইল?

উমা। হইল না কিছু, কিন্তু ইংরাজি শিক্ষা করাটা এখন-কার দিনে বড়ই আবশ্যক।

হর। কে শিখিবে? আমি? আমার ত বয়েস গিয়াছে, এখন আর এ, বি, শিক্ষা করিয়া কি ফল?

উমা। তোমার কথা বলিতেছি না, তোমার ছেলে দুটী বেশ বুদ্ধিমান, সে দুটীকে ইংরাজি স্কুলে দাও।

হর। কেন?—চাকরী করিতে শিখিবে? চাকরীতে আমার দরকার নাই।

উমা। তুমি জমিদার আছ, তোমার ছেলেরা চাকরী করিবে, এমন কথা আমি বলিতেছি না। ইংরাজি শিক্ষায় যত উপকার, পূর্ব্বেই তাহার কতক কতক বলিয়াছি; আরও অনেক উপকার আছে।

হর। উপকার বিস্তর! ব্রাহ্মণের ছেলে সন্ধ্যা গায়ত্রী বর্জ্জিত হইবে, ম্লেচ্ছাচার শিক্ষা করিবে, মাতা-পিতাকে মানিবে না, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইবে, কুমারীগণকে বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত কুমারী রাখিবার চেষ্টা করিবে, যবনান্ন গ্রহণ করিতে—

নিষিদ্ধ মাংসভক্ষণ করিতে প্রবৃত্তি হইবে, স্বদেশের কিছুই ভাল লাগিবে না, এই সকল উপকার। সে সকল উপকারে দেশ উৎসন্ন যায়, আমার ত এই পর্য্যন্ত বিশ্বাস।

উমা। তোমার সেটা ভুল বিশ্বাস। যাহারা ইংরাজি পড়ে, তাহারাই ঐ রকমে নষ্ট হয়, এ কথা সত্য নহে। বাড়ীতে উপদেশ ভাল থাকিলে, সঙ্গ ভাল হইলে, ভাল ভাল সভায় গতিবিধি করিলে, ইংরাজি পড়ার কোন দোষ স্পর্শিতে পারে না, এরূপ আমি অনেক দেখিয়াছি। আমাদের গ্রামের অনেক ছেলে ইংরাজি পড়ে, গ্রামের স্কুলটী গ্রামের ছেলেতেই পরিপূর্ণ!

হর। পাপেও পরিপূর্ণ হইতেছে। ও সব কথা ছাড়িয়া দাও, আর যদি তোমার কিছু বলিবার থাকে, তাহাই বল।

উমা। ঐ কথা বলিতেই আমি আসিয়াছি। স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছি, স্বপ্নের মূর্ত্তির মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে তোমার সুমতি না হইলে আমাদের এই প্রাচীন গ্রামখানি ধ্বংস হইয়া যাইবে। আমার স্বপ্নের মূর্ত্তিকে তুমি অনুমান করিয়াছ কলি! কলি আবার কে? কলি ত আমরাই। আমরা যাহা করিতেছি, তাহাই এ যুগের শাস্ত্রসম্মত। তুমি যদি শাস্ত্র মানিয়া না চল, তাহা হইলে তোমার অধর্ম্ম হইবে। একজনের অধর্ম্মে বহু লোকের অমঙ্গল ঘটিবে।

হর। অধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলিব, তাহাতে যদি বহুলোকের অমঙ্গল ঘটে, তাহা হইলে কি করিলে মঙ্গল ঘটিবে সেটা আমি জানি না।

উমা। কি করিলে মঙ্গল হইবে, তাহা আমি বলিতেছি। দুটী ছেলেকে ইংরাজি স্কুলে পাঠাইতে যদি তোমার ইচ্ছা না

হয়, বড় ছেলেটীকে স্কুলে পাঠাও, ছোটটীকে তোমার যে রকম ইচ্ছা, সেই রকমে শিক্ষা দাও।

হর। বড় ছেলেটীকে আমি সংস্কৃত পড়াইব, সংস্কৃত পড়িলে শাস্ত্রে জ্ঞান জন্মিবে, কদাচ অধর্ম্মে মতি হইবে না।

উমা। হরি বোল হরি! বেশ বুদ্ধি ঠাওরাইয়াছ! সংস্কৃত পড়াইয়া ছেলেটীকে ভট্টাচার্য্য করিয়া তুলিবে! আচ্ছা দাদা, তুমি জমিদার মানুষ, তুমি কিছু চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবে না, মানুষ অমর নয়, তোমার অবর্ত্তমানে ছেলেরা জমিদারীর মালিক হইবে। সংস্কৃত পড়া ভট্টাচার্য্যেরা বিষয়-কর্ম্ম বুঝিয়া জমিদারী রক্ষা করিতে জানে, এমন কি কোথাও শুনিয়াছ? না, ব্যাকরণে কি জমীদারী শিক্ষার উপদেশ পাওয়া যায়? জমা ওয়াশীল বাকী থোকা, কড়্চা, বাকী জায়, জমাবন্দি, ভূমি জরিপ ইত্যাদি কুটীল কুটীল বিষয়ের উপদেশ ব্যাকরণের কোন পৃষ্ঠায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না! তুমি যদি একটী ছেলেকে সংস্কৃত পড়াইতে অভিলাষী হও, একটী ছেলেকে টোলে দিও; বড়টীকে হউক, কিম্বা ছোটটীকেই হউক, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে পণ্ডিত করিয়া লইও; একটীকে ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যে রকম দিন কাল, যে রকম আইন কানুন, তাহাতে ইংরাজি-শিক্ষা ব্যতিরেকে জমিদারী রক্ষা করা সহজ হইবে না; দুষ্টু-লোকে গালে চড় মারিয়া তোমার জমিদারীগুলি কাড়িয়া লইবে।

হর। আমি ইংরাজি জানি না; আমার গালে চড় মারিয়া লোকে যখন আমার জমিদারী কাড়িয়া লইতে পারিতেছে না, তখন আমার ছেলেদের গালে চড় মারিয়া কিরূপে কাড়িয়া লইবে, তাহা আমি বুঝিলাম না।

উমা। স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিই। তোমরা এক রকমে কাটাইয়া যাইতেছ ভাল, কিন্তু দিন দিন সেটা বড় শক্ত হইয়া আসিতেছে। অনেক লোক ধড়িবাজ হইতেছে, জুয়াচুরি, ফেরেবি, দাগাবাজী, জালিয়াতি, দাঙ্গাবাজী ইত্যাদিতে অনেক লোক পটু হইয়া উঠিতেছে; মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা, দমবাজী ইত্যাদি হরেক রকম ফিকির ফন্দী অনেকেই শিক্ষা করিতেছে। তোমার ছেলেরা যতদিনে সাবালক হইয়া উঠিবে, ততদিনে এই সকল উপদ্রব আরও অধিক পরিমাণে বাড়িবে, ইংরাজিতে অধিকার না জন্মিলে, ইংরাজি আইন কানুন না বুঝিলে, ইংরাজি হাকিম ও ব্যারিষ্টারগণের সহিত কায়দামত কথা কহিতে না পারিলে, বিষয় রক্ষা করা ভার হইয়া দাঁড়াইবে। তাই বলিতেছি, একটী ছেলেকে ইংরাজি পড়াও।

হরকান্তবাবু মস্তক অবনত করিয়া খানিকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, শেষকালে উমানাথের মুখপানে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "আচ্ছা, আজ অনেকটা বেলা হইল, আমার স্নান-আহ্নিকের সময় অতীত হইতেছে, এখন আর বাদানুবাদ করিবার সময় নাই; যাহা যাহা তুমি বলিলে, সময়ান্তরে ভালরূপে বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় তোমাকে জানাইব।"

এই বলিয়াই হরকান্তবাবু আর কোন কথা শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই অন্দর-মহলে প্রবেশ করিলেন, আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে উমানাথ তরফদার সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ কল্প।

নূতন বিবাহ।

চারি বৎসর অতীত। সেই হরকান্তবাবুর বাড়ী। সেই শান্তি-নিকেতনে এখন হর্ষ-বিষাদ একত্র। চন্দ্রকান্তের উপনয়ন হইয়াছে. সূর্য্যকান্তের বিবাহের সম্বন্ধ আসিতেছে, সূর্য্যকান্তের বয়ঃক্রম তখন পঞ্চদশ বর্ষ। গৃহিণী পদ্মরাণী জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিবার নিমিত্ত তিনি একান্ত অভিলাষী; স্বামীকে প্রায় সর্ব্বদাই বলেন, সূর্য্যকান্তের বিবাহ দাও, ছোট একটি রাঙা টুক্‌টুকে বউ ঘরে আনিয়া নয়ন সার্থক করি, অষ্ট অলঙ্কারে সাজাই, গুড়্‌গুড় করিয়া বেড়াইবার সময় ঝুমুর ঝুমুর করিয়া গুঞ্জরি পঞ্চম বাজিবে,: শুনিয়া শুনিয়া কর্ণ শীতল করি, এইটী আমার বড় সাধ। কবে মরি, কিছুই বলিতে পারি না, এক এক সময় মনটা কেমন উদাস হয়, বোধ হয়, যেন বেশী দিন বাঁচিব না. তাই তোমাকে মিনতি করিয়া বলি, সূর্য্যকান্তের বিবাহ দাও, সংসার হইতে পলাইবার পূর্ব্বে গুড়্‌গুড়ে বউটী দেখিয়া যাই। এক একদিন এই সকল কথা বলিবার সময় পদ্মরাণী যেন একটু একটু হাঁপাইয়া উঠেন, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া অঞ্চল দ্বারা নেত্র মার্জ্জন করেন। হরকান্তবাবু সে ভাবটী বড় একটা বুঝিয়া উঠিতে পারেন্ না।

সহধর্ম্মিণীর বাক্যগুলি-শ্রবণ করিবার সময়, হরকান্তবাবু

অন্যমনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতে ছিলেন। পদ্মরাণী বলিয়াছেন, কবে মরি, বলিতে পারি না; সেই কথাটী হরকান্তবাবুর প্রাণে লাগিয়াছিল। পতি-পত্নীতে বিশুদ্ধ প্রণয়, অকপট ভালবাসা, পতি-সেবায় পদ্মরাণী একান্ত অনুরক্তা, সাধ্বী সতী পতিব্রতা। তাহার মুখে ঐরূপ নির্ঘাতবাক্য শুনিয়া হরকান্তবাবু ম্লানবদনে বলিলেন, "কি বলিতেছ পদ্মিনী!—পিপাসী মধুকরকে বঞ্চনা করিয়া তুমি মুদিত হইবে? আমাকে ফেলিয়া অগ্রে তুমি চলিয়া যাইবে? না,—তাহা কখনই হইবে না; আমার প্রাণ বলিতেছে, তাহা কখনই হইতে পারিবে না; তোমার সিঁতার সিন্দূর উজ্জ্বল দেখিতে দেখিতে আমিই অগ্রে চলিয়া যাইব; নিতান্ত পক্ষে যদি তাহা না ঘটে, সত্যই তুমি যদি অগ্রে পলায়ন কর, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইব। আর্য্যকুলের পতিপ্রাণা কামিনীরা বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিবার ভয়ে পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেমন অনুমৃতা হইতেন, ভগবান না করুন, যদি তোমার—আমার চক্ষের উপর যদি তোমার ভাল-মন্দ ঘটে, তাহা হইলে আমি সহমরণ—"

আর শুনিতে না পারিয়া, অশ্রুপূর্ণনয়নে পতির মুখপানে চাহিয়া, তাহার তুখানি হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কাতরবচনে পদ্মরাণী বলিলেন, "বালাই! অমন কথা মুখে আনিতে আছে? জীবিতেশ্বর! যতদিন আমি সংসারে জীবিত থাকিব, ততদিন তুমি আমার জীবিতেশ্বর, অগ্রে যদি মরি, পরলোকে গিয়াও মনে মনে ভাবিব, তুমি আমার জীবিতেশ্বর। অসার স্ত্রীলোকে বেশী দিন বাঁচিয়া থাকিলে পৃথিবীর কোন উপকার নাই, তোমাকে রাখিয়া,—পুত্র তুটী রাখিয়া,—সংসারের সকলগুলিকে

রাখিয়া, হরিপাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে—তোমার পাদপদ্ম দর্শন করিতে করিতে যদি আমি এ জন্মের মতন নয়ন মুদিতে পারি, তবেই আমার পরম সুখ।”

হরকান্তবাবুর চক্ষে জল আসিল, একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কোঁচার কাপড়ে চক্ষু ঢাকিয়া, তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, গৃহ হইতে বাহির হইতে চলিলেন; উঠিয়া পশ্চাতে ডাকিয়া পদ্মরাণী বলিলেন, “কোথায় যাও?”

হরকান্তবাবু কিছুই উত্তর দিলেন না, দ্রুতপদে সদর বাটীতে চলিয়া গেলেন। পদ্মরাণী বিষণ্নবদনে ভাবিতে লাগিলেন, এ কি হইল? আমি এমন কি কথা বলিলাম যে, প্রাণের প্রাণ, সর্ব্বময় প্রভু, হৃদয়সর্ব্বস্ব, হৃদয়গুরু, পতিদেবতাকে কাঁদাইলাম! দুই দণ্ড কথা কহিলে প্রাণ জুড়ায়, সেই আহ্লাদে বাধা পড়িল। বলিতেছিলাম, ছেলের বিয়ের কথা, হঠাৎ কথার মাত্রায় পোড়ামুখীর পোড়া মুখে নিজের মরণের কথা বাহির হইয়াছিল, সেই দুঃখেই তিনি কাতর হইয়া উঠিয়া গেলেন।

তদবধি প্রায় একপক্ষকাল পদ্মরাণী পতিকে আর পুত্রের বিবাহের কথা বলেন নাই, পক্ষান্তে অবসর পাইয়া একদিন আবার সেই কথা তুলিয়াছিলেন। হরকান্তবাবু সেই দিন উত্তর দিয়াছিলেন, ব্যস্ত হইবার কোন কারণ নাই, পুত্রকে আমি অবিবাহিত রাখিব না, সময় হইলেই সদ্বংশজাতা সুলক্ষণা সুপাত্রী দেখিয়া ঘটা করিয়া বিবাহ দিব, তোমার যেমন ইচ্ছা, সেইরূপ পরমা সুন্দরী কন্যা আনিব, মনোমত বেশভূষা দিয়া সাজাইব, রতি কন্দর্পের ন্যায় যুগলরূপ দর্শন করিয়া সুখী হইব; তবে কি জান, উপযুক্ত সময় আসুক; এই সবে পঞ্চদশ

বর্ষ বয়ঃক্রম, হিসাব মত বালক বলিতে হয়, এত অল্প বয়সে বালকের বিবাহ আমি দিব না।

পতির কথার উপর কথা কহা, পতির অমতে কোন কার্য্য করা, কোন প্রসঙ্গ লইয়া পতির সহিত তর্ক করা পদ্মরাণীর স্বভাব নয়; তিনি মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। হরকান্তবাবু বলিলেন, "ছেলে বাঁচিয়া থাকুক, বিবাহের জন্য চিন্তা কি? কথাটা কি জান, অল্প বয়সে বিবাহ দিলে ছেলেদের লেখাপড়ার ব্যাঘাত হয়; আরো একটা বড় কথা—অল্প বয়সে যদি সন্তান জন্মে, সে সন্তান বেশী দিন বাঁচে না। কুড়ি বৎসর বয়সে পুত্রের বিবাহ দেওয়া উচিত, তুমি যদি আর পাঁচ বৎসর বিলম্ব করিতে না পার, তবে তিন বৎসর পরে আঠার বৎসর বয়সে সূর্য্যকান্তকে—"

কর্ত্তা আরো কি বলিবেন, তাহা শুনিতে ইচ্ছা না করিয়া ক্ষুণ্ণমনে ম্লানবদনে গৃহিণী তথা হইতে উঠিয়া গেলেন। মনে মনে হাসিয়া হরকান্ত ভাবিলেন, অভিমান হইয়াছে, বড়ই অভিমানিনী। সময়ে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলে ও অভিমান থাকিবে না। এই ভাবিয়া তিনিও তখন সে গৃহ হইতে বাহির হইলেন।

ইহার পর একমাস অতীত হইয়া গেল। সময়ে বুঝাইয়া অভিমানিনীর অভিমান দুর করিবেন, হরকান্ত বাবুর মনে এইরূপ আশা ছিল, কিন্তু হায়! সময়ে কুলাইল না, আর তাঁহাকে বুঝাইতে হইল না। একদিন রাত্রি এক প্রহরের সময় পদ্মরাণী আহার করিতে বসিয়াছিলেন, ভবতারিণী নিকটে ছিল, আহার করিতে করিতে পদ্মরাণী একবার জলের ঘটী মুখে

তুলিয়া দুই চুমুক জল খাইলেন, হঠাৎ একটা বিষম লাগিল, সামলাইতে পারিলেন না, পশ্চাতে দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়া হেলিয়া পড়িলেন, মাথাটি বামদিকের স্কন্ধের উপর ঝুলিয়া পড়িল, চক্ষু কপালে উঠিল, তিনি ঘন ঘন হাঁপাইতে লাগিলেন। ভবতারিণী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। হরকান্ত বাবুর বিধবা ভগ্নীর নাম ভবতারিণী।

ভবতারিণীর রোদনধ্বনি শুনিয়া বাড়ীর পরিবারেরা সকলেই তাড়াতাড়ি সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, "কি হইল—কি হইল" বলিয়া সকলেই কাঁদিতে আরম্ভ করিল। সংবাদ পাইয়া হরকান্তবাবু অন্দরমহলে ছুটিয়া আসিলেন, ছেলেরাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিল। সকলেই মহা উদ্বিগ্ন।

কাশীশ্বর সেন নামে গ্রামে একজন প্রাচীন কবিরাজ ছিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান হইল। ইত্যবসরে পদ্মরাণীর হস্ত-মুখ প্রক্ষালন করাইয়া অজ্ঞান অবস্থায় ধরাধরি করিয়া একটি বিছানায় শয়ন করান হইয়াছিল; দেহ অস্পন্দ, অসাড়। কবিরাজ আসিয়া অগ্রে নাড়ী পরীক্ষা করিলেন, তাহার পর মুখ, চক্ষু ও রসনা ভাল করিয়া দেখিলেন; কোন রোগ ছিল না, কর্ত্তার মুখে তাহাও শুনিলেন; দ্বিতীয়বার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বিষণ্ণবদনে বিষণ্ণনয়নে কর্ত্তার মুখের দিকে চাহিলেন; অবশেষে কর্ত্তাকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসিয়া চুপি চুপি বলিলেন, জীবনের আশা নাই, বিষম খাইয়া দমবন্ধ হইয়া গিয়াছে, এখনো একটু একটু নিশ্বাস আছে, এইবেলা তীরস্থ করিলে ভাল হয়।

হরকান্তবাবু অকস্মাৎ কাঁপিয়া উঠিলেন, দুটি চক্ষু দিয়া দর-

দরধারে জল পড়িতে লাগিল। মাথা হেঁট করিয়া ক্ষুণ্নমনে কবিরাজ মহাশয় বিদায় হইয়া গেলেন।

নিজ হলধরপুরে গঙ্গা নাই, সেখান হইতে একক্রোশ দূরে গঙ্গা। এদিকে অবস্থা যেরূপ, ততদূরে জীবন্ত লইয়া যাওয়া একেবারে অসম্ভব। পাড়ায় খবর হইল, আটদশজন প্রতিবেশী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহলক্ষ্মীর দেহটী সদরবাড়ীতে তুলসীমঞ্চতলে আনয়ন করা হইল; অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই প্রাণ-পক্ষী উড়িয়া গেল।

বাড়ীতে ক্রন্দনের কোলাহল উঠিল। হরকান্ত বাবুর হৃদয়ে মহাশোক-শেল বাজিল। ছেলে দুটী কাঁদিয়া ব্যাকুল, স্ত্রীলোক-দিগের সঙ্গে সঙ্গে বাবুর ভাগনেয় আর পিসীমার পুত্রেরা স্ত্রীলো-কের মত ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। পাড়ার অনেকগুলি রমণী ঐ নির্ঘাত সংবাদ পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিয়া তুলসীতলায় গড়াগড়ি খাইতে লাগিল। যাহারা যাহারা উপস্থিত হইল, তাহারা সকলেই শোকাকুল। গরিবেরা উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "কোথায় গেলি মা! দয়াময়ী সতীলক্ষ্মী! আমাদের অকূলে ফেলিয়া আচম্বিতে কোথায় পালালি মা! আকাশের কন্যা আকাশে গেলি, পৃথিবীতে মানুষ ছিলি, আকাশে গিয়া দেবতা হলি, কিন্তু মা! আমাদের কি উপায়? করুণাময়ি! তোর করুণায় আমরা বঞ্চিত হইলাম, আমাদের ছেলে-মেয়েরা কি খাইয়া বাঁচিয়া থাকিবে মা? স্বর্গ-প্রতিমার বিসর্জ্জনে আমাদের চক্ষে জগৎ-সংসার অন্ধকার হইল! আমাদের সর্ব্ব-নাশ হইয়া গেল!"

তাহাদের করুণধ্বনি শ্রবণে হরকান্ত বাবুর শোকানল

আরো প্রবল হইয়া জলিয়া উঠিল। বসনে নেত্র মার্জ্জন করিয়া, পাষাণে বুক বাঁধিয়া তিনি অপরাপর সকলকে যথাসম্ভব শান্ত করিলেন। তখনকার যাহা কর্ত্তব্য, সেই কার্য্যের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। গৃহলক্ষ্মীর পবিত্র দেহ ইহজন্মের মত সাধের গৃহ হইতে বাহির হইল!

স্ত্রীলোকের রোদনধ্বনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উচ্চ হইয়া গ্রামের বহুদূর পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। হরকান্ত বাবু অন্দরের একটি নির্জ্জন কক্ষে প্রবেশ করিয়া, গৃহের দ্বার রোধ করিয়া একখানি কৌচের উপর কাঁদিতে বসিলেন। কত কথাই তখন তাঁহার স্মরণ হইতে লাগিল; নাটকের রঙ্গভূমিতে নায়ক-নায়িকার স্বগত অভিনয়ের ন্যায় আপনা আপনি তিনি শোকোচ্ছ্বাসে সেই সকল পূর্ব্ব কথা আলোচনা করিতে লাগি-লেন। চক্ষু একবার সজল, একবার শুষ্ক; দৃষ্টি একবার উর্দ্ধে, একবার নিম্নে। কাতরে তিনি বলিতে লাগিলেন, আজ আমার লক্ষ্মী ছাড়িয়া গেল! আজ অবধি আমার সংসার-ধর্ম্ম সমস্তই বৃথা! গৃহবাসী হইলেও আজ অবধি আমি উদাসীন সন্ন্যাসী! সতীলক্ষ্মী! কোথায় গিয়াছ? আমি রহিয়াছি! সেদিন পুত্রের বিবাহের কথায় যাহা বলিয়াছিলে, পুণ্যবলে সত্য সত্য তাহাই করিলে! বলিয়াছিলে, কবে মরি; এইবেলা ছেলের বিবাহ দাও, গুড়্‌গুড়ে বৌ দেখিয়া যাই। আহা! এজন্মে আর তোমাকে পুত্রের বিবাহ দেখিতে হইল না! বলিয়াছিলে, সম্মুখে আমাকে দেখিতে দেখিতে, মুখে হরিনাম জপিতে জপিতে যোগ্যধামে চলিয়া যাইবে। আহা! সে আশা তোমার পূর্ণ হইল না। ওহো! মূর্খের মত কি কথা আমি বলিতেছি।

সতি! আমার মূর্খতাকে তুমি ক্ষমা করিও। আমি আসিয়া যখন তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলাম, তখন তোমার জ্ঞান ছিল না; চক্ষু ছিল, দৃষ্টি ছিল না! তথাপি তোমার আশা পূর্ণ হইয়াছে। মনের রসনায় নিশ্চয়ই তুমি হরিনাম জপ করিয়াছ, মনের চক্ষে নিশ্চয়ই তুমি আমায় দর্শন করিয়াছ; নিশ্চয়ই তোমার মুক্তি লাভ হইয়াছে। দেবি! এখন অবধি উদ্দেশে আমি তোমার পূজা করিব। তোমাকে লইয়া সংসার-সুখে আমি সুখী হইয়াছিলাম, তোমাকে হারাইয়া সেই সংসার-সুখ আমি হারাইলাম! সুখ আমাকে ছাড়িয়া পলাইয়া গেল! পতিব্রতে! একদিনের নিমিত্ত তুমি আমার অপ্রিয় কার্য্য কর নাই, একদিনের নিমিত্তও আমাকে একটি অপ্রিয় কথা বল নাই; একদিনও আমি তোমার বিরস বদন দেখি নাই, সর্ব্বক্ষণ সেই মধুর মুখে মধুর মৃদুহাস্য খেলা করিত, দারুণ অসুখের সময়েও আমাকে দেখিলে তুমি হাস্য করিতে, যেন সকল যন্ত্রণাই ভুলিয়া যাইতে। হায়! এখন তুমি কোথায়? আমি রহিয়াছি, আমার যন্ত্রণা এখন আর কে নিবারণ করিবে? স্বর্গবাসিনি! তুমি স্বর্গে গিয়াছ, পৃথিবীতে থাকিয়া চিরজীবন আমি তোমার সেই মধুরমূর্ত্তি দর্শন করিব, সেই হাসিমাখা মুখখানি কল্পনার চক্ষে সর্ব্বক্ষণ দেখিব, মনের কুসুমে, প্রেমের কুসুমে প্রতিদিন আমি ভক্তিভাবে তোমার পূজা করিব। তুমি চলিয়া গিয়াছ, তোমার পুত্র দুটী আমাকে দিয়া গিয়াছ, তাহাদের মুখে তোমার সেই চন্দ্রমুখের ছবি সর্ব্বদা প্রাণ ভরিয়া আমি নিরীক্ষণ করিব, তাহাই আমার সান্ত্বনা,—তাহাই আমার এই মহাশোকাগ্নিকুণ্ডে সুপবিত্র নির্ম্মল শান্তি-জল!

সতী-শোকে প্রিয় পতি যে সকল কথা বলিয়া বিলাপ করিয়াছিলেন, অক্ষরে লিখিয়া তাহা আনুপূর্ব্বিক ব্যক্ত করা আমাদের অসাধ্য। এমন কি, সেই হরকান্তবাবু স্বয়ং যদি এই সময়ে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনিও সেই সকল বিলাপবাক্য ঠিক ঠিক স্মরণ করিয়া বলিতে পারিতেন না।

পুণ্যবতী পদ্মরাণীর বিস্তর গুণ ছিল। মায়া, মমতা, স্নেহ, ভক্তি, সরলতা ও মিষ্টভাব তাঁহার চির অলঙ্কার। ক্রোধ পরিহার করা দুঃসাধ্য, কিন্তু পদ্মরাণীর ক্রোধ কদাচ প্রকাশ পাইত না, কদাচ কাহারো সহিত তিনি কলহ করেন নাই; কেহ কখনো তাঁহাকে কটুকথা কহিলে তিনি গায়ে মাখিতেন না, হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন, তাহাকেই বরং মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া সম্ভব মত আদর করিতেন, দুর্ম্মুখেরা লজ্জা পাইত। গরিবেরা তাঁহার জন্য কাঁদিতেছে, কাঁদিবার বিস্তর কারণ। গরিবের দুঃখে দুঃখিত হওয়া, পরের উপকারে মুক্ত হস্ত হওয়া তাঁহার ব্রত ছিল। প্রতিবাসীদের মধ্যে যাহারা গরিব, যে সকল স্ত্রীলোক অনাথা, যে সকল দরিদ্র শিশু পিতৃমাতৃহীন, ভরণ-পোষণ-লোকাভাব, পদ্মরাণী গোপনে গোপনে তাহাদের সকল অভাব দূর করিয়া দিতেন, তিনি সাহায্য করেন, অন্যলোকে তাহা জানিতে পারিত না; লোক দেখাইয়া—লোক জানাইয়া দান করা —লোকে সুখ্যাতি করিবে বলিয়া পরের উপকার তাঁহার স্বভাব ছিল না; পদ্মরাণীর দানধর্ম্ম কাক-পক্ষীরও অগোচর। তাঁহার বাড়ীতে অতিথি কখনো বিমুখ হইত না; একদিনে একশত অতিথি উপস্থিত হইলেও, পদ্মরাণী সানন্দে কোমর

বাঁধিয়া, স্বয়ং রন্ধন করিয়া সকলগুলিকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইতেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন, জমীদারের সংসার, পদ্মরাণী জমীদারের পত্নী, তাঁহার ঐরূপ কার্য্য আশ্চর্য্য নয়, বেশী প্রশংসার কথাও নয়। কথা বটে! কিন্তু অনেক বড় বড় জমীদার আছেন, তাঁহাদের বাড়ীতে ভিখারিরা মুষ্টিভিক্ষাও পায় না! কালধর্ম্মে তাঁহাদেরই অধিক প্রশংসা!

পদ্মরাণী ধর্ম্মপরায়ণা, ভক্তিপরায়ণা, পরোপকারপরায়ণা ও পতিপরায়ণা ছিলেন, তাঁহার সমস্ত সৎকার্য্যে পতির পরম উৎসাহ ছিল। পদ্মরাণীর বিয়োগে হরকান্তবাবু গরিব লোকদিগের সমান উপকার করিবেন, ইহা জানিয়াও গরিবেরা পদ্মরাণীর শোকে চারিদিক অন্ধকার দেখিয়াছিল, হাহাকার করিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়াছিল। পদ্মরাণীকে তাহারা গরিবের মা-বাপ বলিয়া জানিত। আমাদের সমাজের ভাগ্যবতী গৃহিণীরা পদ্মরাণীর মত যশস্বিনী হইতে পারেন, ইহাই আমাদের কামনা।

দশদিন অতীত হইল। একাদশ দিবসে পদ্মরাণীর শেষ কার্য্য। পুণ্যবতী পতি-পুত্র রাখিয়া স্বর্গধামে গমন করিয়াছিলেন, ধেনু-চন্দন করিয়া পুত্রেরা উপযুক্ত সমারোহে জননীর আদ্যকৃত্য সমাপন করিলেন। শোকে অভিভূত থাকিলেও হরকান্তবাবু সে কার্য্যে ঘটা করিতে ত্রুটি করেন নাই।

ইহার পর এক বৎসর অতিক্রান্ত। পল্লীবাসী জনকতক মাতব্বর লোক এই সময় সর্ব্বদা হরকান্তবাবুর বাড়ীতে গতিবিধি আরম্ভ করিলেন। অনেকে অসাক্ষাতে হরকান্তের হিংসা করিত, নিন্দা করিত, কিন্তু সাক্ষাতে যেন কতই ভালমানুষ সাজিয়া আত্মীয়তা জানাইত, খোষামোদে পটুতা দেখাইতেও লজ্জা বোধ

করিত না। মাতব্বর লোকেরা আসিতেন, বাবুকে অনেক রকম বুঝাইতেন, সংসারে যাহাতে মঙ্গল হয়, সেদিকে যত্ন রাখিতে বলিতেন। একদিন সন্ধ্যার পর পাঁচটি বৃদ্ধ লোক বাবুদের চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন সেই উমানাথ তরফদার। নানা কথা কহিতে কহিতে একজন মুরুব্বি দিব্য গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া বাবুকে বলিলেন, "দেখ হরকান্ত! তুমি আমাদের গ্রামের শ্রী, তোমার গৌরবে আমাদের সকলেরই মুখ উজ্জ্বল; তোমার বাড়ীর ক্রিয়া-কর্ম্মে সকলের মুখেই ধন্য ধন্য রব। পূর্ব্বে এই হলধরপুরের নামও সকলে জানিত না, তোমার কল্যাণে হলধরপুর এখন একটা সুপ্রসিদ্ধ গ্রামের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। তুমি সর্ব্বদা এপ্রকার শোকাভিভূত থাকিলে গ্রামখানা শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। দেখিতে পাই, প্রায় সর্ব্বক্ষণ তুমি বিমর্ষ, মন যেন উদাস, সংসার-ধর্ম্মে যেন আর আস্থা নাই, এটা তো ভাল নয়—"

এই পর্য্যন্ত বলিতে বলিতে মুরুব্বি একটু থামিলেন, খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "দেখ হরকান্ত! চিত্ত স্থির কর, সংসারধর্ম্মে মন দাও, ছেলেদুটিকে মনমরা করিয়া রাখিও না, প্রফুল্লতা দেখাও, তোমাকে প্রফুল্ল দেখিলে বালকেরা উৎসাহ পাইবে। তাহাদের জ্ঞান কি? তোমাকে বিমর্ষ দেখিয়া তাহারা দিন দিন মলিন হইয়া যাইতেছে, এক বৎসরের মধ্যে তাহাদের বর্ণ যেন কালী হইয়া গিয়াছে, সর্ব্বদা যেন তাহারা কি ভাবে; হাস্য নাই, স্ফূর্ত্তি নাই, লোকের সহিত ভাল করিয়া কথাও কহে না, দেখিয়া দেখিয়া আমাদের বড় কষ্ট হয়। ছেলেদের দিকে একবারও কি তুমি

চাহিয়াও দেখ না? এতই কি তোমার ভাবনা? কিসের ভাবনা? পুণ্যবতী পুণ্যধামে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার জন্য শোক করা অবোধের কার্য্য। তুমি তো অবোধ নও, তোমাকে আমি আর বেশী কি বুঝাইব? আপনি আপনার মনকে প্রবোধ দাও।"

মুরুব্বি মহাশয় আবার একটু থামিলেন। তামাক খাইয়া বুদ্ধি সংগ্রহ করিয়া, একটু পরে পুনর্ব্বার বলিলেন, "হরকান্ত! আমার একটি পরামর্শ শ্রবণ কর। বৃদ্ধের পরামর্শ শুনিলে মঙ্গল হইবে। তুমি আর একটি বিবাহ কর।"

মুরুব্বির নাম তারিণীচরণ ঘটক। গ্রাম সম্পর্কে হরকান্ত বাবু তাঁহাকে কাকা বলিয়া ডাকেন। বিবাহের নাম শুনিয়া হরকান্তের সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইল; চক্ষু সজল হইয়া আসিল। সজলনয়নে তিনি বলিলেন, "কাকা! অমন আজ্ঞা করিবেন না। আমার আবার নূতন বিবাহ কিসের জন্য? যাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলাম, যাঁহাকে গৃহে আনিয়া সর্ব্বসুখে সুখী হইয়াছিলাম, যিনি আমার গৃহলক্ষ্মী হইয়াছিলেন, যাঁহার অধিষ্ঠানে আমার এ সংসার শান্তিময় হইয়াছিল, সেই শান্তিময়ী আমাকে অশান্তির স্রোতে ভাসাইয়া নিজের শান্তিধামে প্রস্থান করিয়াছেন, আর কি আমি ইহ-জীবনে শান্তিদেবীর প্রসাদ লাভ করিতে পারিব? কখনই পারিব না। তবে আর আমার কর্ণে বিবাহের নাম কেন প্রবেশ করাইয়া দেন? বিশেষতঃ "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" ইহাই শাস্ত্রের বচন। পুত্র লাভের নিমিত্তই বিবাহ করিতে হয়। আমার দুটি পুত্ররত্ন লাভ হইয়াছে, আর কেন বিবাহের কথা? জ্যেষ্ঠ পুত্রটির বিবাহ দিলেই হয়,

এমন সময় নিজের বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইলে লোকে আমাকে পাগল বলিবে। আমি যদি—”

এইখানে হরকান্তের স্বর বদ্ধ হইয়া আসিল, নেত্রপুট বাষ্প-পূর্ণ হইল, পদ্মরাণী সূর্য্যকান্তের বিবাহ দিতে বলিয়াছিলেন, সেই কথা মনে পড়িল ; যাহা বলিতেছিলেন, তাহার শেষ কথা আর বাহির হইল না।

খানিকক্ষণ অধোমুখে থাকিয়া, নেত্রজল মার্জ্জন করিয়া, ধৈর্য্যগুণে সম্ভবমত শান্ত হইয়া, করুণস্বরে তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, “এ বয়সে এখন যদি আমি বিবাহ করি, তাহা হইলে একটি ভদ্রলোকের কন্যাকে শীঘ্র বিধবা করিবার কারণ হইব। নিজের শরীরের লক্ষণে আমি যেন বুঝিতে পারিতেছি, আমি আর বেশীদিন বাঁচিব না।”

মর্ম্মে ব্যথা পাইয়া ঘটক মহাশয় বলিলেন, “সে কি কথা বাবা? অমন অমঙ্গলের কথা কেন বল? তোমার কিসের বয়স?”

ঘটক মহাশয়ের মুখের কথা লুফিয়া লইয়া শ্রোতারা সমস্বরে প্রতিধ্বনি করিলেন, “কিসের বয়স?”

উমানাথ অবসর বুঝিয়া বলিয়া উঠিলেন, “তাই তো! তোমার কিসের বয়স? আমি বোধ করি, চল্লিশ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। সেই সে দিন—গত বৎসর তোমার কাছে আসিয়া আমি যে স্বপ্নের কথা বলিয়াছিলাম, সেই কথাটা মনে কর ইংরাজী বিদ্যায় উপকার কত, তাহাও আমি বলিয়াছিলাম। তোমার যদি ইংরাজী জানা থাকিত, তাহা হইলে ইংরাজী ইতিহাসে দেখিতে পাইতে, বড় বড় ঘরের—বড় বড় দরের—

কত বড় বড় ইংরাজ আশী বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়া অতি কম পাঁচ সাতটি পুত্র কন্যার জনক হইয়াছেন। সে হিসাবে তোমার তাহার অর্দ্ধেক বয়স, বড় জোর চল্লিশ বৎসর, এ বয়সে বিবাহ করা বড়ই আবশ্যক। তুমি স্বচ্ছন্দে বিবাহ কর, মন সুস্থির হইবে, দেহ ভাল থাকিবে, দুর্ভাবনা দূরে যাইবে, পুত্র দুটির আদর-যত্ন হইবে, তুমিও আবার এই সংসারে নূতন শান্তি পাইবে। জান দাদা, আমরা সকলেই তোমার মঙ্গল কামনা করি, তোমার মঙ্গলে আমাদের সকলেরই মঙ্গল; আর অন্যমত না করিয়া বিবাহ করিতে রাজী হও। এই ঘটক মহাশয় দশ দিনের মধ্যেই উত্তম সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিবেন। চারি পুরুষের উপাধিতে তুমি রায় হইয়াছ, সত্য সত্য বংশজ ব্রাহ্মণ নও, কাশ্যপ গোত্র, ধনবিজয়ের সন্তান, শ্রেষ্ঠ চট্টোপাধ্যায়ের বংশে তোমার জন্ম,—পাকা কুলীন; তোমার বিবাহের ভাবনা কি? আমি শুনিয়াছি, ভাল ভাল কুলীনের ঘরে পনর ষোল বৎসরের অবিবাহিতা কন্যা আছে, সেই রকমের একটি কন্যাকে তুমি বিবাহ কর, যে সুখের সংসার, সেই সুখ আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।”

হরকান্তের পত্নী-শোক-সিন্ধু নূতন হইয়া উথলিল; শোকাবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক উত্তেজিত স্বরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, “সংসার, সংসার, সংসার! কি তুমি বারবার আমাকে সংসার-মাহাত্ম্য বুঝাইতেছ? কিসের সংসার?—ক’দিনের সংসার?—কি ছার সংসার?—সংসার নশ্বর, এ সংসারে নিত্য বস্তু কিছুই নাই। তুমি বলিতেছ, সুখের সংসার, কথাটা শুনিয়া বড় দুঃখে আমার হাসি আসিয়াছিল। সংসারের সুখ জলবিম্বপ্রায়, এই আছে, এই নাই। মহাপুরুষেরা ইহসংসারকে দুঃখের সংসার,

পাপের সংসার, অনিত্য সংসার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এই ক্ষণবিনশ্বর ভব-সংসারে ক্ষণবিনশ্বর মানবদেহ ধারণ করিয়া আমরা কিসের অভিমান করিতে পারি? পাপ সংসারে কোন্ সুখের অধিকারী আমরা?—উমানাথ দাদা! তুমি আর আমাকে সংসার-মায়ায় ভুলাইবার চেষ্টা করিও না। এই বয়সে আমি অনেক রকম ভবের খেলা দেখিলাম, একটা খেলাতেও মানুষের জিত হয় না, ফি বাজীতেই হারিতে হয়। বিনয় করি, আমার প্রতি দয়া করিয়া তোমরা ক্ষান্ত হও, কদাচ আমি বিবাহ করিব না।"

মরুব্বিরা অনেক বুঝাইলেন, হরকান্তবাবুর মন ফিরিল না। মরুব্বিরা সেদিন হতাশ হইয়া স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেলেন। এক-দিন হতাশ, কিন্তু সময়ে সময়ে উত্তেজনা করিলে আশা পূর্ণ হইতে পারিবে, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস। সপ্তাহে সপ্তাহে এক একজন আসিয়া, নানাপ্রকার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, সেই কথা উথা-পন করেন, সুখ-শান্তির লোভ দেখান, হরকান্তের সঙ্কল্প অটল। বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডিতে পারে? অটল সঙ্কল্পে আরো এক বৎসর কাটিল; এক বৎসর পরে, কাহার ইচ্ছায় কে জানে, সেই অটল সঙ্কল্প টলিল। সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই স্বীকার করিতে হইবে, সেই ইচ্ছাই বলবতী হইল। গ্রামের সমস্ত আতব্বর লোক, নিজ বাড়ীর সমস্ত পরিবার এবং জমিদারীর মণ্ডল মণ্ডল প্রজাবর্গ এক এক যুক্তিতে এক বিষয়ে এক এক মানসে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করাতে হরকান্তবাবু বড় বিভ্রাটে পড়িলেন, মনে মনে ভাবিলেন, এত লোকের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলে আমার আর একটুও শান্তি থাকিবে না, সকলেই মনে

মনে কষ্ট পাইবে; সামান্য কারণে বহুলোকের মনে কষ্ট দেওয়া ভাল কথা নয়। অধিকন্তু, আমার প্রতি তাহাদের যে কিছু শ্রদ্ধা আছে, তাহা কমিয়া যাইবে, তাহারা আমাকে হয় তো একগুঁয়ে চোয়াড় মনে করিবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া একরাত্রে তিনি তারিণী ঘটককে ডাকাইয়া অপ্রকাশ্য ক্ষুণ্ণমনে নূতন বিবাহে সম্মতি জানাইলেন। ঘটক মহাশয় ভারি সন্তুষ্ট।

এক মাস পরে শুভদিনে শুভক্ষণে একটি সদ্বংশজাতা সুন্দরী কুমারীর সহিত হরকান্তবাবুর দ্বিতীয়বার বিবাহ হইল। কন্যার নাম রাধারাণী, বয়সে ষোড়শী। বিবাহের সময় ও বিবাহের পরে যাহা যাহা হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করা অনাবশ্যক বোধ করা গেল। বিবাহের তিন বৎসর পরে রাধারাণী একটি কন্যা সন্তান প্রসব করিলেন। শারদীয়া মহাপূজার মহাষ্টমীর দিন সেই কন্যা ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, অতএব হরকান্তবাবু তাহার নাম রাখিলেন—শারদা। কন্যাটি দিব্য সুন্দরী হইল।

যন যন দিন চলিয়া যায়; কবিরা বলেন, দিনের পাখা আছে, দিনগুলি গগনবিহারী পক্ষীর ন্যায় উড়িয়া উড়িয়া যায়। শারদার বয়ঃক্রম এক বৎসর। সকলেই শারদাকে ভালবাসে, শারদা একবারও কোল হইতে ভূমিতে নামে না; যতক্ষণ ঘুমায়, ততক্ষণ শুইয়া থাকে, তাহা ছাড়া সমস্তদিন এক একজনের কোলে কোলে বেড়ায়, প্রতিবেশিনী বালিকারাও শারদাকে কোলে লইয়া আদর করে। অল্প বয়সে প্রথম সন্তান হইয়াছিল, হরকান্তবাবু সেটিকে কোলে লইতেন না, কোলে লইতে লজ্জা হইত; কিন্তু তিনি এখন শারদাকে কোলে করিয়া মুখচুম্বন করিতে একটু একটু আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

শারদা পাঁচ বৎসরে পড়িল। বাড়ীর নিকটেই বালিকা-বিদ্যালয়, রাধারাণী একদিন বাবুকে অনুরোধ করিলেন, শারদাকে লেখাপড়া শিখাইতে হইবে, বেশ বুদ্ধি আছে, বেশ শিখিতে পারিবে, একটী ভাল দিন দেখিয়া শারদাকে স্কুলে দাও।

হাস্য করিয়া হরকান্তবাবু বলিলেন, "মেয়েকে পণ্ডিত করা আমাদের কুলাচার নয়, শারদাকে খৃষ্টানী স্কুলে পাঠাইয়া আমি ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে পারিব না; খৃষ্টানী স্কুলে পড়িলে শারদা আর হরিভক্তি শিখিবে না, দুর্গানাম করিবে না, কিছুই মানিবে না। নিষেধ করিতেছি, তুমি আমাকে আর অমন অনুরোধ করিও না, ও রকম অনুরোধ কখনই রক্ষা হইবে না।"

রাধারাণী সেদিন চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু মনে মনে অভিমান হইল। শাস্ত্রে লেখা আছে, পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীজাতির বুদ্ধি চতুর্গুণ, রাধারাণী এমন সুকৌশলে সেই অভিমান গোপন করিয়া রাখিলেন যে, হরকান্তবাবু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সূর্য্যকান্ত মাতৃহীন হইয়াছিল, দুই বৎসর পরে পিতার নূতন বিবাহ, তাহার পর তৃতীয় বৎসরে শারদার জন্ম, সেই শারদা এখন পঞ্চমবর্ষীয়া, গণনায় সূর্য্যকান্তের বয়স এখন পঁচিশ বৎসর। বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমে সূর্য্যকান্তের বিবাহ দেওয়া হরকান্তের ইচ্ছা ছিল, বিধাতার বিড়ম্বনায়, আরো কয়েকটা আনুষঙ্গিক ঘটনায় তাঁহার সে ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই; কনিষ্ঠ পুত্র চন্দ্রকান্ত, সেটির বয়ঃক্রম এখন বিংশতি বর্ষ, যে বৎসর শারদাকে স্কুলে পাঠাইতে রাধারাণীর অনুরোধ পড়িল, সেই বৎসর মাঘ মাসে একসঙ্গে দুটী পুত্রের বিবাহ দেওয়া

হরকান্তবাবুর অভিলাষ হইল। তারিণী ঘটক ঘটকালী করিলেন, দুটী পরম সুন্দরী বধূ আসিয়া ঘর আলো করিল। জমীদারের পুত্রের বিবাহে দস্তরমত সমারোহ হইয়াছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। পুত্রের বিবাহে অবশ্যই আনন্দ, কিন্তু পদ্মরাণীকে স্মরণ করিয়া অন্তরে অন্তরে হরকান্তবাবু বিষম নিরানন্দ।

আট মাস পরে দুর্গাপূজা। ১২৭১ সাল। হরকান্তবাবুর চণ্ডীমণ্ডপে মা-দুর্গার দশভুজা-প্রতিমা অলঙ্কার-বস্ত্রে সুসজ্জিতা। মহালয়া অমবস্যা।

পঞ্চম কল্প।

মহাপূজা ;—মহাবিষাদ।

দেবীপক্ষ সমাগত। পূজার সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। ২২শে আশ্বিনে সপ্তমী পূজা। শরতের আকাশ দিব্য পরিষ্কার, প্রভাকর ও নব শশধরের নির্ম্মলজ্যোতি সুপ্রকাশ, কোন দিকে কোন প্রকার অপ্রসন্ন ভাব নেত্রগোচর হয় না; মহামায়ার আগমনে আর্য্যসন্তানগণের প্রফুল্লবদনে মহানন্দের হাস্য বিকাশ পাইতে লাগিল। চতুর্থী নিশা প্রভাত, ২০শে আশ্বিন,—দুর্গা পঞ্চমী।

লোকে কথায় বলে, অকস্মাৎ বজ্রাঘাত। অকস্মাৎ দুর্গা-পঞ্চমীর দিন আকাশমণ্ডল ঘোর অন্ধকার ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন; প্রথমে বিন্দু বিন্দু, ক্রমে ক্রমে মুষলধারে বৃষ্টি, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চকমকি, ভীষণ নিনাদে ঘন ঘন বজ্রপাত; সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর মহাঝটিকা। ১২৭১ সালের ২০শে আশ্বিনে সেই তুমুল মহা-ঝটিকা এতদ্দেশে আশ্বিনে ঝড় নামে আজিও বিখ্যাত। সেই মহাঝড়ে বঙ্গের বহু লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। উদ্যানের বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত, অনেক অট্টালিকা চূর্ণ-বিচূর্ণ, গৃহস্থ লোকের সামান্য সামান্য গৃহের তো কথাই নাই; অনেক লোকের চণ্ডীমণ্ডপ পতিত হইয়া সজ্জিত দুর্গা-প্রতিমা চাপা পড়িয়া গিয়াছিল; পূজার সমস্ত আয়োজন থাকিলেও প্রতিমার অভাবে অনেক লোকের দুর্গোৎসব হয় নাই; কেহ কেহ কষ্টেস্রেষ্টে ঘটপূজা করিয়াছিলেন, কেহ কেহ কিছুই করিতে না

পারিয়া মনের দুঃখে গুমরাইয়া গুমরাইয়া রোদন করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে হরকান্তবাবুর চণ্ডীমণ্ডপখানি রক্ষা পাইয়াছিল, আনন্দময়ীর কৃপায় তিন দিবস তিনি ভক্তিভাবে পূজা সমাপ্ত করিয়া সহস্র সহস্র লোককে ভোজন করাইয়া দুর্গানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বিজয়া।—১২৭১ সালের ২৫শে আশ্বিনে মা-দুর্গার বিজয়া। শ্রীরামচন্দ্রের সাগরকুলের দুর্গোৎসবের বিজয়ার নাম বিজয়োৎসব; আমাদের দেশে আজি পর্য্যন্ত সেইরূপ প্রথা চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু সে বৎসরের বিজয়ায় হলধরপুরে সেরূপ উৎসব হয় নাই। কেবল হলধরপুর কেন, ২০শে আশ্বিনের মহাঝটিকায় বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বস্থলেই বিজয়া-বৈকালে চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখাইয়াছিল; ঝড়ের তাড়নে অনেকগুলি প্রতিমা চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, কাজে কাজেই বিসর্জ্জনের সময় প্রতিমার সংখ্যা অল্প—অতি অল্প, আনন্দও অতি অল্প। তাহার উপর আর এক মহাবিষাদ। যাঁহার গৌরবে হলধরপুর উজ্জ্বল, সেই হরকান্ত রায় সেইদিন নিশাকালে জন্মশোধ পৃথিবী হইতে বিদায় হইলেন! আনন্দময়ীর বিদায়ের পর পরিবারস্থ সকলকে,—গ্রামস্থ সমস্ত প্রতিবাসিকে নিরানন্দ-সাগরে ডুবাইয়া হরকান্তবাবু মায়াময় সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহামায়ার অনুবর্ত্তী হইলেন! ব্যাধি পীড়া কিছুই হয় নাই, সুস্থশরীরে সানন্দচিত্তে বাটী হইতে এক ক্রোশ দূরস্থ ভাগীরথী-তীরে প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে গমন করিয়া সময়োচিত আনন্দোৎসব করিয়াছিলেন, সন্ধ্যার পর দুর্গাপ্রতিমা গঙ্গাজলে ভাসাইয়া, গৃহে ফিরিয়া আসিয়া, প্রথামত শান্তিজল গ্রহণ পূর্ব্বক বিল্বপত্রে দুর্গা নাম লিখিয়া,

প্রসাদী সিদ্ধি পান করিয়া, আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত বৎসরানন্দে কোলাকুলি করিয়াছিলেন, তাহার পরেই শয়ন। লোকে মনে করিয়াছিল, পথশ্রমে ক্লান্ত, তন্নিমিত্তই বিশ্রাম; বাস্তবিক তাহা নহে, শয়নের পর তিনি আর বেশী কথা কহিতে পারিলেন না, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল, আকস্মিক শিরঃ-পীড়ায় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন; স্বর্গবাসিনী পদ্মরাণীকে স্মরণ করিয়া চক্ষের জলে ভাসিলেন। তৎক্ষণাৎ কাশীশ্বর কবিরাজকে আনয়ন করা হইল, কবিরাজ মহাশয় আসিয়া অবস্থা দর্শনে অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন; রোগীর চক্ষেও জল, কবিরাজের চক্ষেও জল; নিকটে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারাও বসনে নেত্রা-বরণ পূর্ব্বক অশ্রুমার্জ্জন করিতে লাগিলেন। হরকান্তবাবু পুত্র দুটিকে নিকটে আহ্বান করিয়া কাতরবচনে ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি চলিলাম, তোমরা মাতৃহীন হইয়াছিলে, আজ পিতৃহীন হইলে; শোকে অভিভূত হইও না, ধ্বংসশীল মানব উপযুক্ত সময় হইলেই সংসার হইতে চলিয়া যায়। জগৎপিতার নিয়মই এই। এখন তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ এই যে, ক্ষণেকের জন্যও হরিনাম ভুলিও না, হরিই জগতের মাতা-পিতা, তিনি তোমাদিগকে নিরাপদে রক্ষা করিবেন, মহামায়ার পাদপদ্মে সর্ব্বদা মতি রাখিও, মহামায়া জগৎজননী, তাঁহার ক্রোড়ে সকল সন্তানই সুখে থাকে, এ কথা সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিও। এতদিন আমার দৃষ্টান্তে যে প্রকার হরিভক্তি ও দুর্গাভক্তি দেখাইয়া আসিতেছ, সেই ভক্তি যেন চিরদিন অচলা থাকে। বিষয় আশয় রক্ষা করিতে ঔদাস্য করিও না, দুষ্ট লোকের মন্ত্রণা শুনিও না, যাঁহারা যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী, তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিও, দেব-

দ্বিজগুরুভক্তি যেন শিথিল না হয়, কদাচ কোন অতিথিকে বঞ্চনা করিও না, অতিথি যেন কদাচ বিমুখ না হয়, তোমাদের গর্ভধারিণী দরিদ্রের প্রতি যেরূপ দয়া-মমতা দেখাইতেন, সেই স্বর্গবাসিনীকে মনে করিয়া, তাঁহার দয়াধর্ম্মের অনুসরণ করিতে যত্নবান হইও, গ্রামে কাহারও সহিত বিরোধ করিও না, কাহাকেও কটু বাক্য বলিও না, কাহারও মনে বেদনা দিও না, পরিবারের মধ্যে যাহাতে বিবাদ-কলহ না হয়, সেদিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিও, তাঁহাদের সকলকেই সমভাবে স্নেহ-ভক্তি করিও, আমার নিত্য-নৈমিত্তিক ধর্ম্মোৎসবগুলি ভক্তিভাবে পালন করিও, আমি আর অধিক কথা বলিতে পারিতেছি না, আমাকে—”

আর বলিতে পারিলেন না,—একেবারে নীরব। দক্ষিণ হস্তখানি বক্ষের উপর সংস্থাপিত, যাঁহারা দেখিলেন, তাঁহারা বুঝিলেন, হরিনাম জপ।

কবিরাজ মহাশয়ের ইঙ্গিতে পার্শ্বস্থ ভদ্রলোকেরা হরকান্ত বাবুর অবসন্নদেহটি সদরবাটীতে আনিয়া তুলসীমঞ্চতলে স্থাপন করিলেন। পুত্রগণকে সম্ভবমত উপদেশ দিবার পর হরকান্ত বাবু আর একটীও কথা কহেন নাই; পুণ্যবতী পদ্মরাণী যেখানে জন্মের মত নয়ন মুদিত করিয়া শেষ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই তুলসীতলেই—ধর্ম্মশীল হরকান্তবাবুর প্রাণ-বায়ু বহির্গত!

মহাক্রন্দনধ্বনি উঠিল, সকলেই হাহাকার করিতে লাগিলেন, কবিরাজ মহাশয় নিতান্ত দুঃখিতচিত্তে বিদায় হইয়া গেলেন। সেই মুরব্বি তারিণীচরণ ঘটক উপস্থিত থাকিয়া সেই বিজয়া

রজনীতে হরকান্ত বাবুর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। মহাবিষাদে সংসারটী সমাচ্ছন্ন হইল। অনেকে অল্পে অল্পে পদ্মরাণীর বিয়োগ-শোক বিস্মৃত হইতেছিলেন, এখন আবার সেই সঙ্গে নূতন শোক উপস্থিত হইয়া সকলের হৃদয় আকুল করিয়া তুলিল। সমস্ত লোক সেই পবিত্র দম্পতির গুণাবলী উল্লেখ করিয়া বিষাদ-প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হরকান্ত বাবুর ভবের খেলা সমাপ্ত হইয়া গেল!

সুখের দিন যেমন শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া যায়, দুঃখের দিন দুঃখীর চক্ষে তত শীঘ্র চলিয়া যায় না ইহা সত্য, তথাপি দিন যায়, থাকে না। দেখিতে দেখিতে দশদিন অতীত হইয়া গেল, ভদ্র-লোকগণের অধ্যক্ষতায় সূর্য্যকান্ত ও চন্দ্রকান্ত যথোচিত সমারোহে পিতার আদ্যকৃত্য সম্পাদন করিলেন। শোকে-দুঃখে নিতান্ত ম্রিয়মান থাকিয়াও তাঁহারা অল্পে অল্পে সংসার-ধর্ম্মে মন সমর্পণ করিলেন।

ষষ্ঠ কল্প।

সংসার-বিপ্লব।

যাঁহারা বলেন, যুগধর্ম্মে সংসারে বিপর্য্যয় ঘটিতেছে, সদাচার বিলুপ্ত হইয়া দিন দিন নানা কদাচার প্রবেশ করিতেছে, সেই সকল মহাত্মাকে আমরা নতশিরে বন্দনা করি।

কলিযুগে প্রায় সকল লোকের ধর্ম্মভাব কমিয়া আসিতেছে, অধর্ম্মে মতি হইতেছে, অনাচারে লোকের পরমায়ু ক্ষয় হইয়া আসিতেছে, ইহা কেবল আমাদের কথা নহে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ও ভবিষ্য পুরাণে যাহা যাহা লেখা আছে, তাহারই প্রত্যক্ষ ফল ফলিতেছে। পঞ্জিকা প্রমাণে জানিতে পারা যায়, সত্যযুগে মনুষ্যের পরমায়ু লক্ষ বর্ষ ছিল, পুণ্য সম্পূর্ণ ছিল, পাপের লেশ মাত্র ছিল না; ত্রেতাযুগে মনুষ্যের পরমায়ু দশ সহস্র বর্ষ, পুণ্য ত্রিপাদ, পাপ এক পাদ; দ্বাপরে মনুষ্যের পরমায়ু সহস্র বর্ষ, পুণ্য দ্বিপাদ, পাপ দ্বিপাদ; বর্ত্তমান কলিযুগে সমস্তই বিপর্য্যস্ত; মানবজীবন উর্দ্ধসংখ্যায় একশত বিংশতি বর্ষ মাত্র, পাপ ত্রিপাদ, পুণ্য একপাদ, ব্রাহ্মণ অর্থলোভী, শঠ, প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী, ধরণী শস্যহরা, গাভী দুগ্ধহরা, পুরুষেরা নারীবশ, এই সকল অলক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে নৈসর্গিক ধর্ম্ম কতদূর পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহা সকলেই দেখিতেছেন, তথাপি পুরাতন বংশের আধুনিক বংশধরেরা বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া গর্ব্বভরে বলিয়া থাকেন, যুগধর্ম্ম কিছুই নহে; কলিযুগ কেবল

কল্পনা মাত্র, প্রকৃতির নিয়ম পূর্ব্বেও যেমন ছিল, এখনও সেই-রূপ আছে, সামাজিক নিয়মের যে যে অংশের পরিবর্ত্তন, তাহা কেবল মঙ্গলের জন্য, অবোধেরা সেটা বুঝিতে না পারিয়া যুগের নিন্দা করে, শিক্ষার গুণে দিন দিন নানা বিষয়ের সংস্কার হইয়া আসিতেছে। মূর্খেরা ভাবে অমঙ্গল, বাস্তবিক সংস্কারের নামই মঙ্গল, যুগের কোন ক্ষমতাই নাই। পৃথিবীর কথা দূরে থাকুক, আকাশের কথা লইয়াও মূর্খ লোকেরা বিপরীত তর্ক-বিতর্ক করে। তাহারা বলে, পূর্ব্বে পূর্ব্বে বহু বিলম্বে বহু বৎসরান্তে সূর্য্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হইত, এখন কলিযুগে ঘন ঘন গ্রহণ দৃষ্ট হয়, ঘন ঘন ভূমিকম্প হয়, সময়ে বারিবর্ষণ হয় না। বৎসরের সকল ঋতুতেই পূর্ব্বনিয়ম উল্টাইয়া যাইতেছে, শীতকালে শীত হয় না, গ্রীষ্মকালে বর্ষা হয়, ক্ষেত্রে অল্প শস্য জন্মে, ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হয়, অকালে মানুষ মরে, এ সকল যুগধর্ম্ম; যাঁহাদের বিবেচনা-শক্তি আছে, তাঁহারা এ সকল অদ্ভুত কথা শুনিয়া উপহাস করেন। বস্তুত এ সকল কথা উপহাসের বিষয়, কিম্বা মর্ম্মভেদী, এই আখ্যায়িকা যতদূর অগ্রসর হইবে, ততদূরেই সকলে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন; ক্রমে ক্রমে আমরা তাহা দেখাইব।

হরকান্তবাবু স্বর্গে গমন করিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুর পর এক বৎসর গত হইয়াছে, তাঁহার পুত্রেরা সংসারে কর্ত্তা হইয়াছেন। পূর্ব্বে বলা আছে, গ্রামের অনেক লোক হরকান্তবাবুর সাক্ষাতে হিতৈষী বন্ধু সাজিয়া মিষ্ট কথা বলিত, অসাক্ষাতে হিংসা করিত, নিন্দা করিত, তাঁহার ধর্ম্মভাব দর্শনে ভণ্ডামী বলিয়া উপহাস করিত, তাঁহাদের মনে মনে দুরভিসন্ধি ছিল,

এই সময়ে সেই অভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে তাহাদের সুবিধা হইল।

সূর্যকান্ত ও চন্দ্রকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধির পরিপকতা হয় নাই, দুষ্ট লোকেরা তাহাদিগকে নানা প্রকার মন্ত্রণা দিয়া সংসার ভাঙ্গিবার যোগাড় করিতে লাগিল। সেই সকল লোকের মধ্যে একজন প্রধান লোক সেই উমানাথ তরফদার। লোকটা বড়ই ভয়ঙ্কর। হাসিয়া হাসিয়া কথা কয়, কিন্তু অন্তরে গরল। সেই উমানাথ নিত্য বৈকালে বাবুদের চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বাবু দুটিকে নানাপ্রকার পরামর্শ দিতে লাগিল। সংসারে হরকান্তবাবুর বিধবা পিসী, বিধবা ভগ্নী ও তাঁহাদের পুত্র কন্যা ছিল, উমানাথ সেইগুলিকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিতে মন্ত্রণা দেয়, কৌশলে ভাই ভাই পৃথক হইবার পরামর্শ দেয়, সূর্য্যকান্ত পিতার ন্যায় ঔদার্য্যশালী, ধার্ম্মিক, বুদ্ধিমান জ্ঞানবান হইয়াছিলেন, কথাগুলা তাঁহাকে ভাল লাগিত না, তথাপি শুনিতেন, কোন উত্তর দিতেন না; প্রথম প্রথম এই ভাব, কিন্তু নিত্য নিত্য একপ্রকার কথা শুনিলে স্বভাবতই মনে কিছু কিছু চাঞ্চল্য আইসে; এক একবার তাঁহার মনে হইত, উমানাথ হয়ত সত্য সত্যই তাঁহাদের হিতকামনা করে, তাহার কথা শুনিলে হয়ত ভাল হইতে পারে; মনে হইত এরূপ, কিন্তু তখনি তখনি সৎবুদ্ধির উপদেশে সে ভাবটা সরিয়া সরিয়া যাইত।

কেবল একমাত্র উমানাথ নহে, সেই দরের আরও অনেক লোক ঐ প্রকার কু-পরামর্শ দিতে বিরত থাকিত না। দুই বৎসর গেল, তাহাদের মৎলব হাসিল হইল না, তাহারা আর এক বুদ্ধি খাটাইল;—ভাবিল, আমাদের দ্বারা কাজ হইবে না,

ছেলেদের সমবয়স্ক ইংরাজিওয়ালা ছোকরা ভেজাইয়া দিতে হইবে। সেই যুক্তি অনুসারেই তাহারা ছোকরাদলকে অভীষ্ট মামলার উকিল নিযুক্ত করিল।

পল্লীগ্রামের সকল ছোকরা বারমাস বাটীতে থাকে না, যাহাদের কিছু কিছু সঙ্গতি থাকে, তাহারা কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকিয়া ইংরাজি পড়ে। কাহারো কাহারো ভাগ্যে অল্প-বয়সে সাহেবলোকের দাসত্বও জুটিয়া যায়। হলধরপুরের কুচক্রী লোকেরা স্বর্গীয় হরকান্তবাবুর ধর্ম্মের সংসার পয়মাল করিবার অভিলাষে ছোকরা সংগ্রহে মনোযোগী হইয়াছিল, শীঘ্র শীঘ্র পূর্ণাংশে তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, ছোকরা পাইল কিন্তু গণনায় কম, একদিকে সংখ্যায় কম, অপরদিকে আকাঙ্ক্ষা মত চালাকীতেও কম। শিক্ষার অভাব, সুবিবেচক অভিভাবকের অভাব, সৎসঙ্গের অভাব, এই তিন অভাবে যে সকল পাড়াগেঁয়ে ছোকরা যৌবন আরম্ভের পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া যায়, ফাজিল চালাক হইয়া জ্যাটা বনিয়া যায়, ইতর লোকের সঙ্গে মিশিয়া চোয়াড়ে চোয়াড়ে নেশা করিতে শিক্ষা করে, উমানাথ তরফদার সেইরকমের আট দশটী বয়াটে ছোঁড়া প্রাপ্ত হইলেন; তাহাদের ইচ্ছামত কার্য্যে যে রকম ছোকরা দরকার, সে রকম ছোকরা তখন কেবল দু-চারিটী মিলিল। ইতর জ্যাটা দলে যাহারা বেড়ায়, তাহারা ত সাহস করিয়া সূর্য্যকান্তবাবুর নিকটেই যাইতে পারিল না, বাহিরে বাহিরে হল্লা করিয়া কেবল শান্তি ভঙ্গ করিবার উপক্রম করিতে লাগিল। সূর্য্যকান্তবাবু ভাবিয়াছিলেন, কুল-কন্যাগণের লজ্জা ভঙ্গ করিতেই বুঝি তাহারা উদ্যোগী, তাহাই অনুমান করিয়া বাটীর দ্বারবানগণদের

তিনি হুকুম দিয়া রাখিলেন, দিবাভাগে কিম্বা নিশাকালে সেই রকম হাঙ্গামাওয়ালা ছোকরাদের জনতা দেখিলেই যেন তাহারা উচিতমত শিক্ষা দিয়া বাটীর নিকট হইতে তাড়াইয়া দেয়। সেই হুকুমে দ্বারবানেরা বিলক্ষণ পরাক্রম দেখাইয়াছিল, তাহাতেও আশামত ফল হয় নাই। বাবুদের সদরবাটীতে দ্বারবান থাকিবার উপযুক্ত দেউড়ী ছিল না, অদূরস্থ স্বতন্ত্র একটী ঘরে চার পাঁচজন দ্বারবান উপস্থিত থাকিত, আবশ্যক মত তাগাদার চিঠি লইয়া জমিদারীর মহলে মহলে ঘুরিয়া বেড়াইত, বকশিস অথবা ঘুস আদায় করিবার পন্থা দেখিত; রাত্রি এক প্রহরের পর তাহারা মনিব-বাটীতে আসিত না, বাসাঘরে খাটিয়ায় বসিয়া গাঁজা সিদ্ধির আমোদে মাতিয়া মাদল বাজাইয়া অশুদ্ধ ব্রজবুলীতে বৃন্দাবনের হোলী লীলার কুৎসিত কুৎসিত গীত গাহিত, বয়াটে ছোঁড়ারা তাহা জানিত, একরাত্রে তাহারা দলবদ্ধ হইয়া বাবুদের সদরবাড়ীর প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক চণ্ডীমণ্ডপের উভয় পার্শ্বস্থ তুলসীমঞ্চ দুটী ভাঙ্গিয়া দিয়া গেল। রজনীপ্রভাতে সূর্য্যকান্তবাবু তাহা দর্শন করিয়া অতিশয় মনঃপীড়া পাইলেন, পিতার পরম যত্নের তুলসীমঞ্চ নষ্ট হওয়াতে তিনি অতিশয় ভীত হইলেন, ভগ্নমঞ্চতলে প্রণিপাত করিয়া পতিতপাবন হরির উদ্দেশে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, ভবিষ্যতে ছোকরারা আর সে রকম উৎপাত করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে খবরদারী রাখিবার জন্য নিকটস্থ থানায় সংবাদ দিয়া রাখিলেন। ছোঁড়ারা আর তদবধি রাত্রিযোগে সে বাড়ীতে দৌরাত্ম্য করিতে যাইত না।

যে দুটি চারিটি বয়োধিক উকিল সংগ্রহ করা হইয়াছিল,

তাহারা কিছু কিছু ইংরাজী জানিত, তাহারা প্রথম প্রথম সূর্য্যকান্তবাবুর আনুগত্য করিয়া একটু একটু গা-ঘেঁসা হইয়াছিল, অবসরকালে বড় বাবু যখন চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত আলাপ করিতেন, সেই সময়ে তাহারা সেইখানে উপস্থিত হইয়া নিতান্ত ভালমানুষের মত সেই সকল বাক্যালাপ শ্রবণ করিত, চুপ করিয়া থাকিত, একটীও কথা কহিত না। দিনকতক এই রকমে যায়, তার পর সেই সকল ছোকরা আপনাদের মৎলব সিদ্ধ করিবার উপযুক্ত অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিল। যেদিন যেদিন সূর্য্যকান্তবাবু একাকী চণ্ডীমণ্ডপে থাকিতেন, নিকটে কেহই থাকিত না, সেই সেই দিন ঐ সকল ছোকরা তাঁহার নিকটে স্বতন্ত্র আসনে বসিয়া, বাবুকে শুনাইয়া শুনাইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের গল্প করিত; পেটের দায়ে অথবা ঘোড়ার লোভে, বিবির লোভে যে সকল হিন্দু কুলাঙ্গার স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক খ্রীষ্টধর্ম্মের আশ্রয় লয়, তাহাদের মধ্যে যাহারা পাদরী সাহেবদিগের সুনয়নে পড়িয়া এক একটা প্রচারকের পদ প্রাপ্ত হয়, তাহারা যেমন হাটে, বাজারে, ময়দানে এবং বড় বড় মেলাস্থলে উপস্থিত হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করে, আমাদের দেবদেবীগণের নিন্দা করে, ঐ সকল ছোকরা ব্রহ্মজ্ঞানের গল্প করিতে করিতে সেই রকমে দেবনিন্দা করিতে থাকে,—বাবু সেদিকে বড় একটা কর্ণ রাখেন না, কিন্তু মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হন; ক্রমাগত একপক্ষকাল ঐ প্রকার আশ্চর্য্য কথা শুনিয়া শুনিয়া একদিন তিনি সেই সকল বালককে তিরস্কার করিয়া বলেন, "আমার কাছে যদি তোমরা ঐ সকল প্রলাপ বকিতে আইস, তবে আর তোমাদের এখানে আসিবার প্রয়োজন নাই। তোমরা আপ-

নাদের ঘরে বসিয়া কিম্বা আপনাদের মনোমত আড্ডায় গিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিও।” উমানাথের দলের সেই সকল উকিল তদবধি সূর্য্যকান্তবাবুর নিকট হইতে দূরীভূত হইল।

দুই দল গেল, কুচক্রীদলের দুষ্ট অভিসন্ধি সিদ্ধ হইল না, তাহারা নূতন ফন্দি অবধারণ করিল। বৈশাখ মাসের একদিন বৈকালে আকাশমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে, বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে, একটু জোরে জোরে বাতাস বহিতেছে, সূর্য্যকান্তবাবু একাকী চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একটা ভাঙ্গা ছাতা মাথায় দিয়া, রঙ্গিল গামছায় মাথা ঢাকিয়া উমানাথ তরফদার সেইখানে উপস্থিত হইল, সঙ্গে পাঁচজন লোক; তাহারা উমানাথের মৌতাতী গাঁজার ইয়ার। সূর্য্যকান্তবাবু তাহাদিগকে দেখিয়া তুষ্ট হইলেন না, অথচ স্বভাবসিদ্ধ শিষ্টাচারে “আসুন—আসুন” বলিয়া তাহাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন। বাবুর বিছানার অল্প দূরে স্বতন্ত্র একটী বিছানার উপর দুটী তিনটী তাকিয়া ছিল, উমানাথের দল সেই বিছানায় বসিল। এ কথা সে কথা পাঁচ কথার পর একজন বলিল, “লোকটা ছিল ভাল, একেবারে অধঃপাতে গেল!”

অন্যমনস্ক হইয়া সূর্য্যকান্তবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে মহাশয়? কাহার কথা বলিতেছেন?”

যে লোক কথা কহিতেছিল, সেই উত্তর করিল, “ঐ ও পাড়ার জীবনকৃষ্ণ দত্ত।”

সূর্য্যকান্তবাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন, তাহার কি হইয়াছে?”

যাহার প্রতি প্রশ্ন, সে উত্তর করিবার অগ্রে উপর-পড়া হইয়া

উমানাথ বলিয়া উঠিল, "জান না?—শুন নাই? সেই জীবনকৃষ্ণ প্রায়ই ত তোমার পিতার কাছে আসিত, তোমার পিতার দেখাদেখি, সেই লোকটা অকস্মাৎ বৈষ্ণব হইয়াছিল, সর্ব্বক্ষণ মুখে "হরি হরি" বুলি, সর্ব্বক্ষণ কণ্ঠদেশে হরিনামের ঝুলি, সর্ব্বাঙ্গে ছাপা কাটা, গায়ে নামছাপা নামাবলী,—কতই যেন বিষ্ণুভক্ত! সমস্তই ভণ্ডামী,—সমস্তই ভণ্ডামী বাবা—সমস্তই ভণ্ডামী! অনেক ভণ্ড বৈষ্ণব তাহার কাছে জুটিয়াছিল, দিন দিন হরি-সংকীর্ত্তন, দিন দিন নৃত্যগীত, দিন দিন মাতামাতী! পূর্ণিমাতে, অমাবস্যাতে, অষ্টমীতে, সংক্রান্তিতে মোচ্ছব! ক্রমাগত টাকার শ্রাদ্ধ! জান তুমি, জীবনকৃষ্ণের অনেক টাকার বিষয় ছিল, বৈষ্ণব হইয়া অবধি সে আর বিষয়-কর্ম্ম কিছুই দেখিত না, কেবল বৈষ্ণবের দল লইয়া, খোল-করতাল বাজাইয়া কালহরণ করিত; মোচ্ছবে মোচ্ছবে, বৈষ্ণবের ভোজে ভোজে অনেক টাকা উড়িয়া যাইতে লাগিল, বেচারাকে দলের কাপ্তেন স্থির করিয়া যে যেদিক দিয়া পারিল, টাকা লুঠিতে আরম্ভ করিল। বৈষ্ণব ত বৈষ্ণব,—ষোল আনা গোঁড়া বৈষ্ণব! একবার আমি একটা গল্প শুনিয়াছিলাম, এক গ্রামে পুলিসের থানার একজন চৌকিদার বৈষ্ণব ছিল, গোঁড়া বৈষ্ণবেরা "কাটা" কথাটা মুখে আনে না, শাক্ত ভক্তেরা শক্তিপূজায় পাঁটা বলিদান করে, সে বলিদানে সাধারণ কথা পাঁটা কাটা, সেই কারণে গোঁড়া বৈষ্ণবেরা "কাটা" কথার উপর ভারি চটা; যেখানে "কাটা" কথা বলিতে হয়, সেখানে তাহারা বলে, "বনায়"; যেমন ফল বনান, মাছ বনান, তরকারী বনান ইত্যাদি ইত্যাদি। যে চৌকিদারের কথা বলিতেছি, সেই বৈষ্ণব চৌকিদার একবার

ভারী মজা করিয়াছিল। সেই লোকটা যে পাড়ার চৌকিদার, সেই পাড়ায় এক ব্যক্তিকে সর্পাঘাত হইয়াছিল, অপঘাত মৃত্যুর সংবাদ থানায় জানাইতে হয়; সেই বৈষ্ণব চৌকিদার তদনুসারে থানায় গিয়া দারোগার কাছে এজাহার দিয়াছিল, "রামজি লস্করকে সাপে বনিয়েছে।" দারোগা অবশ্য হাস্য করিয়াছিলেন কিন্তু অর্থ বুঝিতে তাঁহার বাকী ছিল না। শুনিলে বাবা! গোঁড়া বৈষ্ণবের ঐ রকম ধরণ। জীবনকৃষ্ণ দত্ত সেই রকম বৈষ্ণব হইয়াছিল। এখন তাহার বিষয় আশয় সমস্তই গিয়াছে, সে এখন পথের ভিখারী! ছাই-ভস্মমাখা কৌপীনধারী!"

সূর্য্যকান্ত বাবু বুঝিলেন, তাঁহাকেই ঠেস্ দিয়া উপহাস করিবার মৎলবে ধূর্ত্ত উমানাথ ঐ গল্পটা রচনা করিয়াছিল। উঠিয়া যাইতেও বলিতে পারে না, বসাইয়া রাখিতেও ইচ্ছা হয় না, তিনি তখন উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। ওদিকে প্রবলবেগে বায়ু বহিল, প্রবলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সূর্য্যকান্ত বাবু একটু চিন্তা করিয়া উমানাথকে বলিলেন, "পরের কথার চর্চ্চা করা, পরের নিন্দা করা বড় দোষ; ভাগ্যে ছিল, জীবনকৃষ্ণ ফকির হইল, তাহাতে বিষ্ণুভক্তির উপর আপনার এত কোপ কেন? অন্য কথা থাকে ত বলুন, পরনিন্দা আমি শুনিতে চাহি না, ধর্ম্ম-নিন্দা শুনিলে আমার প্রাণে বড় ব্যথা লাগে।"

বাস্তবিক অন্য কথা বলিতে উমানাথের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বলা হইল না, বাবুর বিরূপভাব দেখিয়া মনের কথাটা সেদিন চাপিয়া গেল। যে সকল কথা বলিবার কোন আবশ্যক ছিল না, সেই সকল বাজে কথা তুলিয়া প্রায় এক ঘণ্টা কাটাইল।

বৃষ্টি ধরিয়া গেল, সহসা গাত্রোত্থান করিয়া সূর্য্যকান্ত বলিলেন, "আজ আমার অনেক কাজ আছে, আজ আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন।" এই কথা বলিয়াই তিনি বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন, হতাশ হইয়া উমানাথের দল বিদায় হইল।

এক মাস অতীত। ইয়ারের মজলিসে বসিয়া উমানাথ দর্প করিয়া বলিল, "সূর্য্যকান্তটা ভারী গোঁয়ার, সহজে উহাকে বাগাইতে পারা যাইবে না। দূর হউক, তাহার কাছে আর যাইব না। ছোটটার মেজাজ কিছু নরম, তাহাকেই পরামর্শ দিতে হইবে, প্রায় সর্ব্বদাই সে ভবশঙ্কর সেনের বৈঠকখানায় বসে, সেইখানে গিয়াই তাহার কানে মন্ত্র ফুঁকিতে হইবে; বাড়ীতে দেখা করা হইবে না, সূর্য্যকান্তটা বাগ্‌ড়া দিবে।"

সেই যুক্তি স্থির হইল, ইয়ারেরা করতালী দিয়া উমানাথকে শত শত বাহবা দিল। যখন পরামর্শ হয়, বেলা তখন প্রায় দুই প্রহর, সেই দিন অপরাহ্ণে সেই দল যেন যাত্রাওয়ালার মত সজ্জা করিয়া, দুই চারিজন ছোকরা সঙ্গে লইয়া ভবশঙ্করের বৈঠকখানায় উপস্থিত। যথার্থই চন্দ্রকান্ত সেদিন সেইখানেই ছিলেন, উমানাথ সৌভাগ্য মানিল। ভবশঙ্কর সেন কিছু কিছু ইংরাজী জানেন, মেজাজটাও কতকটা ইংরাজী ধরণের; চন্দ্রকান্ত বাবু তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছেন, পিতার অন্তিম উপদেশ ভবশঙ্করের সহবাসে অনেক দূর ভুলিয়া গিয়াছেন। উমানাথের দলকে হঠাৎ সেইখানে উপস্থিত দেখিয়া তিনি কিছু অন্যমনস্ক হইলেন; মনে মনে কি যে ভাবিলেন, তিনিই জানেন, হাস্য করিয়া উমানাথকে বলিলেন, "আজ যে দেখি যাত্রাওয়ালার সজ্জা; বসুন—বসুন, অভিপ্রায়টা কি?"

সদলে উপবিষ্ট হইয়া উমানাথ উত্তর করিল, "অভিপ্রায় তোমার সঙ্গে দেখা করা। বাড়ীতে গিয়াছিলাম, শুনিলাম, তুমি এইখানেই আছ, সেইজন্যই আসিতেছি।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, "ধন্য আপনার স্নেহ। আজ্ঞা করুন আমাকে কি কর্‌তে হ'বে।"

ভবশঙ্কর বৈঠকখানাতেই উপস্থিত ছিলেন, ঈষৎ হাস্য করিয়া তিনি বলিলেন, "আমার প্রতিও তরফদার মহাশয়ের বিশেষ অনুগ্রহ।"

হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া উমানাথ বলিল, "অনুগ্রহ নহে, তোমার গুণেই আমি তোমাকে ভালবাসি।"

খানিকক্ষণ মিষ্ট আলাপ হইল, গ্রামের কথা, গ্রামের লোকের কথা, সমগ্র বঙ্গদেশের কথা, আরও অগ্রসর হইয়া সুবিশাল ভারতভূমির কথা, বড় বড় ইংরাজ-লোকের কথা, ইংরাজের রাজত্ব এবং ইংরাজী ভাষার কথা, এই প্রকারের অনেক কথা উঠিল, ভবশঙ্কর অনেক কথায় সায় দিলেন, অনেক কথায় তর্ক-বিতর্ক করিলেন, কিন্তু চন্দ্রকান্তবাবু সে সময় ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না।

উমানাথের সঙ্গে যাহারা আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজনের নাম জটাধারী বিশ্বাস, পাঠক মহাশয়ের নিকটে এই লোকটী আজ নূতন। আকার দীর্ঘ, বিলক্ষণ স্থূলকায়, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, বুকে অনেক চুল, নাসিকা খর্ব্ব, চক্ষু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র; নাম জটাধারী কিন্তু মস্তকে জটা নাই, একগাছি চুলও নাই; মাথাটি নেড়া; বয়স অনুমান পঞ্চাশ বৎসর।

জটাধারী বিশ্বাস পাঠক মহাশয়ের চক্ষেও নূতন, চন্দ্রকান্ত-

বাবুর চক্ষেও নূতন, ভবশঙ্করের সঙ্গে তাহার জানাশুনা ছিল। ভবশঙ্কর তাহাকে অধিক বিশ্বাস করিতেন না, নিতান্ত ঘৃণাও করিতেন না। জটাধারী পূর্ব্বে কলিকাতায় ফ্রিচার্চ বিদ্যালয়ে (ডফ সাহেবের স্কুলে) ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিল, শিক্ষা যত ভাল হউক না হউক, মিসনরি সাহেবদিগের দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বিশ্বাসের বিশ্বাসটি অনেক পরিমাণে সেই দিকে টলিয়াছে, ভবশঙ্করবাবু কিছু কিছু ইংরাজী জানিলেও জটাধারীর মতের সহিত সকল বিষয়ে তাঁহার মতের ঐক্য হয় না।

উমানাথ আজিকার আসরে জটাধারীকে মুখপাত্র করিবার মৎলবে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। তাহার দিকে নয়ন ইঙ্গিত করিবামাত্র জটাধারী অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিল। প্রথমে ভূমিকা, তাহার পর আসর বন্দনা, তাহার পর পালা আরম্ভ। চন্দ্রকান্তবাবুর মুখপানে চাহিয়া সে প্রথমে আলাপ করিবার সূত্রপাত করিল; কিঞ্চিৎ নম্রস্বরে বলিল, "বাবু! আপনার সহিত আমার এই প্রথম সাক্ষাৎ, আপনার দাদাকে আমি চিনি, তাঁহার সহিত আমার আলাপ আছে। সর্ব্বদা আমি বাটীতে থাকি না, বিষয়-কর্ম্মের অনুরোধে বৎসরের অধিক দিন কলিকাতায় থাকিতে হয়। আপনাকে চক্ষে দেখি নাই বটে, কিন্তু আপনার গুণের কথা অনেকের মুখে অনেক শুনিয়াছি; অল্প বয়সে আপনি বিজ্ঞ হইয়াছেন, বিষয়-কর্ম্ম বেশ বুঝিয়াছেন, দীর্ঘজীবী হইয়া থাকুন, আপনার দ্বারা আমাদের গ্রামের অনেক উপকার হইবে, আমরা এইরূপ আশা রাখি।"

যথোচিত শিষ্টাচারে চন্দ্রকান্তবাবু তাহার ঐরূপ ভূমিকার উত্তর প্রদান করিলেন।

এই অবসরে উমানাথ বলিল, "জটাধারীকে আমি বড়ই ভালবাসি; ইহার মনে একটুও হিংসা নাই, যাহাতে লোকের হিত হয়, সে বিষয়ে ইহার বিশেষ যত্ন। যাঁহারা বিষয়াপন্ন লোক, তাঁহারা যদি জটাধারীর মত লোককে মন্ত্রীপদে বরণ করিয়া ইহার পরামর্শমতে কার্য্য করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিস্তর উপকার হয়।"

উমানাথের সুপারিশে জটাধারী এখন বিষয়ী লোকদিগের মন্ত্রী হইবার উপযুক্ত পাত্র হইল। ভবশঙ্করবাবু বলিলেন, "তাহা আমি জানি, তাহা আমি জানি, জটাধারী একজন উপযুক্ত লোক।"

দুইজনের বাক্যেই জটাধারীর উচ্চ প্রশংসা। মনে মনে হাসিয়া, মৎলব সিদ্ধ হইবার আনন্দে জটাধারী আরও একটু গম্ভীর হইয়া বসিল, অহঙ্কারে ফুলিল।

পাঠক মহাশয়কে জটাধারীর সত্য পরিচয় জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক। জটাধারী জাতিতে কায়স্থ, ইহার পিতা পূর্ব্বে এক জমিদার সরকারে নায়েবী করিত, সরকারী তহবিল তছরূপ করিয়া একবার দুইবৎসরের জন্য জেলে গিয়াছিল, জেলখানাতেই তাহার মৃত্যু হয়। জটাধারী তাহার একমাত্র পুত্র; ডফের স্কুলে ইংরাজী পড়িয়াছিল, খ্রীষ্টানী-তন্ত্রে মন তর তর, সে কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; এই ব্যক্তি এখন কলিকাতায় থাকিয়া দালালী কার্য্য করে। উকিল, মোক্তার, দালাল ও ঘটকদিগের বক্তৃতা-শক্তি বেশী হয়, বক্তৃতার ভিতর সত্য কথা কত থাকে তাহা সকলেই জানেন, জটাধারী অধিক সত্য কথা শিক্ষা করে নাই, যাহাতে লোকের মনোরঞ্জন হয়, তাহা বুঝিয়া সেইরূপ কথা

বলিতে ইহার বিশেষ ক্ষমতা। কিছু স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত, এই লোকটী বড়লোকের খোসামোদ করিতে খুব পটু। কেন খোসামোদ তাহা ইহার মত লোকেরা ভালই জানেন। প্রথমে যখন কোন সম্পত্তিশালী লোকের সহিত পরিচিত হয়, তখন যতদূর ভালমানুষ হওয়া সম্ভব ততদূর ভাল মানুষ সাজিয়া উচ্চ উচ্চ প্রসঙ্গের বক্তৃতা ধরে, ধর্ম্মের কথা বেশী বলে না, বিষয়-কর্ম্মের কথাতেই—বাবুলোকের গুণ-কীর্ত্তনের কথাতেই অধিক আনন্দ হয়; আসল মৎলব হৃদয়ের দ্বৈপায়ন হ্রদে নিমগ্ন থাকে, সময়ে সময়ে, অল্পে অল্পে, একটু একটু বাহির হয়। এ ক্ষেত্রে জটাধারী কিরূপ অভিনয় করিবে, অনুমান করিয়া বলা যায় না। পাঠক মহাশয় কিয়ৎক্ষণ প্রতীক্ষা করিলেই শুনিতে পাইবেন

পোলিটিকাল ইকনমির (Political economy) সুর ধরিয়া, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপাইয়া. জটাধারী আরম্ভ করিল,—আমাদের দেশটা দিন দিন দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে, সেটা কতক পরিমাণে বৈদেশীক কারবারের ফল, কতক পরিমাণে দেশের লোকের দোষ। আয়-ব্যয়-স্থিতির দিকে এদেশের অনেক লোকের দৃষ্টি নাই; যাহার যেমন আয়, তাহা বুঝিয়া ব্যয় করা অনেকের অভ্যাস নাই; আয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় করিয়া অনেক লোক শীঘ্র শীঘ্র দেনদার হইয়া পড়ে, শেষকালে ফতুর হয়। ন্যায্য ব্যয় অপেক্ষা অনেকের অপব্যয় অধিক, সেই কারণেই অনেক পরিবার গরীব হইয়া যাইতেছে। আমি বলিতে পারি, দেশের ব্যবহারের দোষে অনেকে বাজে খরচ করিতে বাধ্য; বাজে খরচ না করিলে মানী লোকের মান সম্ভ্রম থাকে না, এই অছিলা তুলিয়াই লোকে নানা দিকে নানা প্রকার বাজে খরচ করে।

তাহারা বলে, সংসারে থাকিতে হইলে সে রকম না করিলে চলে না; লোকের দেখা দেখি নূতন নূতন লোকেরাও অনুকরণ করিতে শিক্ষা করে। মনে করুন, একজন জমীদার আপনার সংসার প্রতিপালন করিয়া নানা প্রকার ভৌতিক ক্রিয়াকাণ্ডে অজস্র ব্যয় করিয়া থাকেন, তাঁহার সংসারে অনেক পরগাছা আসিয়া জড় হয়, তাঁহাদিগকে দূর করিয়া দিলে অপর লোকে নিন্দা করে; পাঁচ ভাই এক সংসারে থাকিলে পিতার মৃত্যুর পর পৈতৃক বিষয় পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়, অথচ পাঁচজনকেই দেশের পদ্ধতি অনুসারে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্রিয়া-কলাপ নির্ব্বাহ করিতে হয়; কাজে কাজেই আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইয়া পড়ে, কাজে কাজেই ধনবানের সন্তানেরা দিন দিন গরীব হইতেছে। যে দেশের ব্যবহারে ধনীর বহু পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র বিষয়াধিকারী হয়, অপর পুত্রেরা নিজ নিজ শ্রমসাধ্য কার্য্যে জীবিকা অর্জ্জন করে, সে দেশে অধিক লোক বড়মানুষ থাকে; আমাদের দেশে সেরূপ হয় না। যাঁহাদের জমীদারী নাই, তাঁহাদের পরিবার মধ্যে একজন উপার্জ্জনক্ষম হইলে পরিবারস্থ অপর ভ্রাতারা তাঁহারই স্কন্ধে ভর করিয়া থাকে, আলস্যের দাস হইয়া বাবুগিরি করিতে রত হয়, ইহা ব্যতীত বৎসরের মধ্যে নানা প্রকার প্রতিমা পূজা, পরলোকগত পিতা-মাতার শ্রাদ্ধ ইত্যাদি ভৌতিক ব্যাপারে অনর্থক বিস্তর টাকা নষ্ট হয়; এই সকল কারণে দিন দিন আমাদের দেশে ধনবানের সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে, দেনাদারের সংখ্যা বাড়িয়া উঠিতেছে। যাঁহারা ইংরাজের ইন্‌সলভেণ্ট কোর্টের বার্ষিক রিপোর্ট আলোচনা করেন, তাঁহারা আমার বাক্যের সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।

দেউলিয়া আদালত অনেক লোকের অপকার করিতেছে, জন কতক লোকের উপকার করিতেছে। ইন্‌সলভেণ্ট কোর্টের আইনানুগত নাম "যোত্রহীন ঋণিগণের পরিত্রাণার্থ আদালত।" ওঃ! একদলের পরিত্রাণ হয়, সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি মহাজনের দাবীদাওয়া ডুবিয়া যায়। ধনীলোকের অপব্যয় না থাকিলে কথনই এরূপ হইত না।

জটাধারী যতক্ষণ কথা কহিল, চন্দ্রকান্তবাবু তত্তক্ষণ এক-দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তর-সাগরে নানা প্রকার তরঙ্গ উঠিতেছিল; তিনি ভাবিতেছিলেন, লোকটা অনেক লোকের কথা বলিতেছে, মৎলব কি? বোধ করি, আমাদের সংসারকে লক্ষ্য করিতেছে। আমাদের সংসারে বহুপরিবার একত্র, নিজ পরিবার কম, আমরা বহুপরিবার পালন করি, বৎসরে অনেক প্রকার ক্রিয়া কর্ম্ম হয়, অবশ্যই ব্যয় অধিক হইয়া থাকে, লোকটা হয় ত তাহা বন্ধ করিবার পরামর্শ দিতে প্রস্তুত। চন্দ্রকান্ত বাবু ভাবিলেন এইরূপ, চিত্ত কিছু চঞ্চল হইল, কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না; বক্রনয়নে ভবশঙ্কর বাবুর দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন।

জটাধারীও অলক্ষিতে একবার উমানাথের ও একবার ভবশঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া কেমন এক প্রকার নেত্রসঙ্কেত করিল; সেইরূপ সঙ্কেতে উমানাথ তাহাকে উৎসাহ দিয়া মুখ ফিরাইল।

জটাধারী আবার আরম্ভ করিল, "হাঁ, দেশে ধনবানের সংখ্যা কমিতেছে। ধনী-সন্তানেরা যদি পরের উপর সমস্ত কার্য্য নির্ভর না রাখিয়া আপনারা সর্ব্বদা বিষয়-কার্য্য দেখেন, অনর্থক

বহুপরিবার পোষণের ভার গ্রহণ করিয়া দায়গ্রস্থ না হন, বাজে খরচ যদি কমাইয়া দেন, তাহা হইলে অনেকটা মঙ্গল হইতে পারে। আমি শুনিয়াছি, একজন গরিবের ছেলে অঙ্কশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া একজন রাজার দপ্তরখানায় তাইদনবিস মুহুরী হইয়াছিল, বৎসরান্তে মফস্বলের নায়েব গোমস্তাদের আখিরি হিসাব যখন সদর কাছারীতে দাখিল হয়, সেই মুহুরী তৎকালে দাওয়ানজীর পার্শ্বে বসিয়াছিল, দাওয়ানজী মহাশয় যখন একাকী কাগজপত্র দর্শন করিতেছিলেন, মুহুরী সেই সময় হেঁট হইয়া এক একখানা খাতার উপর সূক্ষ্ম নজর রাখিতেছিল, যেখানে যেখানে ভুল আছে, যেখানে যেখানে অসম্ভব খরচ লেখা আছে, সেই স্থানগুলি দাওয়ানজীর চক্ষের নিকট ধরিয়া দিতেছিল; দাওয়ানজী তাহার ক্ষমতা দেখিয়া মনে মনে তুষ্ট হইতেছিলেন। একবার আখিরী নিকাসের সময় সেই বালক কয়েকটা মহলে পাঁচ হাজার টাকা চুরি বাহির করিয়াছিল; সেই বিষয় রাজার কর্ণগোচর হয়; রাজা তাহাকে ডাকাইয়া নিকটে বসাইয়া অনেক প্রকারে পরীক্ষা করেন, বালক সেই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে রাজা তাহাকে অনেক টাকা পুরস্কার দেন, সেরেস্তায় একটা উচ্চপদ প্রদান করিবার প্রস্তাব করেন; নমস্কার করিয়া বালক সেই পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে; সে বলিয়াছিল, মহারাজের অনুগ্রহ থাকিলেই আমার ভাগ্য প্রসন্ন হইবে, আমি চাকরী করিব না; কারবারে আমার বড় সাধ, অনুগ্রহ করিয়া, যাহা আমাকে দান করিলেন, তাহাই মূলধন করিয়া আমি একটা কারবারে নামিব। বালকের কথা শুনিয়া রাজা পরম সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, খানিকক্ষণ চুপ করিয়া

থাকিয়া শেষকালে বলিয়াছিলেন, বালক ! তোমার সাহস দেখিয়া আমি বড় খুসী হইয়াছি, বকৃশিসের টাকা তোমার কাছেই থাকুক, তোমার কারবারের জন্য মূলধন আমি স্বতন্ত্র দিতেছি। এই বলিয়া দয়ালু রাজা তাহাকে আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিলেন; পাঁচ বৎসর কারবার করিয়া সেই বালক বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা আয়ের জমীদারী কিনিয়াছিল, নিজেই জমীদারীর কার্য্যকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিত; বৎসর বৎসর তাহার জমীদারী বাড়িতে লাগিল। যে রাজার কৃপায় তাহার তত সৌভাগ্য, বৎসরে দুইবার সেই রাজার কাছে উপস্থিত হইয়া নূতন জমীদার ভক্তিভাবে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আসিত; পরিশেষে সেই দরিদ্র বালক নবাব সরকার হইতে রাজা উপাধি পাইয়াছিল। নিজের চক্ষে নিজের বিষয়-কর্ম্ম দেখায় এত ফল।

যাহারা যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল, চন্দ্রকান্ত ব্যতীত তাহারা সকলেই একবাক্যে বলিল, "বাহবা জটাধারী! বেঁচে থাক দাদা! তোমার বক্তৃতা শুনিয়া আমাদের চৈতন্য হইল।"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, উমানাথের সেদিনের দলটা যেন যাত্রার দল। যাত্রাদলে অনেক সং থাকে, সে দলেও দুটী সং ছিল; খড়িমাখা, কালিমাখা, লেজওয়ালা সং ছিল না, কেবল লম্বা লম্বা দাড়ি ছিল, মাথায় এক একটা পাগড়ী ছিল, আসরে দণ্ডায়মান হইয়া তাহারা নানা প্রকার ভঙ্গি করিয়া, হাত তুলিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল।

দাড়িওয়ালারা ব্রাহ্মণের সন্তান, কিন্তু তাহাদের পইতা ছিল না; পণ্ডিত কেশবচন্দ্র সেনের দলে মিশিয়া তাহারা পইতা

ফেলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী সাজিয়াছিল, বড় বড় চাপদাড়ী রাখিয়াছিল, অভাব ছিল, চস্‌মার। প্যারি কবিরত্নের একটী গীতে লেখা আছে,—"চাপ দাড়ি রাখা, চোকে চস্‌মা ঢাকা, ভয়ানক ঢং চেগেছে বাংলাতে।"

কথাটা ঠিক। যাহারা আজকাল দাড়ি চস্‌মা ধারণ করে, তাহারাই ব্রহ্মজ্ঞানী। দাড়ি চস্‌মা না থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না, ইহাই তাহাদের ধারণা।

সঙেরা নৃত্য করিতে করিতে জটাধারীকে বিস্তর বাহবা দিল। চন্দ্রকান্ত বাবু অবাক!

বৈকালে মজলিস্ বসিয়াছিল, রাত্রি চারিদণ্ড পর্য্যন্ত ঐরূপ অভিনয়। মজলিস্ ভঙ্গ হইল, সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তাহার পরদিন হইতে প্রতি সপ্তাহে জটাধারী বিশ্বাস নির্জ্জনে চন্দ্রকান্ত বাবুর সহিত দেখা করিতে আরম্ভ করিল। বাবুদের একটী বাগানে একখানী সৌখিন আটচালা,—সেই আটচালাতে সাক্ষাৎ। প্রতি সপ্তাহে জটাধারী বিশ্বাস নানা প্রকার ভূমিকা করিয়া, নানা প্রকার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, চন্দ্রকান্ত বাবুকে সংসারতত্ত্ব বুঝাইত। ক্রমাগত ছয় মাস। অবসর বুঝিয়া জটাধারী একদিন চন্দ্রকান্তবাবুকে বলিল, "দেখুন বাবু, সাবালক হইলেও আপনি এখন বালক, আপনার বুদ্ধি এখনও কাঁচা, সংসারের গতি এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। এখন আর সত্যযুগ নাই, ঘোর কলিকাল; এ যুগে প্রায় সকলেই আপনার আপনার লাভের দিকে টানে; আমরা দেখিতে পাই, আপনি সেদিকে মন রাখেন না। দাদার উপর সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন; দাদার স্বভাব ভাল হইলেও

ভবিষ্যত ভাবিতে হয়। চিরদিন সকলের মন সমান থাকে না, কখন কি রকম ঘটে, কেহই বলিতে পারে না।"

চন্দ্রকান্ত বাবু তাহার দাদাকে পিতৃতুল্য ভক্তি করেন, সকল কার্য্যেই দাদার আজ্ঞাবহ, দাদা যাহা করেন, তাহাই তাহার মঞ্জুর। জটাধারীর কথার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া সহসা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আমাকে কি করিতে বলেন?"

নিজের নেড়া মাথায় হাত বুলাইয়া, একটু ইতস্ততঃ করিয়া, জটাধারী বলিল, "দেখুন, আপনি এক কাজ করুন, স্বচক্ষে বিষয়-কর্ম্ম দেখুন; বৎসরে কত টাকা জমা, কত টাকা খরচ, তাহার হিসাব পরীক্ষা করুন।"

কথা কহিতে কহিতে জটাধারী এক একবার আড়ে আড়ে চন্দ্রকান্তের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল, মুখের ভাব কখন কিরূপ হয়, তাহাই দেখিবার মৎলব। ভাব বুঝিয়া, মনে মনে হাসিয়া জটাধারী আবার বলিতে লাগিল, "আর একটী কথা বলি;—আপনাদের সংসারে অনেক আগাছা জুটিয়াছে। বাবার পিসী, বাবার ভগ্নী, তাহাদের সন্তান-সন্ততি, আবার গোটা কতক বউ, দুই তিনজন ঘরজামাই, তাহা ছাড়া, পাতান সম্পর্কে কতকগুলা বাজে লোক, তাহাদের জন্য বিস্তর বাজে খরচ হয়; আপনি কেবল হরিনাম করিয়া কাল কাটান, সে সকল উৎপাত দেখিয়াও দেখেন না। ভাবুন দেখি, এত উপসর্গ কেন?"

অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া চন্দ্রকান্ত বাবু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহাদিগকে আমি কি বলিব? বাবার আমল হইতে

তাহারা রহিয়াছে, আমরা তাহাদিগকে নিজের পরিবার বলিয়া জানি; বিদায় করিয়া দিলে তাহারা কোথায় যাইবে?"

জটাধারী বলিল, "নিজের পরিবার! একজনের সৌভাগ্য হইলে অনেক বাজে লোক তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া নিজের পরিবার হয়, তাহা হয় ত আপনি জানেন না; তাহারা খায়, পরে, বাবুগিরি করে, সংসারের মঙ্গল চায় না। আপনি তাহাদিগকে তফাৎ করুন।"

চমকিয়া চন্দ্রকান্ত বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা কি বলিবেন?"

জটাধারী বলিল, "ঐ কথাই ত কথা! ঐ কথাই ত আমি বলিতেছি। দাদার মতে গা ঢালিয়া দিলে আপনার নিজের মঙ্গলে বাধা পড়িবে। আমি কিছু বলিয়াছি এ কথা না তুলিয়া দাদাকে আপনি পরামর্শ দিন; সৎপরামর্শ। দাদা যদি তাহাতে রাজী না হন, দাদার সহিত আপনি পৃথক হউন, বাড়ী ঘর, বাগান পুষ্করিণী, পৈতৃক জমিদারী সমান সমান ভাগ করিয়া লউন, সকল দিকে মঙ্গল হইবে। পৃথক হইলে দাদার সহিত সদ্ভাব ঘুচিবে না, দুজনেই সুখে থাকিবেন। দাদা যদি আগাছা পোষণ করিতে ভালবাসেন, নিজের অংশ হইতে স্বচ্ছন্দে পোষণ করুন, সে দায় হইতে আপনি অব্যাহতি পাইবেন। পরামর্শ শুনুন, আপনি পৃথক হউন।"

বিষণ্ণবদনে একটু চিন্তা করিয়া চন্দ্রকান্ত বলিলেন, "তাহা আমি পারিব না।"

ফিকির ভাসিয়া যায়, সেইরূপ লক্ষণ দেখিয়া জটাধারী বলিল, "এখন আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না, সেই জন্য

আমার কথা ভাল লাগিতেছে না, কিছুদিন পরে পস্তাইতে হইবে। আচ্ছা, শীঘ্র যদি সে কাজটা করিতে না পারেন, আর একটা কাজ করুন। কর্ত্তার মৃত্যুর পর হইতে সংসারে কত টাকা আয় হইয়াছে, কত টাকা ব্যয় হইয়াছে, জমা খরচ দেখুন।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, "দাদার কাছে নিকাশ লওয়া ! ও পরমেশ্বর ! সে কাজ আমার দ্বারা হইবে না।"

জটাধারী দেখিল, বেগতিক। মনে মনে ভাবিল, দু-একদিনের কর্ম্ম নয়, শীঘ্র শীঘ্র মৎলব হাসিল হইবে না, রহিয়া সহিয়া, ধীরে ধীরে চেষ্টা করিতে হইবে ; এইরূপ ভাবিয়া শেষকালে বলিল, "আচ্ছা, আপনি ভাল করিয়া বিবেচনা করুন। হরিনামের ঝেঁাকে এদিকে আপনার মতি স্থির হইতেছে না, ইহা আমি বুঝিতে পারিতেছি। মতি স্থির করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন, সংসারের মঙ্গল করা হরির সাধ্য নয়, নিজের নিজের সাধ্য।" ৯

চন্দ্রকান্ত বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, শেষ কথার কোন উত্তর দিলেন না, 'আবার আসিব' বলিয়া জটাধারী সেদিন বিদায় হইল। চন্দ্রকান্ত ভাবিলেন, না আসাই মঙ্গল।

ভাই ভাই পবিত্র সদ্ভাব ; কনিষ্ঠের প্রতি জ্যেষ্ঠের যেরূপ স্নেহ, জ্যেষ্ঠের প্রতি কনিষ্ঠেরও তদ্রূপ ভক্তি ; তাদৃশ ভক্তিভাজন জ্যেষ্ঠ সহোদরকে পরিত্যাগ করিয়া পৃথক হইতে হইবে, ইহা ভাবিয়া চন্দ্রকান্তের মন বড় ব্যাকুল হইল, নির্জ্জনে আপন শয়নকক্ষে বসিয়া অনেকক্ষণ ইহাই তিনি ভাবিলেন, শেষে মনে মনে সিদ্ধান্ত হইল, না—তাহা আমি পারিব না।

চন্দ্রকান্তের মনে আর এক ভাবনা। আমরা যদি পৃথক হই, বিমাতা কাহার কাছে থাকিবেন। রাধারাণী অতি সরলা। সৎস্বভাবা, অকপট স্নেহবতী। সচরাচর সপত্নী-পুত্রের প্রতি বিমাতার যেরূপ হিংসা হয়, রাধারাণীর সেরূপ হিংসা নাই। হিংসা দূরে থাকুক, সপত্নী-পুত্র দুটীর প্রতি তাঁহার গর্ভজাত পুত্রের ন্যায় অকৃত্রিম স্নেহ। সারদাকে তিনি যেমন ভালবাসেন, ব্যবহার দেখিলে বোধ হয়, যেন সূর্য্যকান্ত ও চন্দ্রকান্তকে তিনি তদপেক্ষা অধিক ভালবাসিয়া থাকেন। চন্দ্রকান্ত বিমাতার সেই ভালবাসা স্মরণ করিলেন, চিত্ত বিচলিত হইল।

ছোট বধূ সে সময় পিত্রালয়ে ছিল। চন্দ্রকান্ত বাবু একাকী নানা চিন্তায় বিহ্বল হইয়া অনেকক্ষণ জাগরণ করিলেন, শেষ-রাত্রিতে নিদ্রা আসিয়াছিল, তাহাও সুস্থনিদ্রা নহে; চমকিয়া চমকিয়া দুই ঘণ্টার মধ্যে তিনবার জাগিয়া ছিলেন।

রজনী প্রভাত হইল। সূর্য্যকান্ত বাবু প্রাতঃস্নান, হরিপূজা করিয়া, চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়াছিলেন, চন্দ্রকান্ত তাঁহার নিকটে গিয়া বসিলেন। একবার মুখপানে চাহিয়াই বড়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি! তোমার মুখখানি আজ এমন মলিন কেন? কি ভাবিতেছ তুমি?"

সাধ্যমত সাবধান হইয়া ছোটবাবু উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে না, ভাবনা কিছুই নাই, তবে কিনা রাত্রে ভালরূপ নিদ্রা হয় নাই, সেই জন্যই বোধ হয় মলিন মলিন দেখিতেছেন।"

সূর্য্যকান্তের সন্দেহ হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, ভিতরে কিছু আছে। আমি বুঝিতে পারিতেছি, দুষ্ট লোক লাগিয়াছে, আমার কানেও কুমন্ত্র দিতে আসিয়াছিল, সুবিধা

পায় নাই; আমার কাছে মুখ না পাইয়া বোধ হয় চন্দ্রকান্তকে পাইয়া বসিয়া থাকিবে। চন্দ্রকান্ত ছেলেমানুষ, ধূর্ত্তের কুমন্ত্রণায় মন চঞ্চল হওয়া বিচিত্র নহে। এইরূপ চিন্তা করিয়া চন্দ্রকান্তকে পুনরায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত বেলায় উঠিয়াছ, পূজা আহ্নিক না সারিয়া অগ্রেই এখানে আসিলে কি জন্য? আমাকে কিছু বলিবার আছে কি?"

একটু ভাবিয়া চন্দ্রকান্ত উত্তর করিলেন, "নূতন কিছুই নাই, এবৎসর দুর্গোৎসবে একদল যাত্রা দিলে ভাল হয়। আমাদের বাটীতে যাত্রা হয় না, পাড়ার দু-তিনটী লোক সেই কথা তুলিয়া আমাকে লজ্জা দিতেছিল।"

হাস্য করিয়া বড়বাবু বলিলেন, "বৈশাখমাসে দুর্গাপূজার কথা? না ভাই, তোমার মনে আরও কিছু আছে। আমার যেন মনে হইতেছে, কোন লোক তোমাকে কিছু—"

বড়বাবু আর কিছু বলিতে না বলিতে ছোটবাবু চমকিত হইয়া তাঁহার কথার উপর কথা ফেলিয়া শীঘ্র শীঘ্র বলিলেন, "কেহ আমাকে কোন মন্দ কথা বলে এমন সাধ্য কাহারও নাই। গ্রামের সকলেই কর্ত্তাকে ভয় করিত, আপনাকেও ভয় করে।" দাদাকে এই কথা বলিলেন বটে, কিন্তু মনের ভিতর যেন একটা তুফান ছুটিতে লাগিল। ভাবিলেন, ও বাবা! দাদা আমার দৈবজ্ঞ না কি? ঠিক অনুমান করিয়াছেন। ধর্ম্মের বল বড় বল, ধর্ম্মপ্রভাবে হৃদয় পবিত্র, আমার প্রতিও অকপট স্নেহ, আমার মুখখানি একটু মলিন দেখিয়া নিশ্চয়ই কাতর হইয়াছেন। এমন দাদাকে ছাড়িয়া কদাচ আমি পৃথক হইতে পারিব না।

লক্ষণে কনিষ্ঠকে চিন্তাকুল দেখিয়া সূর্য্যকান্ত বাবু পুনরায়

বলিলেন, "পাড়ার লোকেরা আমাকে ভয় করে, অমন কথা ভাবিও না। আমি বুঝিতেছি, আমাদের উপর অনেকের হিংসা আছে।"

ছোটবাবু বলিলেন, "থাকে থাকুক, হিংসা করিয়া কি করিবে? আপনাকে লইয়া আমি—"

কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই একটী লোক হঠাৎ সেইখানে আসিয়া হাজির। সূর্য্যকান্তকে নমস্কার করিয়া সেই লোক বলিল, "একটা বিশেষ কাজের জন্য আপনার কাছে আসিয়াছি।"

সূর্য্যকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?"

লোক উত্তর করিল, "জটাধারী বিশ্বাস আমার শ্বশুর. তিনি আমাকে—"

কেমন একটা সন্দেহ আনিয়া সূর্য্যকান্ত বাবু বলিলেন, "তোমার শ্বশুরের সহিত আমার অনেক দিন দেখা হয় নাই, হঠাৎ তিনি তোমাকে কি কাজের জন্য পাঠাইয়াছেন?"

লোক বলিল, "আপনি যদি আমাকে পুলিসের সাহেবের কাছে একটা সুপারিশ্ করিয়া দেন, তাহা হইলে আমার একটা চাকরী হয়।"

বড় বাবু বলিলেন, "দুঃখিত হইলাম, কোন সাহেবের সহিত আমার আলাপ নাই। তোমার শ্বশুর অনেক সাহেবের কাছে বেড়ান, সুপারিশের জন্য আমার কাছে তোমাকে পাঠান কি কারণে?"

লোক বলিল, "তাঁহার সুপারিশের চেয়ে আপনার সুপারিশে অধিক জোর হইবে, আপনি জমিদার, আপনার ক্ষমতা অধিক, সেই কারণ।"

বড়বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, আজ তুমি যাও, তোমার শ্বশুরের সঙ্গে দেখা হইলে পরামর্শ করিয়া এ কথার আমি জবাব দিব।"

লোকটা তখন কট্‌মট চক্ষে একবার চন্দ্রকান্তের দিকে চাহিয়া নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

চন্দ্রকান্তকে অন্যমনস্ক দেখিয়া সূর্য্যকান্ত বলিলেন, "তুমিও এখন বাটীর ভিতর যাও, রাত্রে নিদ্রা হয় নাই বলিতেছ, স্নান-আহ্নিক করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম কর গিয়া। বেলা হইল।"

চন্দ্রকান্ত উঠিয়া গেলেন। সূর্য্যকান্ত সেই লোকটার কথা ভাবিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন, শুনিয়াছি, জটাধারী বিবাহ করে নাই, তবে তাহার জামাই কিরূপে হইল? ওঃ! সমস্তই জাল!

সেই দিন অবধি চন্দ্রকান্ত বাবু বড় একটা বাটীর বাহির হইলেন না, একদিন কেবল ভবশঙ্কর সেনের বৈঠকখানায় গিয়াছিলেন, সেখানে জটাধারীর কথার প্রসঙ্গ উঠিয়াছিল, অধিকক্ষণ সেখানে বিলম্ব না করিয়া ক্ষুণ্নমনে শীঘ্র শীঘ্র উঠিয়া আসিয়াছিলেন। মনে সুখ নাই। আটদিন অতীত হইল, তিনি ভাবিতে লাগিলেন, জটাধারী বিশ্বাস দেখা করিবে বলিয়া গিয়াছে, তাহার কথা শুনিব না। তথাপি একবার দেখা দেওয়া উচিত। এইরূপ স্থির করিয়া সেইদিন বৈকালে একবার তিনি বাগানে বেড়াইতে গেলেন, আটচালায় গিয়া বসিলেন; সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় জটাধারী দেখা দিল, আসিয়াই বলিল, "দুদিন আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছি, দেখা পাই নাই।"

উদাসভাবে চন্দ্রকান্ত বলিলেন, "বসুন।"

জটাধারী বসিল; গোটাকতক কথা রচনা করিয়া চন্দ্রকান্তকে

একটু উৎসাহ দিল, শেষকালে বলিল, "যাহা বলিয়াছিলাম, সে বিষয়ে কিরূপ বিবেচনা করিলেন।"

উত্তর দিবার ইচ্ছা ছিল না, তথাপি চন্দ্রকান্ত একটু মৃদুস্বরে বলিলেন, "বিবেচনা আমার আসিতেছে না, সে সকল কথা আমার কাছে আর আপনি উত্থাপন করিবেন না। দাদা আমার সাক্ষাৎ দেবতা।"

জটাধারী বলিল, "দেবতা আপনাদের অনেক; লোকে যাহাতে সুখে থাকে, দেবতারা সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখে না। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাতেই সুখ।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, "আজ আমার ভারি অসুখ, সুখের গল্প শুনিবার সময় নয়, আপনি অন্য কোন কথা বলিতে যদি ইচ্ছা করেন, বলিতে পারেন।"

সন্ধ্যা হইল। বাগানের একজন মালি আসিয়া আটচালার বিছানার ধারে একটা সেজ জ্বালিয়া দিয়া গেল। জটাধারী নেড়ামাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "অন্য কথা আপনি শুনিতে ভালবাসেন, কাজের কথা শুনিতে চান না, ইহা আপনাদের একটা মস্ত দোষ। আপনারা ভাবেন, জমিদারের সন্তান, সংসারের ভাবনা ভাবিতে হয় না, বাজে কথা লইয়া আমোদ করাই আপনাদের কার্য্য। আমি সংসারী মানুষ, বাজে কথা আমার ভাল লাগে না। আচ্ছা, তাহাই যদি আপনি শুনিতে চান, শুনুন একটা বলি।"

এই বলিয়া সুর ভাঁজিয়া জটাধারী বলিতে লাগিল, "রাম-সেবক সাণ্ডেলের নাম আপনি শুনিয়া থাকিবেন। তাহারা পাঁচ ভাই, অনেকদিন এক সংসারে ছিল, বড় ভাই কর্ত্তা হইয়াছিল,

বিষয়ের আয় ছিল বৎসরে প্রায় আড়াই হাজার টাকা। বড় ভাই সেই রামসেবক। সেই রামসেবক কিছুদিন কর্ত্তৃত্ব করিয়া সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিল, ভাইগুলিকে ফকির করিয়াছিল; সেই রামসেবক এখন বেশ বাবুগিরি করিতেছে, ভাইগুলি দু-পাঁচ টাকার চাকরির জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছে।"

বিরক্ত হইয়া চন্দ্রকান্তবাবু বলিলেন, "আপনার কেবল একস্থর, ফিরাইয়া ঘুরাইয়া কেবল আপনি ঐ সব কথা পাড়েন। উহা শুনিতে আমার বড় কষ্ট হয়। আরতির সময় হইয়াছে, আমি ঠাকুর ঘরে চলিলাম, যদি ইচ্ছা হয়, আর একদিন আসিবেন, ইচ্ছা না হয়, আসিবেন না।"

বলিয়াই চন্দ্রকান্তবাবু বাগান হইতে বাহির হইয়া গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন। সেদিনও হতাশ হইয়া জটাধারীকে ফিরিতে হইল।

এই রকম প্রায় আরও ছয়মাস। হপ্তায় হপ্তায় জটাধারী সেই বাগানে আসিয়া দেখা করে, আসল মৎলব যাহা, অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া তাহাই ব্যক্ত করে, এক একদিন উমানাথকে সঙ্গে লইয়া আইসে, উমানাথের সঙ্গে সেই দলের আরও দুই একজন থাকে, কেবল একঘেয়ে কথাবার্ত্তা চলে।

লোকের মন ফিরাইতে সর্ব্বত্র বেশীদিন লাগে না। যাহারা বোকা, তাহারা শীঘ্রই ভুলিয়া যায়, যাঁহারা কিছু দৃঢ়চিত্ত, তাঁহাদিগকে ভুলাইতে কিছু বেশী দিন লাগে। ক্রমাগত এক বৎসর কাল নানাপ্রকার কুমন্ত্রণা দিয়া জটাধারী চন্দ্রকান্তবাবুকে নিজের মতে আনিল, চন্দ্রকান্ত বাবু অল্পে অল্পে সহোদরের নিকট সংসারের জমা-খরচ দেখিতে চাহিলেন। বড়বাবু বুঝিলেন, শত্রু

লাগিয়াছে, চন্দ্রকান্ত আমার কাছে নিকাশ চায়! আর মঙ্গল নাই! তিনি হিসাব দেখাইলেন, জমা-খরচ এক সমান, বামের দক্ষিণের উভয় অঙ্কই সমান সমান, কৈফিয়তে কিছুই জমা নাই। হিসাব দেখিয়া চন্দ্রকান্ত স্থির করিলেন, সত্যই বাজে খরচ অনেক। জটাধারীর কথা, উমানাথের কথা, ভবশঙ্করের আভাস সমস্তই সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইল। আরও ছয়মাস গেল। চন্দ্রকান্তের দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল; সহোদরের সহিত তিনি পৃথক হইলেন, বিষয়-আশয় বাঁটোয়ারা হইল, বাটীখানি ভাগ করিয়া লইবার কথা উঠিল। চণ্ডীমণ্ডপ ভাগ হইলে ক্রিয়াকর্ম্ম হইবে না, দুর্গোৎসব বন্ধ হইবে, ইহা ভাবিয়া বড়বাবু প্রস্তাব করিলেন, চণ্ডীমণ্ডপের তোমার অর্দ্ধাংশের যে উচিত মূল্য হয়, তাহা আমি দিব, চণ্ডীমণ্ডপ আমার থাকুক।

কর্ত্তার পিসী, ছেলেদের মাসী, তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিগণ সংসার হইতে দূরীভূত হইল। বাকী রহিলেন রাধারাণী। তাঁহাকে ভাগ করিয়া লওয়া অসুবিধা বোধ হইল। ছয়মাস বড়বাবুর সংসারে, ছয়মাস ছোটবাবুর সংসারে থাকিতে রাধারাণীর ইচ্ছা হইল না, কন্যাটী লইয়া তিনি পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন, মাসিক পঞ্চাশ টাকা মাসোহারা বরাদ্দ হইল।

এই সময় বাগানের আটচালায় প্রতিদিন ফুল মজলিস; মজলিসের সভাপতি চন্দ্রকান্ত কিম্বা জটাধারী কিম্বা উমানাথ, সকল দিন তাহা বুঝা যায় না। জটাধারী একদিন চন্দ্রকান্তকে বলিল, "আপনি আর একটী কাজ করুন। পল্লীগ্রামের ছোট বাড়ী দুই ভাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বাস করা হইতেছে, তাহাতে সুবিধা হইতেছে না; বিশেষতঃ মেয়েতে মেয়েতে

কলহ হইবার সম্ভাবনা, সেটাও ভাল নয়, মনে শান্তি থাকে না। কলিকাতায় আপনার পিতার একখানি বাটী আছে, তাহা আপনি জানেন, সে বাটীতে অপর লোক থাকে, ভাড়া চলে; ভাড়াটিয়া উঠাইয়া দিয়া, পরিবার লইয়া আপনি সেই বাটীতে গিয়া বাস করুন; ভদ্রাসনে আপনার যে অংশ, দাদার নিকট হইতে তাহার মূল্য আদায় করুন।"

চন্দ্রকান্ত এখন মন্ত্রীদলের হস্তে কলের পুতুল, তাঁহার হরিভক্তি উড়িয়া গেল, পূজা-আহ্নিক পরিত্যক্ত হইল, তিনি পরিবার লইয়া কলিকাতায় জানবাজারের বাটীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সংসারটী ভাঙ্গিয়া গেল, হরকান্তবাবুর সুখের সংসারে আগুন লাগিল। কলিযুগের এই এক প্রকার ভবের খেলা!

সপ্তম কল্প।

তুমি আমার হও!

বাবু সূর্য্যকান্ত রায় বালিকা পত্নী লইয়া হলধরপুরে রহিলেন, চন্দ্রকান্তবাবু বালিকা পত্নী লইয়া কলিকাতাবাসী হইলেন, এক বৎসর উভয় সহোদরে আর দেখা শুনা নাই। সূর্য্যকান্ত ভ্রাতৃবিচ্ছেদে সর্ব্বক্ষণ বিষণ্ণ, চন্দ্রকান্ত সঙ্গদোষে সর্ব্বক্ষণ আমোদিত। সূর্য্যকান্তের কাছে মোসাহেব ঘেঁসিতে পারে না, কিন্তু চন্দ্রকান্তের নিকটে মোসাহেবের পঙ্গপাল। যে সকল কুচক্রী লোক তাঁহাকে ভদ্রাসন বাটী হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছে, তাহাদের মধ্যে দু-একজন প্রায় সর্ব্বদাই জানবাজারে আসিয়া তাঁহাকে নূতন নূতন কুমন্ত্রণা দেয়। উমানাথ ও জটাধারী তাহাদের সর্দ্দার। চন্দ্রকান্তকে তাহারা বুঝাইতে লাগিল, মফঃস্বলের জমিদারীতে কি কি কাণ্ড হয়, আপনি তাহা জানেন না; নায়েব গমস্তারা ক্রমাগতই লুট করে, জমিদারগণের যাহা ন্যায্য প্রাপ্য, তাহার উপরেও তাহাদের আক্রমণ। আপনাদের জমিদারীতে যে সকল নায়েব গমস্তা আছে, তাহারা অনেক দিনের পুরাতন; হরকান্তবাবু নিতান্ত ভালমানুষ ছিলেন, তিনি কখন ইচ্ছা করিয়া চাকর বদল করিতেন না, পুরাতন আমলারা ঐ রকম স্থলেই অধিক প্রশ্রয় পায়, মনিবকে বঞ্চনা করিয়া আপনাদের উদর পূরণ করে। আপনাদের জমিদারীতেও সেইরূপ হইতেছে, তাহা আমরা বেশ জানি। এখন এক একটী কাজ-

রীতে আপনাদের উভয় সহোদরের খাজনাপত্র আদায়-তহশীল হয়, সাবেক আমলারাই হর্ত্তাকর্ত্তা। সেটা কিন্তু ভাল হইতেছে না। আপনি একটু সাবধান হউন। মফঃস্বলে মফঃস্বলে নিজের অংশের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কাছারী করুন। আপনার দাদা যদি পুরাতন আমলা ভালবাসেন, তবে তাহাই রাখুন, আপনি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কাছারীতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আমলা-লোক নিযুক্ত করুন। চন্দ্রকান্তবাবু তাহাদের পরামর্শ শুনিলেন, ধূর্ত্তলোকের চাতুরী বুঝিতে পারিলেন না, নূতন কাছারীবাটী নির্ম্মাণ করাইয়া নূতন নূতন নায়েব গমস্তা নিযুক্ত করিলেন; সেই সকল নূতন লোক ঐ চক্রী লোকদিগের পেটাও, একথা বলা বাহুল্য।

চন্দ্রকান্তবাবু কলিকাতাবাসী, কলিকাতার মধুমক্ষিকারা নূতন নূতন পদ্মফুল পাইলে বড়ই আনন্দ পায়, একে একে চন্দ্রকান্তবাবুর গা-ঘেঁসা হইতে লাগিল, সুস্বাদু মধুপানের ইচ্ছা। কেবল মধুপান করিয়াই তাহারা তুষ্ট থাকিল না, পাড়াগেঁয়ে বাবুকে সহুরে বাবু করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সহুরে বাবুদের মধ্যে যাঁহারা কাপ্তেন হন, তাঁহারা যেরূপ কাজ করেন, দুষ্ট মোসাহেবেরা চন্দ্রকান্তবাবুকে সেইরূপ কার্য্য শিখাইল। মোসাহেবদলে যাহারা ইংরাজি জানে, তাহাদের মধ্যে একজন প্রাইভেট টিউটর হইয়া বাবুকে কিছু কিছু ইংরাজী পড়াইতে লাগিল; কেহ কেহ ওস্তাদ হইয়া গীতবাদ্য শিখাইতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ পাঁচ প্রকারে সুমধুর সুধা সংগ্রহ করিয়া বাবুকে সুরাপানে মত্ত করিল, সন্ধ্যার পর পাড়াগেঁয়ে বাবুকে সহুরে বাবু সাজাইয়া রকমারি বারাণ্ডাওলা আড্ডায় আড্ডায় লইয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহাদের পাশা খেলায় পোহাবারো।

প্রদেশবাসী পাঠক মহাশয়েরা এই সময় একবার কলিকাতা সহরের নূতন নূতন ছবি দর্শন করুন। রাজা রামমোহন রায়ের স্থাপিত ব্রাহ্মসমাজের কৃপায়, বাবু কেশবচন্দ্র সেনের মধুর মধুর বক্তৃতার প্রসাদে অনেকগুলি গৃহস্থসন্তান ব্রহ্মজ্ঞানের আস্বাদন পাইয়াছিলেন, অনেক বাটীর রমণীগণ বার ব্রত, শিবপূজা ও আর্য্য আচার-ব্যবহারাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মিকা নাম ধারণ করিয়াছিলেন, স্ত্রী-স্বাধীনতার তুফান উঠিয়াছিল, হিন্দু স্ত্রীজাতির প্রধান ভূষণ লজ্জা, ব্রাহ্মিকারা সেই লজ্জাকে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। সকলে এক পথের পান্থ না হউন, অনেকেই সেই পথে বিচরণ করিতেন, নির্ভয়ে একথা বলা যাইতে পারে। আর্য্য-শিরোমণি মহাশয়েরা আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, কালধর্ম্মে যাহা যাহা ঘটিতেছে, পর্দ্দা না রাখিয়া তাহারই চিত্রপট এইখানে আমরা দেখাইব।

সহরের যে পল্লীতে চন্দ্রকান্ত বাবুর বাটী, সেই পল্লীর মধ্যে অতি নিকটে একটী ব্রাহ্ম পরিবার বাস করেন। দুই বাটীর ছাদে উঠিলে দুই বাটীর স্ত্রীলোকদিগের পরস্পর সাক্ষাৎ হয়; এত নিকট।

যে বাটীর কথা বলা হইতেছে, সে বাটীখানি দোতলা, দুই মহল;—নামে দুই মহল, কিন্তু সদর মহলে নিচের ঘরগুলি প্রায়ই ব্যবহারে আইসে না, সর্ব্বদাই চাবি বন্ধ থাকে; দোতলায় চারিদিকে অপ্রশস্ত বারাণ্ডা,—বাহির দিকে নয়, ভিতর দিকে। নিচে একটী ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ, চতুষ্কোণ, প্রায় দশ হস্ত পরিমাণ; ঠাকুর দালান নাই; দেউড়ী আছে, দেউড়ীতে একজন হিন্দুস্থানী দ্বারবান থাকে; নিচের সঙ্গে এই পর্য্যন্ত

সম্পর্ক। উপরের একটী ঘরে একটী রমণী বসিয়া আছেন; সে ঘরটী সদর বলিলেও চলে, অন্দর বলিলেও চলে; পূর্ব্ব দিকের দরজা খুলিলে সদর হয়, সেই দরজা বন্ধ থাকিলে অন্দরের সামিল হইয়া যায়। সেই ঘরেই সেই রমণী! ঘরটী দিব্য সজ্জিত; দেওয়ালে দেওয়ালে খানকতক বিলাতী ছবি। এক একখানি ছবির যেরূপ দৃশ্য, সেদিকে দৃষ্টিপাত করিতে ভদ্রলোকের লজ্জা হয়; নারী মূর্ত্তি, যুবতী মূর্ত্তি, পূর্ণ উলঙ্গ! ছবির মাথায় মাথায় জোড়া জোড়া দেওয়ালগিরি। কড়িকাঠে সুন্দর ঝালর দেওয়া চিত্র বিচিত্র একখানি ক্ষুদ্র টানাপাখা! গৃহতলে কার্পেটমোড়া ঢালা বিছানা; মধ্যস্থলে একটী টেবিল, তিনদিকে তিনখানি চেয়ার; নিচে কার্পেটের উপর মৃগচর্ম্ম-মণ্ডিত তিন চারিটী সুকোমল উপাধান। টেবিলের উপর একটী হারমোনিয়ম, দু-তিনটী শিশি, খানকতক কেতাব আর চিনের ফুলদানে বৃহৎ একটী ফুলের তোড়া। একখানি চেয়ারে সেই রমণী উপবিষ্টা। দিব্য সুন্দরী, অঙ্গে সাটীনের জামা আঁটা, জামার উপর সরু ফিন্‌ফিনে কালাপেড়ে সাড়ী, কণ্ঠদেশে সরু একছড়া সোনার হার, দুই কর্ণে দুইটী ইয়ারীং, হস্তে বলয়; আর কোন অলঙ্কার আছে কি না, দেখা যায় না; মস্তকের কেশদাম কবরীবদ্ধ, তাহার চারিদিকে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর ফুল; দেখিলে বোধ হয়, যেন ক্ষুদ্র একটী ফুলবাগান; চরণে কাষ্ঠবিড়ালীবর্ণের দুইটী সূক্ষ্ম মোজা, তাহার উপর বার্ণিশ করা শ্লিপার; বয়স অনুমান সপ্তদশ বর্ষ; কবরীর শোভা নষ্ট হইবার ভয়ে মস্তক অনাবৃত।

রমণী একখানি কেতাব হস্তে লইয়া সেই দিকে চাহিয়া

রহিয়াছেন, কিন্তু নেত্র চঞ্চল; অক্ষরের দিকে দৃষ্টি আছে কি না, কে বলিবে? রমণী এক একবার চঞ্চল চক্ষু ঘুরাইয়া দরজার দিকে চাহিতেছেন, এক একবার চেয়ার হইতে উঠিয়া গবাক্ষে গবাক্ষে মুখ বাড়াইতেছেন, কোন দিকে কিছু শব্দ শুনিতে পাইলে চমকিত হইয়া সেই দিকে চক্ষু ফিরাইতেছেন, যেন কতই অস্থির।

ঘরে পূর্ব্বদিকের দরজা তখন খোলা ছিল, সেই দরজার দিকেও সুন্দরীর ঘন ঘন দৃষ্টি। সুন্দরী একবার বসিতেছেন, একবার উঠিতেছেন, একবার গবাক্ষের কাছে যাইতেছেন, এক একবার দরজার চৌকাঠের ধারে দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক উঁকি মারিয়া দেখিতেছেন।

সময় অপরাহ্ণ, সন্ধ্যা হইবার এক ঘণ্টা দেরী। দরজার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া রমণী একবার সেই চেয়ারে উপ-বেশন করিলেন, পুস্তকখানি বন্ধ করিয়া রাখিয়া হারমোনিয়ম খুলিলেন, দু-একটী সুর বাজাইলেন, ভাল লাগিল না; গোপাল উড়ের সুরে একটী গীত বাজাইলেন, তাহাও মনঃপূত হইল না, চঞ্চলদৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মনও চঞ্চল।

আর একটী কথা বলিতে হইল। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, সে সময়ে কলিকাতায় হারমোনিয়ম যন্ত্রের অধিক আমদানী হয় নাই। আজকাল যেমন সকল গৃহস্থের ঘরে ঘরে হারমোনিয়ম, কেবল সদরে নয়, অন্দরে অন্দরেও হার-মোনিয়ম, বেলা দুই প্রহরের সময় রাস্তায় বাহির হইলে গৃহস্থের অন্দরে হারমোনিয়মের মধুর ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়, সন্ধ্যার পর ঘরে ঘরে হারমোনিয়ম বাজে, ছোট বড় গণিকালয়ে প্রায় সর্ব্ব-

ক্ষণ হারমোনিয়মের ঝঙ্কার উঠিয়া থাকে, ইহার পূর্ব্বে এ রকম ছিল না; বাছা বাছা সৌখিন লোকের বৈঠকখানায় দু-একটী হারমোনিয়ম থাকিত। যে রমণী হারমোনিয়ম বাজাইলেন, সে রমণীকে সৌখীন দলে গণনা করিতে হইবে। হারমোনিয়ম ভাল লাগিল না, পুস্তক ভাল লাগিল না, চুপ করিয়া বসিয়া থাকাও ভাল লাগিল না, রমণী চঞ্চলা।

আরো ২০ মিনিট। সেই ঘরের চৌকাঠের নিকটে একটী বাবু দর্শন দিলেন। রমণী বসিয়াছিলেন, সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বদন বিমর্ষ ছিল, সেই বিমর্ষবদনে একটু মৃদুমধুর হাসি আসিল, চঞ্চল নেত্র সহসা যেন নিমেষশূন্য হইল, সেই অনিমেষ-লোচনেও যেন মধুর মধুর হাস্যরেখা প্রকাশ পাইল।

বাবু গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, প্রফুল্ল নয়নে রমণীর বদন দর্শন করিয়া একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলেন, রমণীও বসিলেন, বাবু উত্তরমুখে, রমণী দক্ষিণমুখে; উভয়েই মুখামুখি।

মৃদু হাসিয়া রমণী বলিলেন, "আজ আপনার বড় দেরী হয়েছে।"

বাবু। আজ আমাদের একটা মিটিং ছিল, সেইখানেই একটু দেরী হয়েছে। মিটিং এখনও ভাঙে নাই, তোমাকে দেখ্‌বার জন্যেই মন বড় চঞ্চল হলো, চুপি চুপি উঠে এলেম। সভার লোকেরা মাথা মুণ্ডু কে কি বল্লে কিছুই শুনিনি।

রমণী। (হাস্য করিয়া) বক্তৃতাগুলো আমাকেও ভাল লাগে না।

বাবু। কল কথা কি জান, সভার খাতায় আমরা নাম লিখিয়েছি, কাজে কাজেই যেতে হয়, সভায় যে যা' বলে, মন

থাকুক বা না থাকুক, কাজে কাজেই শুন্‌তে হয়, এক একদিন আমাকেও কিছু কিছু বল্‌তে হয় (হাস্য করিলেন)। সে সব কেবল মুখের কথা। মিটিঙে আমরা যা' কিছু বলি, কাজে তার কিছুই করি না; কেবল আমি বোলে নয়, যারা যারা বক্তৃতা করে, তারা সকলেই প্রায় বিপরীত বিপরীত কাজ কোরে থাকে। লোক ভুলাবার মৎলবে গলাবাজী করা আমাদের অভ্যাস। আমরা লুকোচুরি খেলি, বাহিরে লোকে সেটা বুঝে উঠ্‌তে পারে না।

রমণী। (মৃদু হাসিয়া) সকল লোকই কি বোকা?

বাবু। তা নয় ত কি? বোকা যদি না হতো, তা হলে আমাদের দলে কি তত ভেড়ার পাল জুটতো? যাক্,—ও সব কথা এখন থাক, তোমার সেই ব্যাকরণখানা একবার বাহির কর।

রমণী। (মুখ ভারি করিয়া) ওটা আমার পছন্দ নহে, ভ্যাকরণ আমাদের ভাল দেখায় না। যাদের সাজে, তাদের বরং—

বাবু। বুঝেছি তোমার মনের ভাব; কিন্তু এক এক যায়গায় ঘরে ঘরে ভ্যাকরণের খুব ঘটা! আচ্ছা, কি তোমার ভাল লাগে? দুর্গেশনন্দিনী?

রমণী। না,—তাও নয়।

বাবু। তবে কি?

রমণী। বীরসিংহ নন্দিনী।

বাবুটীরও তাহাই ইচ্ছা ছিল, টেবিলের উপর যে কেতাব-গুলি সাজান ছিল, তাহার ভিতর হইতে তিনি একখানি বিদ্যা-

সুন্দর বাহির করিয়া সর্ব্বাগ্রে ভারতচন্দ্র রায়ের রসিকতার সুখ্যাতি করিলেন, তাহার পর হীরামালিনীর প্রশংসা করিলেন, তাহার পর সুরঙ্গপথে সুন্দরের বিদ্যার মন্দিরে প্রবেশ ও গুপ্ত-বিবাহ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। উভয়েরই যথেষ্ট আমোদ হইল।

গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া, বিস্ফারিত নেত্রে সুন্দরীর চন্দ্র-বদনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া, বাবু বলিতে লাগিলেন, "দেখ ডাইমন্! বীর সিংহনন্দিনীর যতখানি গুণ আমাদের কবিবর গুণাকর কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের বীরেন্দ্র-নন্দিনীর ততগুণ দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মে ঐ প্রকার উভয় নন্দিনীর ইতিহাস নাই, শাস্ত্রটা অঙ্গহীন, রাজা রামমোহন রায় যখন বাঁচিয়া ছিলেন, এদেশে তখন সবেমাত্র সভ্যতার অঙ্কুর হইতেছিল, এখন সেই সভ্যতা দিন দিন পল্লবিত হইতেছে, আমরা এখন সেই অঙ্গ পূর্ণ করিয়া নন্দিনী তত্ত্বের নূতন সৃষ্টি করিব।

সুন্দরীকে "ডাইমন্" বলিয়া এই বাবুটী সম্বোধন করিলেন; পাঠক মহাশয় হয়ত এ সম্বোধনের ঠিক মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না; আমরা একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইব; ব্রাহ্মিকা সুন্দরীর এখনকার ডাক নাম ডাইমনকুমারী। যে বাবুটী আসিয়াছেন, তিনি হইতেছেন ডাইমনকুমারীর ধর্ম্ম শিক্ষক, তিনিই ঐ নবীনা ব্রাহ্মিকার ঐরূপ নামকরণ করিয়াছেন।

এইখানে বাবুটীর চেহারার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য। বাবু কিঞ্চিৎ দীর্ঘকায়, অনুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সম্মুখের দুটী দাঁত কিঞ্চিৎ বড় বড়,—গজদন্তের মত নয়, তথাপি আকারে

বৃহৎ; ডাইমনকুমারী সেই দুটী দন্তকে উজ্জ্বল দন্ত বলিয়া তারিফ করেন। বাবু একটু স্থূলাকার, হাতদুখানি একটু ছোট ছোট, শরীরে মাংস অধিক হওয়াতে ঘাড়ে গর্দ্দানে সম্মীলন, মুখখানি গোলাকার, চক্ষু দুটী ছোট ছোট, নাসাগ্র বাম দিকে কিছু বক্র, মুখখানি সর্ব্বদাই হাসি হাসি, বিলাতী ধরণে চুলের কেয়ারি করা; পরিধানে সাদাধুতি, পায়ে চটীজুতা, দাড়ি আছে কিন্তু দস্তরমত বর্দ্ধিত হইয়া বুক পর্য্যন্ত লতায় নাই, চক্ষে সোনাবাঁধা সবুজ পাথরের চস্‌মা, বয়স অনুমান তেইশ চব্বিশ বৎসর। এখনকার দিনে যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানী, তাঁহাদের ঐরূপ সজ্জা হইলে ভাল মানায়; ঠিক চিন্তেও পারা যায়। বাবুটীর নাম ফটিকচাঁদ গোস্বামী—সমাজের উপাধি বিদ্যাবাগীশ।

কুমারী ডাইমনকুমারী ঐ বিদ্যাবাগীশের আদরিণী ছাত্রী। গুরুমহাশয়ের অনুগ্রহে ধর্ম্মশিক্ষা, শাস্ত্রশিক্ষা ও বিদ্যাশিক্ষা যতটা না হউক, স্বাধীনতা শিক্ষা, সভ্যতা শিক্ষা ও রসিকতা শিক্ষা বিলক্ষণ হইতেছে। ছাত্রীটিকে কুমারী বলা গেল, ভুল হইল না—ডাইমনকুমারীর বিবাহ হয় নাই। বাঙ্গালীর ঘরে,—বিশেষতঃ ভদ্র ভদ্র হিন্দুপরিবারে সপ্তদশবর্ষ পর্য্যন্ত কন্যাকে অনূঢ়া রাখা—অশাস্ত্রীয় প্রথা। কিন্তু ডাইমনকুমারীর পিতা এখন আর হিন্দু নহেন, হিন্দু বলিলে তিনি গালাগালী মনে করেন; তাঁহারা এখন ব্রহ্মজ্ঞানী হইতেছেন। হিন্দুসন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে তাঁহাদের লজ্জা হয়,—অধিক বয়স পর্য্যন্ত কন্যাগণকে অবিবাহিত রাখা তাঁহাদের গৌরবের কথা; সেই পদ্ধতি অনুসারে ডাইমনকুমারী সপ্তদশবর্ষীয়া কুমারী।

ডাইমনকুমারীর পিতার নাম ভজহরি ভট্টাচার্য্য, বর্ত্তমানকাল

বৎসর। আট দশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ব্রহ্মজ্ঞানে দীক্ষিত হইয়াছেন। জাতীতে ব্রাহ্মণ, ভট্টাচার্য্য উপাধীতেই সে পরিচয় হইয়া গিয়াছে; কিন্তু আট দশ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের "মূর্দ্ধণ্য ণ" লোপ পাইয়াছে, "ণ" বিলুপ্ত হইলে যাহা বাকী থাকে, তাহাই এখন তিনি। উপাধিটী বজায় আছে, কিন্তু গলদেশে যজ্ঞসূত্র নাই। কন্যাকে সপ্তদশবর্ষ পর্য্যন্ত কুমারী রাখা, একজন যুবাপুরুষকে সেই কন্যার গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত করা তাঁহার পক্ষে শ্লাঘার বিষয়।

ভজহরি ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী আছেন, তিনিও ব্রাহ্মিকা; ব্রাহ্মিকা হইবার পূর্ব্বে তাঁহার গর্ভে ছুটী পুত্র আর একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কন্যাটী এই ডাইমনকুমারী। পুত্র ছুটীর মধ্যে জ্যেষ্ঠের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ, কনিষ্ঠটী দশমবর্ষীয়। মেয়েটী ব্রাহ্মিকা, ছেলে ছুটীকেও ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইয়াছে।

বিদ্যাসুন্দর পাঠ করা চলিতেছে, মধ্যে মধ্যে হাস্যতরঙ্গ, চলিতেছে, আনন্দে উভয়েই ঢলঢল। ফটিকচাঁদ গোস্বামী ছু-এক বৎসরের নূতন শিক্ষক নহেন, ডাইমনের যখন ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম, সেই সময় অবধি ফটিকচাঁদ তাহার শিক্ষাদাতা।

নিত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নবীন শাস্ত্রের সদালাপ হয়, সদালাপের উচ্চ অঙ্গ প্রেমালাপ। প্রেমের কথা উত্থাপন হইলে ডাইমনকুমারীর কপোলদেশ কিছু আরক্ত হয়, বোধ হয় যেন একটু একটু লজ্জা আইসে; ব্রাহ্মীকাদের লজ্জা থাকে না, তথাপি যেন কিছু লজ্জারেখা দেখা যায়; লজ্জার সঙ্গে মৃদু মৃদু হাস্য।

বীরসিংহকুমারীর সহিত সুন্দরের যেখানে বিবাহ হয়,

ডাইমনকুমারী সেই অংশটি পাঠ করিতেছিলেন। ভারতচন্দ্রের সুন্দরটী "কাঞ্চিপুরের গুণসিন্ধু রাজার তনয়।" অংশটী পাঠ করাইতে করাইতে ফটিকচাঁদ সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাই-মন! ঐ রকম বিবাহ করিতে কি তোমার সাধ হয় না?"

আয়তনেত্রে শিক্ষক নাগরের দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ডাইমনকুমারী একটু অধোমুখী হইলেন, তখনই আবার নাগরের মুখপানে চাহিয়া সতেজ কণ্ঠে উত্তর করিলেন,—"বিবাহ!—বিবাহটা কি?—আমি বিবাহ করিব না।"

বিস্ময় প্রকাশ না করিয়াও ফটিকচাঁদ বলিয়া উঠিলেন, "সে কি! স্ত্রীজাতি বিবাহ করিবে না, এটা বড় আশ্চর্য্য কথা! এটা ভাই—না, না—ডাইমন! এটা তোমার বড় অদ্ভুত পণ! হিন্দুশাস্ত্রের জনক রাজা কন্যার বিবাহে ধনুর্ভঙ্গ-পণ করিয়াছিল, পঞ্চালের দ্রুপদ রাজা কন্যার বিবাহে লক্ষ্য বেঁধা পণ করিয়াছিল, কিন্তু সীতা অথবা দ্রৌপদী সে প্রকার পণ করে নাই, তুমি কেন—"

কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই চক্ষু ঘুরাইয়া ডাইমনকুমারী কহিলেন, "কেন?—ও সকল হিন্দু-দৃষ্টান্ত—মিথ্যা দৃষ্টান্ত আমি গ্রাহ্য করি না; সভ্য দৃষ্টান্তের আমি আদর করি। সে দৃষ্টান্ত তুমিও জান, আমিও জানি। মার্কিণদেশের মেয়েরা বিবাহ করিবে না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সভা করিয়াছে; আমার একান্ত ইচ্ছা—আমাদের দেশেও আমাদের মধ্যে সেই রকম সভা হয়। কেন জান?—বিবাহটা ভারি দোষের কথা,—ভারি অসভ্য নিয়ম। বিবাহ হইলে নারীগণকে পুরুষের দাসী হইয়া থাকিতে হয়। কেন গা? পুরুষেরা কে? আমরা কেন

পুরুষের দাসী হইব? পুরুষেরা কেন নারীজাতির উপর প্রভুত্ব করিবে! পুরুষেরা কে? নারীর পেটে পুরুষের জন্ম, কি ক্ষমতায় তাহারা বড়? পুরুষ বরং নারীজাতির গোলাম হইয়া থাকিবে, ইহাই স্বভাবসঙ্গত।"

ফটিকচাঁদ বলিলেন, "বিবাহ হইলে কি তা হ'তে পারে না?"

ডাইমনকুমারী এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য ওষ্ঠ কম্পিত করিতেছিলেন, কিছু বিলম্ব হইল। সাহেব লোকের আয়াদের মত পোষাক পরা, দস্তার মাকড়ী কানে একটা দাসী প্রবেশ করিয়া, গৃহ মধ্যে একটা বাতী জালিয়া দিয়া গেল; আধঘণ্টা পূর্ব্বে সন্ধ্যা হইয়াছিল, প্রেম-প্রসঙ্গে অন্যমনস্ক থাকাতে গুরু শিষ্যা ওরফে নায়ক নায়িকার সেদিকে দৃষ্টি ছিল না। ঘরে আলো জ্বলিল, পূর্ব্বদিকের দরজা বন্ধ হইল।

উত্তম অবসর। মৃদু হাসিয়া ডাইমনকুমারী বক্রনয়নে একবার টেবিলের দিকে চাহিলেন। পূর্ব্বে বলা আছে, টেবিলের উপর দু-তিনটি শিশি ছিল; শিশিগুলি শূন্যগর্ভ ছিল না, গর্ভে গর্ভে রক্তবর্ণ তরল পদার্থ পরিপূর্ণ। সেই দিকে চাহিতে চাহিতে ডাইমনকুমারী একবার উঠিয়া তাকের উপর হইতে দুটা গ্লাস নামাইয়া আনিলেন। গ্লাস দুটা টেবিলের উপর রাখিয়া, একটা আলমারী খুলিয়া, দুটা সোডা ওয়াটারের বোতল আর ঠাণ্ডাজল-পূর্ণ একটা ডিক্যানটার লইয়া আসিলেন; হাসিতে হাসিতে চেয়ারে বসিয়া, প্রেমকটাক্ষে নাগরের মুখপানে চাহিয়া মধুর স্বরে বলিলেন, "কি গো বিদ্যাবাগীশ মহাশয়! যৎকিঞ্চিৎ জলযোগের ইচ্ছা আছে?"

বিদ্যাবাগীশের রসনায় ক্ষুদ্র নির্ঝরের ন্যায় জল ঝরিতে

লাগিল, শিষ্টাচারের খাতিরে মস্তক কুণ্ডয়ন করিয়া গদ্‌গদস্বরে তিনি উত্তর করিলেন, "তা—তা—তুমি যদি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে—"

ডাইনন। (মৃদু হাসিয়া) আমি মেয়েমানুষ, আমার আবার ইচ্ছা কি, বিদ্যাবাগীশের জন্যই যৎকিঞ্চিৎ আয়োজন।

ফটিক। ডবল গেলাস তবে কি জন্য?

ডাই। দুই রকম আছে।

ফ। রকম যতই থাক না কেন, তুমি প্রসাদ ক'রে না দিলে আমি ত গ্রহণ করিতে পারি না। এইমাত্র তুমি বল্‌ছিলে, নারী বড়, পুরুষ ছোট।

ডাই। আচ্ছা, সে কথা পরে হবে, এখন একপাত্র গ্রহণ কর। (দুটী গ্ল্যাসে আধাআধি সুধা ঢালিয়া সোডা জল মিশাইয়া একটি পাত্র স্ফটিকের হাতে দিয়া) এই লও।

ফ। (পাত্র হস্তে লইয়া) প্রসাদী হলো না যে? অগ্রে তুমি, তারপর আমি। (পাত্রটী ডাইমনের হস্তে প্রদান)

ডাই। (পাত্র গ্রহণ করিয়া) আমার আছে, এটা তোমার।

ফ। আছে তা জানি, তবু ঐ পাত্রটী প্রসাদ করে দাও।

ডাই। (একচুমুক পান করিয়া, স্ফটিকের হস্তে পাত্র প্রত্যর্পণ)।

ফ। (একচুমুকে পাত্র উজাড় করিয়া) আঃ! খাসা জিনিষ।

ডাই। (নিজের পাত্র নিঃশেষ করিয়া) নিজে তুমি খাসা, সেই জন্যই তোমার জন্য খাসা খাসা জিনিষ সংগ্রহ করা।

ফ। (ব্যগ্রনয়নে পূর্ণশিশির দিকে চাহিয়া) তা নয়,

তোমার ঐ পদ্মহস্তস্পর্শে সব জিনিষ খাসা হয়! আর এক পাত্র—

ডাই। (উচ্চ হাস্য করিয়া) এক পাত্র কেন, যত চাও, তত পূর্ণপাত্র জোগান যাবে। (দ্বিতীয়বার দুই পাত্র পরিপূর্ণ)

ফ। (দ্বিতীয় পাত্র উদরস্থ করিয়া) যা বলেছি তাই। তোমার হস্তস্পর্শে সব জিনিষ পবিত্র হয়; ঠিক যেন স্বর্গের সুধা।

ডাই। (অর্দ্ধ মাত্রা পান করিয়া) হাঁ, কি কথা হচ্ছিল! হাঁ, মনে হয়েছে। তুমি বল্‌ছিলে, বিয়ে হলে কি পুরুষেরা নারীর গোলাম হতে পারে না! তখনই আমি জবাব দিচ্ছিলেম, কথাটা মুখাগ্রে এসেছিল, হঠাৎ আয়ার প্রবেশে বাধা পড়ে গিয়েছিল। হাঁ, হতে পারে, হয়েও থাকে, আমাদের দেশে হয় না; হিন্দুরা সে নিয়মটা খারাপ কোরে ফেলেছে, উল্টে দিয়েছে; সভ্যদেশে হয়। সভ্য সভ্য সাহেব-লোকেরা আসল নিয়মটা বজায় রাখে। এ দেশের ছোট ছোট ছোঁড়ারাও ঠাট্টা কোরে বলে, "সাহেব ছেলাম, বিবির গোলাম!" বাস্তবিক কিন্তু বিবির গোলাম হওয়া খুব ভাল।

ফ। ইংরাজী বিদ্যার চমৎকার গুণ! এদেশেও দিন দিন সেই আসল নিয়মটা ফিরে দাঁড়াচ্চে। যারা যারা ইংরাজী পড়েছে, এই সহরে সাহেব বিবির যুগল-মিলন দেখে দেখে আস্‌চে, তাদের মধ্যে অনেকে এখন বিবির গোলাম হতে শিখ্‌চে; শিখেচেও অনেকে। পরমেশ্বরের কৃপায় সুসভ্য ইংরাজ লোকেরা এদেশে যদি বেশীদিন রাজত্ব করে, এদেশে যদি ইংরাজের রাজত্ব চিরস্থায়ী হয়, তা হলে ক্রমে ক্রমে

নিয়মটা আরো প্রবল হবে। সভ্যতা যত বাড়্বে, বিবির গোলাম হওয়া ততই প্রবল হয়ে উঠ্বে; ষোল আনা মাত্রা দাঁড়াবে। সব কদাচার উঠে যাবে।

ডাই। এই আস্‌চে রবিবার সমাজে গিয়ে আমি একটা লেক্‌চার দিব, পরমেশ্বরের কাছে বর চাইব, ষোল আনার উপর আরো দুই এক আনা যেন বেশী হয়, সাহেবের রাজত্ব যেন চিরদিন থাকে।

ফ। (টেবিলের উপর মুষ্ট্যাঘাত করিয়া) থাক্‌বে—থাক্‌বে—থাক্‌বে। হবে—হবে—হবে! এখন তোমার অভিপ্রায় কি? বিয়ে করতে তুমি রাজী আছ কি না?

ডাই। (নাগরকে আর এক পাত্র দিয়া নিজেও আর এক পাত্র গ্রহণ করিয়া) রাজী?—রাজী—আছি রাজী, তবু একটু একটু নিমরাজী। "বাবু ছেলাম, বিবির গোলাম" এ কথাটা যখন খাঁটী হবে, পূর্ণ মাত্রা দাঁড়াবে, তখন—

ফ। সুরু হয়েছে, ঘন ঘন দৃষ্টান্ত দেখাতে পারলেই পূর্ণ মাত্রা ছাপিয়ে যাবে। দৃষ্টান্ত দেখাও, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় আশা পূর্ণ হবেই হবে।

ডাই। (একবার নাগরের বদনে কটাক্ষ সন্ধান করিয়া, তখনই মুখ নিচু করিয়া মৃদুস্বরে) সেই দিন আসুক, তার পর—

ফ। (কি যেন ভাবিয়া একটু ম্লানবদনে) বিলাতের বিবি-লোকেরা নিজে নিজে বর পছন্দ কোরে বিয়ে করে; তুমি বল দেখি, কোন্ বরকে তোমার পছন্দ—

ডাই। (মুখ তুলিয়া ঈষৎ হাসিয়া) গোটাকতক বর না দেখ্‌লে কোন্‌টা পছন্দ, কোন্‌টা গরপছন্দ, কি কোরে বলা যায়?

ফ। (সন্দেহে সন্দেহে নায়িকার নয়নে নয়ন নিক্ষেপ করিয়া) গো-টা-ক-ত-ক ?—ও বাবা! সে আবার কি রকম কথা ?

ডাই। (গম্ভীর বদনে) রকম ভাল। সে রকম না হলে নির্ব্বাচন করা যাবে কিরূপে ? পাঁচটা জিনিষ না দেখ্‌লে কি কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ, ঠিক করা যেতে পারে ?

ফ। (বিস্ময়ে, সংশয়ে সুন্দরীর বদন নিরীক্ষণ করিয়া) ঘরে কি তুমি দশ রকম বরের হাট বসাতে চাও ?

ডাই। (ত্বরিত স্বরে) তা কেন ? যারা যারা আমার কাছে আস্‌বে, তাদের মধ্যে—

ফ। (অধিক সন্দেহে) সে রকম আসে না কি ?

ডাই। (ত্বরিত স্বরে) আসুক না আসুক, আনাতে হবে, বিয়ে কর্‌তে যদি হয়, পাঁচ রকম দেখে শুনে পছন্দ ক'রে একটাকে—

ফ। (সংশয়ের সঙ্গে আশা মিশাইয়া) বিবি লোকের বর পছন্দ কর্‌বার একটা ধারা আছে, ইংরাজীতে সেই ধারার নাম "কোর্টশিপ্", তাও হয়ত তুমি শুনে থাক্‌বে; একটা বর যদি ঘন ঘন একটি বিবির কাছে "কোর্টশিপ্" কর্‌তে যায়, বিবি যদি তাকে পছন্দ কর্‌তে ইতস্ততঃ করে, তা হলে সেই কোর্টশিপ-ওয়ালা সেই বিবির পায়ে ধরে কাঁদে, 'আমার হও, আমার হও' ব'লে পদতলে গড়াগড়ি খায়, হিন্দুদের নন্দকুমার কেষ্টো যেমন কুঞ্জবনে রাধিকা গোপিনীর পায়ে ধ'রে কেঁদেছিল, কোর্টশিপের সাহেব নাগরেরাও সেই রকমে কেঁদে ভাসায়।

ডাই। (হাস্য করিয়া) ব্বাঃ! তুমিত অনেক জান! হিন্দু-

দের রাধাকেষ্টো কবে কোথায় কি করেছিল, তা পর্য্যন্ত তোমার জানা আছে দেখ্‌চি! আমি কিন্তু সে সব কথা জানি না। সে সব হচ্চে ছোট লোকের কথা; গয়লার ছেলে, গয়লার মেয়ে কবে কি করেছিল, সত্যকথা কি মিথ্যাকথা, সেটা কে জানে? আমরা এখন সভ্য হতে শিখেচি, ভাল মন্দ চিন্‌তে শিখেচি, অসভ্য গয়লাদের দৃষ্টান্ত শুনে কি আমরা ভুলি? এই আমার কথাই বল্‌ছি, আমি ত—

ফ। (কতকটা আশ্বাস পাইয়া) সে কথা আমি বল্‌চি না, গয়লারা কি করেছিল, সেটা সত্য বলে বিশ্বাস কর্‌চি না, তবে কি না, তোমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌চি, হিন্দু কবিদের চকোর পাখী যেমন চাঁদের সুধা খাবার জন্যে লালাইত হয়, চাতক পাখী যেমন মেঘের জলের পিপাসী, সেই রকমে তোমার প্রেমে পিপাসী হয়ে যদি কোন অধম পুরুষ তোমার পায়ে ধ'রে কাঁদে, তা হলে তুমি তার প্রতি প্রসন্ন হও কি না? তার উপর তোমার দয়া হয় কি না?

ডাই। (চঞ্চল স্বরে) জানি না—জানি না,—না দেখ্‌লে কিছুই বল্‌তে পারি না।

ফ। (আশ্বাসের সঙ্গে আবার একটু সন্দেহ আনিয়া ভয়ে ভয়ে) আচ্ছা ডাইমন! না দেখ্‌লে কিছু বল্‌তে পার না;— আচ্ছা, আমাকে ত রোজ রোজ দেখ্‌চো,—আমাকে—

ডাই। (আরক্তবদনে একটু শিহরিয়া) কি কথা বল-ছিলে? তোমাকে?—কি তোমাকে?

ফটিকচাঁদ যেন আশা ভঙ্গ হইবার ভয়ে সতৃষ্ণনয়নে আর একবার পূর্ণগর্ভ শিশির দিকে চাহিলেন, ভাব বুঝিয়া ডাইমন

কুমারী মৃদু হাসিয়া যেন সমুদ্র-মন্থনের মোহিনীর ন্যায় রসিক নাগরকে পুনর্ব্বার সুধা বিতরণ করিলেন, সেবারে নিজে পান করিলেন না। রসিকনাগর সুধা পান করিয়া চেয়ার হইতে নামিয়া, ডাইমনকুমারীর চরণতলে জানু পাতিয়া বসিয়া, কাঁদ কাঁদমুখে করজোড়ে মিনতি করিয়া বলিলেন, "প্রিয়তমে! তোমার রূপ-সাগরে আমি ডুবে গেছি, চরণে ধরি, মিনতি করি, তুমি আমার হও।"

পা দুখানি সরাইয়া লইয়া কিঞ্চিৎ চঞ্চলস্বরে সুন্দরী বলিলেন, "ওকি কর! ওকি কর! গা তোলো, স্থির হয়ে বোসো;—ছিঃ! ও রকম কি কর্‌তে আছে? তুমি হচ্চো পণ্ডিত মানুষ, আমি হচ্চি তোমার ছাত্রী, ছাত্রীর কি পায়ে ধর্‌তে আছে? গা তোলো!"

কথায় কর্ণ না দিয়া, কাঁদকাঁদস্বরে বিদ্যাবাগীশ বলিলেন, "কিছুতেই আমি উঠ্‌বো না;—বল,—একবার বল,—বল, তুমি আমার হবে। যতক্ষণ সেই কথাটী না বোলবে, ততক্ষণ আমি উঠবো না।"

সুন্দরী বলিলেন, "মন যদি স্থির হয়, কাহারও হওয়া যদি আমার ভাগ্যে থাকে, তা হলে সেই সময় বিবেচনা করা যাবে; তোমার হতাশ হবার বিশেষ কারণ আমি এখন কিছুই দেখ্‌চি না। গা তোলো।"

একটু যেন আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে বিদ্যা-বাগীশ উঠিলেন, নিজের চেয়ারে গিয়া বসিলেন, এক মিনিট অতীত হইতে না হইতেই চক্ষু দুটী বেশ শুষ্ক হইল। ছলের ক্রন্দন, হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে চক্ষে জল পড়ে নাই, মায়া জানাইয়া

কৌশলক্রমে তিনি অশ্রু আনয়ন করিয়াছিলেন। এমন লোক কতকগুলি আছে, মনে করিলেই তাহারা অভিমানবশে অতি সহজেই চক্ষে জল আনিতে পারে; দেখিলেই বোধ হয়, যেন কোন প্রকার ভেল্কি জানে। অপরকে ভুলাইবার মতলবে কিম্বা আকর্ষণের মতলবে, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কাঁদিয়া ভাসায়। এই বিদ্যাবাগীশটী কোন প্রকার ভেল্কি জানিতেন কি না, বলা যায় না, কিন্তু চক্ষে জল আনিতে বিলক্ষণ পটু; সেই পটুতার প্রভাবেই চক্ষু দুটীর মায়াজল শীঘ্র শীঘ্র শুকাইল, মায়াকান্না ফুরাইল।

শান্তমূর্ত্তির মুখপানে চাহিয়া সুন্দরী বলিলেন, "আহা! কেঁদে কেঁদে তোমার চক্ষু দুটী রাঙ্গা হয়েছে, আমার পায়ে ধরে অনেকক্ষণ বসেছিলে, অনেকটা কষ্ট হয়েছে, দেখ্‌তে পাচ্চি, বড়ই ক্লান্ত হয়েছ, একটু আরাম কর; একমাত্রা আরামের ঔষধ খাও।"

অন্তরে হাসিয়া বিধুমুখী ব্রাহ্মিকা আর একটী শিশি হইতে এক পাত্র মদিরা ঢালিয়া শিক্ষকঠাকুরের হস্তে অর্পণ করিলেন, পাত্রটী একচুমুকে সাবাড় হইল; বিদ্যাবাগীশটী মদিরাপাত্র সুবিচারের উপযুক্ত সুপাত্র, তাঁহার হস্তে মদিরাপাত্র শূন্য হইতে অধিক বিলম্ব হয় না।

পাত্র শূন্য করিয়া সুপাত্র আবার পূর্ব্ববৎ রসিকতা জানাইয়া ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "দেখ ভাইমন! তোমাকে দেখে অবধি আমি জেনে রেখেছিলেম, তুমি আমার হবে;— আমি তোমার, তুমি আমার। বুঝ্‌লে কি না? একবার বলেছি, আবার বলি, তোমার রূপসাগরে আমার প্রাণ ডুবেছে,

আশায় আশায় প্রাণ বাঁচাবার জন্যে আঁকু-পাঁকু ক'রে সর্ব্বক্ষণ আমি ডুব-সাঁতার দিয়ে ভেসে উঠবার চেষ্টা কর্‌চি। দেখো ভাই—দেখো ভাই—না, না—দেখো ডাইমন, বঞ্চনা ক'রে চিরদিন আমাকে দুঃখের সাগরে ডুবিয়ে রেখো না!"

ডাইমনকুমারী সে সকল কথায় কিছুই উত্তর দিলেন না, কেবল খঞ্জনপক্ষীর ন্যায় বড় বড় চক্ষু দুটী নাচাইতে লাগিলেন। মনে মনে কি যেন চিন্তা করিয়া, মৃদুগুঞ্জনে ফটিকচাঁদ বলিয়া উঠিলেন, "ফটিক জল!—আমি চাতক, তুমি জলধর;—আকাশের জলধর কৃষ্ণবর্ণ হয়, তুমি আমার চক্ষে স্বর্ণবর্ণ; বিদ্যুত চমকিল!—আমাকে হতাশ হতে হবে না, তোমার চন্দ্রমুখের এ বাক্যটী আমার হৃদয়ে ঠিক যেন চপলা খেলিয়া গেল। বাক্যটীও বিদ্যুৎ, তুমি নিজেও বিদ্যুৎ;—সাক্ষাৎ সৌদামিনীরূপিণী!"

বলিতে বলিতে ফটিকচাঁদ একটু থামিয়া, সটান সৌদামিনীর সুন্দর নয়নে স্থিরদৃষ্টি স্থাপন করিয়া কিঞ্চিৎ ম্লানবদনে বলিতে লাগিলেন, "আচ্ছা ডাইমন! তুমি যে তখন বল্‌ছিলে, পাঁচ জনকে না দেখ্‌লে ভাল মন্দ বেচে লওয়া যায় না, সে কথাটির অর্থ কি? প্রেমের বাগানে পাঁচ রকম কুসুম দর্শন করাই কি তোমার মনোগত অভিলাষ?"

ডাই। দোষ কি?—আমরা এখন সভ্য হচ্চি, সভ্যজগতে ভাল মন্দ পাঁচ রকম দর্শন করা সভ্য লোকের বড় সাধ;—কেবল সাধ নয়, নিত্য অভ্যাস। দোষ কি? বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে দেখা করা পুরুষেরাও যেমন ভালবাসে, আমরাও তেমনি ভালবাসি! বিলাতের বিবিলোকেরা স্বচ্ছন্দে মনের আনন্দে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা করে, তার চেয়েও বেশী—বন্ধু-বান্ধবের

সঙ্গে স্বচ্ছন্দে বেড়াতে যায়, স্বচ্ছন্দে হাওয়া খায়, স্বচ্ছন্দে আমোদ করে, বাহিরেও করে, ঘরে বসেও করে। লজ্জা খেয়ে একটা কথা তোমাকে বলি, —মনে কোরো না কিছু,—তুমি আমার স্বামী নও, যদি তা হতে, তা হলেও তোমার সম্মুখে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আমি প্রাণ খুলে রসালাপ কত্তেম, সাক্ষাতেও কোত্তেম, অসাক্ষাতেও সেইরূপ মধুর স্বাধীনতা উপভোগ কত্তেম, স্বচক্ষে দেখেও তুমি কিছু বল্‌তে পার্‌তে না;—কেন না, সভ্যতার পদ্ধতিই তাই,—বারণ কল্লে কিম্বা বিরক্ত হলে সভ্যতার অপমান করা হতো। কেবল তাও নয়, সভ্যতার একটা বাঁধন আছে, সে বাঁধনটা হয় ত আমার চেয়ে তুমি বেশী জান। সভ্য বিলাতের সভ্য বিবিরা আপনাদের ঘরে অপর সাহেবকে বসিয়ে যখন নির্ভয়ে আমোদ প্রমোদ করে, তখন কাহাকেও ভ্রুক্ষেপ করে না। মনে কর, সাহেব বেরিয়ে গিয়াছেন, বিবি একা আছেন, সেই সময়ে অন্য সাহেব সেই ঘরে প্রবেশ ক'রে প্রেমালাপ জুড়েছেন, তখন যদি ঘরের সাহেব বাইরে এসে দাঁড়ান, চাকরের মুখে শোনেন, বিবির ঘরে আর একজন সাহেব আছে, তাহলে কদাচ তিনি সে ঘরে প্রবেশ করেন না, বাহিরেই দাঁড়িয়ে থাকেন, কিম্বা মাথা হেঁট করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান। আমার বিবেচনা—সভ্যতার সে নিয়মটা খুব ভাল।

ফ। (সটান চাহিয়া থাকিয়া) ভাল বটে, কিন্তু ঐ রকমে যারা বেরিয়ে যায়, তাদের বুকের ভিতর দাউ দাউ কোরে আগুন জ্বলে, সেটা হচ্চে ঈর্ষার আগুন। সে আগুন পুরুষের বুকেও যেমন জ্বলে, নারীদের বুকেও তেমনি জ্বলে।

ডাই। জ্বলে কি না জ্বলে তোমরাই জান, আমি ওসব জানি না। আমি কুমারী, সংসারে চিরকুমারী থাকবো, এপর্য্যন্ত আমার মনে সেই সংকল্প ছিল, আজ তুমি একটু একটু টলিয়ে দিচ্ছ। মার্কিণকুমারীরা চিরকুমারী থাকবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করচে; সে প্রতিজ্ঞা যদি রক্ষা কর্‌তে পারে, সভ্যতার খুব আদর বাড়্‌বে।

ফ। (ক্ষুণ্ণ হইয়া) সভ্যতার আদর বাড়্‌তে পারে, কিন্তু যারা সভ্যতার মান রক্ষা কর্‌বে, তাদের বংশ লোপ হয়ে যাবে। স্ত্রীলোকেরা যদি বিবাহ না করে, তা হোলে তাদের গর্ভে আর সন্তান উৎপন্ন হবে না, তবে আর মানুষের বংশ থাক্‌বে কিরূপে?

ডাই। (অঞ্চলে ওষ্ঠপুট ঢাকিয়া হাসিয়া) সন্তান উৎপন্ন হবে না? সে কি কথা! বিবাহ না করিলে কি সন্তান হয় না?

ফ। হতে পারে, কিন্তু পিতা নির্ণয় হয় না, কে কার বংশ সেটা ধরে লওয়া বিষম সমস্যা হয়ে উঠে। তুমি তখন বল্‌ছিলে, ভ্যাকরণ ভাল নয়, বিবাহটা যদি উঠে যায়, তা হলে ঘরে ঘরে ভ্যাকরণের শ্রাদ্ধ গড়াবে, জারজ সন্তানে দেশ ছেঁকে যাবে।

ডাই। (হাস্য করিয়া) ও কথাটা এখন থাক্, বন্ধুবান্ধবের কথা হচ্ছিল, সেই কথাটা ধর। হাঁ, ভাল কথা। একটী পাড়াগেঁয়ে বাবু কোথা থেকে আমাদের পাড়ায় এসেছে, শুন্‌তে পাই, যে বাড়ীতে থাকে, সেটা তাদের নিজের বাড়ী। সেই বাবুটী রোজ রোজ বৈকালে ছাদে উঠে হাওয়া খায়, খুব নিকট

কি না, আমি যখন ছাদে উঠি, সে তখন ঘন ঘন আমার দিকে চায়। কোন দিন আমি একটা না একটা ছল কোরে খানিকক্ষণ ছাদে বেড়াই, কোন কোন দিন তখনি তখনি নেমে আসি। যেদিন যেদিন একটু বেশীক্ষণ থাকি, সেই সেই দিন সেই বাবুও অনেকক্ষণ ছাদে থাকে; কেবল আমার দিকে চায়;—কেবল চায়—কেবল চায়। আমি তার পানে মাথা তুলে চাই না, আড়ে আড়ে চেয়ে রঙ্গ দেখি।

ফ। (সবিস্ময়ে) বাবু!—কি রকম বাবু?—তার চেহারাটা কেমন?

ডাই। চেহারা খুব ভাল। দিব্য সুপুরুষ। ভাল ভাল কাপড় পরা, মাথায় লম্বা লম্বা চুল, মাজখানে সিঁতি কাটা, দিব্য কেয়ারি করা গোঁপ, খুব বড় বড় চক্ষু, চমৎকার দেখ্‌তে। বোধ করি, আমাদের দলের নয়;—কিছু অঙ্গহীন আছে।

ফ। অঙ্গহীন কি রকম?

ডাই। মুখে দাড়ি নাই, চক্ষে চস্‌মা নাই।

ফ। ওঃ! সেই বাবু?—তাকে আমি চিনি। সম্প্রতি আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। পাড়াগাঁয়ে বাড়ী ছিল, পরিবার নিয়ে সহরে এসেছে। তুমি যে অঙ্গহীনের কথাটা বোল্‌চ, সেটা আর বড় বেশী দিন থাক্‌বে না। আমি তাকে ফুস্‌লে ফাস্‌লে দলে আন্‌বার যোগাড় করেছি। আমি একা নয়, আমার সঙ্গে আরও দুই চারিজন বন্ধু লোক সেই বাড়ীতে যাওয়া-আসা করেন; সত্যধর্ম্মের গুণ-কীর্ত্তন কোরে তাকে আমরা অনেকদূর সোজা কোরে এনেছি, রবিবারে রবিবারে সমাজে নিয়ে যাই, সমাজের বক্তৃতা শুনে শুনে আমাদের দিকে

তার মন ফিরেছে। বাবুটা আগে আগে কপ্‌নি-পরা বাবাজী-দের মত "হরি হরি" বুলি কপ্‌চাতো, সে বুলি এখন ছেড়েছে। তবু এখনও কতকটা বাধা আছে। বাবুটার টাকা অনেক, নূতন আমদানী, বুঝ্‌তেই পার,—অনেকগুলো মোসাহেব জুটেছে; উনপাঁজুরে, বরাখুরে, হতভাগা মোসাহেব। তারা তাকে মাঝে মাঝে কালীঘাটে নিয়ে যায়, মদনমোহন দেখায়, চিৎপুরের সর্ব্বমঙ্গলা দেখায়, আরও কত যায়গায় কত কি করে, সে সব চর্চ্চায় আমি থাকি না। মোসাহেবগুলোকে সরাতে পার্‌লে, তাকে আমরা বেশ হাত কর্‌তে পার্‌বো, একচেটে কোরে রাখ্‌বো এমন ভরসা রাখি।

ডাই। (একটু চিন্তা করিয়া) বটে!—তবে ত ভাল। আচ্ছা, তাকে একবার আমাদের বাড়ীতে আন্‌লে হয় না?

ফ। (সবিস্ময়ে) বল কি?—নূতন লোক, অচেনা, মোসাহেবের কাপ্তেন, তাকে তুমি বাড়ীতে আন্‌বে?

ডাই। দোষ কি?—তুমি যদি তাকে দলে আন্‌বার যোগাড় কর্‌তে পেরে থাক, তবে ত এখানে আন্‌তে পার্‌লে আরও সুবিধা হবে। হ'লিই বা পাড়াগেঁয়ে, লেক্‌চারের জোরে কত শত পাড়াগেঁয়ে ভূতকে মানুষ কোরে তোলা যায়। দেখ্‌চো না, আমাদের ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বড় বড় লেক্‌চারের জোরে হাজার হাজার পাড়াগেঁয়ে ভূতের ছানাকে বিষ্ণু-প্রেমে মাতিয়ে তুলেছেন। কেশববাবুর ক্ষমতা বেশী, তিনি অনেক লোককে সুপথে এনেছেন, কত বাঙাল, কত উড়ে, কত ধাওড় আর কত ভেঁড়িওয়ালা মেড়ুয়াকে সৎপথে আন্‌তে পেরেছেন, আমরা কি একটা পাড়াগেঁয়ে ভদ্রলোককে ভজাতে পার্‌বো না?

ফ। পার তুমি, পার তুমি, কিন্তু –

ডাই। কিন্তু কি?

ফ। কিন্তু আমার মনে কেমন কেমন লাগে। কেমন এক রকম ভয়—

ডাই। ভয়!—কিসের ভয়?—সে কি বনের বাঘ, টপ ক'রে আমাকে খেয়ে ফেল্‌বে? আরো এক কথা, তাকে যখন আনাবো, আগে থাক্‌তে দিন স্থির কোরে তোমাকে খবর দিয়ে রাখ্‌বো, তুমিও সেই সময় আমার কাছে উপস্থিত থাক্‌বে।

ফ। (সন্দেহক্রমে) উপস্থিত থাক্‌তে পারি, তবু তোমার সঙ্গে নূতন লোকের মিলনটী আমার পক্ষে—আমার চক্ষে বোধ হয় অসহ্য হতে পারে।

ডাই। (তিরস্কার করিয়া) তবে তুমি কিসের সভ্য? তবে তুমি কিসের ব্রহ্মজ্ঞানী?—কিসে তুমি নারী-স্বাধীনতার বন্ধু হতে চাও? একটীর কথা কেন, আমি যদি দশটী আনি, সেটি আমার ইচ্ছা,—সেটি আমার স্বাধীনতা;—তুমি তাতে বাধা দিবার কে?—আমার ইচ্ছার উপর কথা ক'বার তোমার কি অধিকার?

ফ। (বিষণ্ণ হইয়া) তবে আর একটু মদ দাও।

ইচ্ছা না থাকিলেও ডাইমনকুমারী একটী পাত্রে অর্দ্ধমাত্রা মদিরা ঢালিয়া, জল মিশাইয়া বিদ্যাবাগীশকে অর্পণ করিলেন, কম্পিতহস্তে পাত্রটী মুখের কাছে তুলিয়া বিদ্যাবাগীশ মহাশয় এক নিশ্বাসে সেটুকু নিকাশ করিয়া ফেলিলেন, তৃপ্তি বোধ হইল না, মুখ বাঁকাইয়া দন্ত বাহির করিয়া ঘৃণার স্বরে বলিলেন, "ছ্যাঃ!—কেবল জল—কেবল জল!"

নেশাখোরের নেশা ধরিলে, কিম্বা নেশা ছুটিবার উপক্রম হইলে কিম্বা মাতালেরা যাহাকে খোঁয়ারী বলে, সেই রোগের আক্রমণ হইলে, মাতালেরা অপরের হস্তে সুধা পান করিবার অপেক্ষা করে না; নিজেরাই সাকী হয়, নিজেরাই পানকর্ত্তা, নিজেরাই ইচ্ছাময়, নিজেরাই সর্ব্বময় হইয়া উঠে। ফটিকচাঁদ সে সময় তাহাই হইলেন; সুধামুখীর পদ্মহস্তে পাত্র গ্রহণ করিয়া তৃপ্তি বোধ হইল না, নিজেই পূর্ণ শিশি তুলিয়া লইয়া মুখে ঢালিতে আরম্ভ করিলেন, সোডা মিশাইবার অথবা জল মিশাইবার কথাটা মনেই রহিল না; ঘন ঘন শিশি-গর্ভস্থ আরক্ত বিষ গলায় ঢালিতে লাগিলেন; বারকতক ঐরূপ হই-বার পর সর্ব্বশরীর টলটলায়মান; মাথাটা চেয়ারের হাতলের উপর হেলিয়া পড়িল, চক্ষু বুজিয়া বুজিয়া আসিতে লাগিল, হুলো বেড়ালের গর্জ্জনের ন্যায় ওয়াক্ ওয়াক্ শব্দ! চেয়ার হইতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম!

গতিক দেখিয়া ডাইমনকুমারী যুগল হস্তে মাতালটাকে ধরিয়া, চেয়ার হইতে নামাইয়া, কারপেটের উপর শুয়াইয়া দিলেন, মাতালের হিক্কা উঠিতে লাগিল; হিক্কার সঙ্গে সঙ্গে জড়িত জিহ্বায় অস্পষ্ট অস্পষ্ট কাটা কাটা বুলী—"ওম্ সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্ সত্যম্"—আর বাহির হইল না; মাতাল খানিক-ক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর হঠাৎ যেন কি স্বপ্ন দেখিয়া সেইরূপ স্বরে বলিয়া উঠিল, "বাওয়া ডাইমন্, বাওয়া ডাইমন্, তুমি, তুমি—তু—তু—তু—তুমি আমার হও।"

এই রসালাপের পর মাতালের বাক্য হরিয়া গেল,—একে-বারে বেহুঁস্। ডাইমনকুমারী সঙ্কটে পড়িলেন, কি করিবেন,

ভাবিয়া পাইলেন না। রাত্রি ক্রমশঃ অধিক হইতে লাগিল, মাতা যদি তাহাকে ডাকেন, কিম্বা পিতা যদি সেই ঘরে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে কি হইবে সেই চিন্তা আসিল। ফটিকচাঁদ নিত্য আইসে, আদরিণী মেয়েটীকে বিদ্যা শিক্ষা দেয়, ইহা তাঁহারা জানেন, ফটিকচাঁদ মদ খায়, তাহাও তাঁহারা জানেন, কিন্তু ফটিককে সেরূপ বেহুঁস অবস্থায় সেঘরে একদিনও তাঁহারা দেখেন নাই, সে রাত্রে যদি হঠাৎ তাঁহারা আসিয়া পড়েন, কি বলিবেন, ডাইমনের মনে তখন সেই ভাবনা।

কেহই আসিলেন না। খানিকক্ষণ পরে মাতাল একবার গা নাড়া দিল, গোঁ গোঁ করিয়া কি বলিল, কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া বসিল, মাথা ঘুরাইয়া জড়াইয়া জড়াইয়া বলিল, "মদ্ দ্যাও !"

নিকটেই ডাইমনকুমারী, তিনি কিন্তু কোন কথাই বলিলেন না। মাতালটা দুই তিনবার উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল, টলিয়া টলিয়া ধুপ্ ধুপ্ করিয়া পড়িয়া গেল; শেষকালে বলিল, "আ—আ—আ—আমি ঘরে যাই।"

ডাইমনের ইচ্ছা ছিল না যে, সে অবস্থায় তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন কিন্তু নেশার ঝোঁকে ফটিকচাঁদ নাছোড়। কাজে কাজেই ডাইমন্ তাহাকে তুলিয়া দাঁড় করাইলেন, মাতাল টলিতে লাগিল; দরজা খুলিয়া, তাহার হাত ধরিয়া, সিঁড়ি দিয়া নামাইয়া তাহাকে রাস্তায় বাহির করিয়া দিলেন। মাতালটা টলিতে টলিতে আট দশ হাত চলিয়া গেল, দুই-একবার পথের মাঝখানে আছাড় খাইল, আবার উঠিল, আবার চলিতে লাগিল; ডাইমনকুমারী সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

ভবেশ্বরের ভবসংসারের খেলা অতি বিচিত্র। কত প্রকার খেলা আছে, মানুষ তাহার সংখ্যা করিতে পারে না। ভবেশ্বর চিরকাল বালক, অনাদি অনন্ত; তিনি খেলা করিতে জানেন, কিম্বা না জানেন, তিনি ভিন্ন আর কেহ সে কথা বলিতে পারিবেন না। অল্পবুদ্ধিতে চর্ম্মচক্ষে আমরা দেখিতে পাই, সমস্তই যেন তাঁহার খেলা; তিনি পুতুল গড়েন, পুতুল নাচান, পুতুল ভাঙ্গেন, খেলাঘর বাঁধেন, আবার এক এক সময় সেই ঘরগুলি ভাঙ্গিয়া দেন, ঝড়ে উড়াইয়া দেন, অগাধ সাগরে ডুবাইয়া দেন। কতকাল যে এই রকম খেলা চলিয়া আসিতেছে, কস্মিনকালেও কেহ তাহা নির্ণয় করিতে পারে নাই। বাস্তবিক খেলা চলিতেছে। এই কল্পে নির্ঘণ্ট মধ্যে দুটী নায়ক নায়িকার যেরূপ খেলা বর্ণিত হইল, ইহাও এক রকম ভবের খেলা।

অষ্টম কল্প।

নূতন আলাপ।

রজনী প্রভাত হইল। ঘোর মাতাল হইয়া ফটিকচাঁদ গোস্বামী অত রাত্রে একাকী কোথায় গিয়াছিল, শীঘ্র তাহা প্রকাশ পাইল না। শনিবার রাত্রি, শনিবার রাত্রিতে কলিকাতা সহরে কোথায় কিরূপ অভিনয় হয়, নিশাচরেরাই তাহা অবগত আছে; নিশার অন্ধকার দূর হইলে নগরবাসীরা লোকমুখে অল্পে অল্পে কিছু কিছু তত্ত্বের আভাস জানিতে পারে। চিৎপুরের বাগানের হুতোম পেঁচা তাহার কতক কতক দর্শন করিয়া আলোচনা করিয়াছে।

রবিবার বৈকালে ডাইন্‌কুমারী সুন্দর বেশভূষা করিয়া আপন বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, এক একবার আসন হইতে উঠিয়া দেওয়ালের বৃহৎ দর্পণে নিজের মুখচ্ছবি দর্শন করিতেছেন, এক একবার দ্বার-গবাক্ষের দিকে নেত্র ঘুরাইতেছেন; বিদ্যাবাগীশের আগমন প্রতীক্ষা।

বিদ্যাবাগীশ দর্শন দিলেন না। ডাইমন্‌কুমারীর উদ্বেগ বৃদ্ধি হইল। সূর্য্যদেব রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া অস্তাচলে গমন করিবার উপক্রম করিতেছেন, গগনবিহারী বিহঙ্গকুল নানাপ্রকার কলরব করিয়া স্ব স্ব নীড়ে ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, দেখিতে দেখিতে সূর্য্যাস্ত। সন্ধ্যার পর সমাজের অধিবেশন, ডাইমনকুমারীকে সমাজে যাইতে হইবে, দরজায় একখানা ঠিকাগাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল, ডাইমনকুমারী সেই

গাড়ীতে আরোহণ করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে সমাজে গমন করিলেন। উপাসনা আরম্ভ হইল সেদিকে ডাইমনকুমারীর কর্ণ রহিল না; কর্ণ অবশ্যই রহিল কিন্তু মন চঞ্চল; সভায় যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের দিকে ঘন ঘন কটাক্ষপাত; বিদ্যাবাগীশকে দেখিতে পাইলেন না। উদ্বেগ আরও বৃদ্ধি হইল। কি কারণে উদ্বেগ তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সুকঠিন; ভালবাসার খাতিরে কিম্বা মাতালের অবস্থা চিন্তায় সেই উদ্বেগের আবির্ভাব, স্বয়ং ডাইমন ভিন্ন অপরে তাহা অনুমান করিয়া বলিতে পারে না।

উপাসনা হইল, বক্তৃতা হইল, সংগীত হইল, ডাইমনকুমারী চঞ্চলা। সমাজের সংগীতে ডাইমনের যোগ দেওয়া অভ্যাস কিন্তু সেদিন ডাইমনকুমারী একটীও গীত গাহিলেন না। সভা ভঙ্গ হইল, তিনি স্ব গৃহে চলিয়া গেলেন।

বাড়ীতে গিয়াও ডাইমনকুমারীর মন স্থির হইল না। অন্য-মনস্ক হইবার অভিপ্রায়ে অন্তরে তিনি অন্য চিন্তা আনয়ন করিলেন। সে চিন্তাও চঞ্চলা। পাঁচ রকম চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভাবিলেন, সেই যে পাড়াগেঁয়ে বাবুটী, তাহার সহিত একবার দেখা করিতে সাধ হয়। কিন্তু কিপ্রকারে দেখা হইবে? বিদ্যাবাগীশ বলিয়া গিয়াছে, তাহার সঙ্গে সেই বাবুর আলাপ হইয়াছে, বিদ্যাবাগীশকে দূত নিযুক্ত করিয়া তাহার দ্বারা আনাইতে পারিলেই সুবিধা হয়, বিদ্যাবাগীশ ত আসিল না, তবে কি করা যায়? আবার ভাবিলেন, বিদ্যাবাগীশ যে তাহাকে আনিবে, এমন ত সম্ভব বোধ হয় না; কথাটী পড়িবা-মাত্র বিদ্যাবাগীশের বুকের ভিতর ঈর্ষার আগুন জ্বলিয়াছিল; প্রণয়ের ঈর্ষা;—মানুষের মনের গতি বুঝিয়া উঠা ভার। বুকের

ভিতর ঈর্ষা বিদ্যাবাগীশের মুখের কথাতেও তাহা আমি বুঝিয়াছিলাম। কথাটা শুনিয়া আমার হাসি পাইয়াছিল, প্রণয়ের ঈর্ষা!—কেন? বিদ্যাবাগীশের প্রতি কি আমার অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছে? সত্য সত্যই হাসির কথা। বিদ্যাবাগীশ কিন্তু তাহাই বুঝিয়া রাখিয়াছে। না,—তাহার দ্বারা আনানো হইবে না;—আমি নিজেই সেই বাবুটীকে একখানা পত্র লিখি।

মনে মনে এইরূপ কল্পনা আনিয়া ডাইমনকুমারী চেয়ারে গিয়া বসিলেন; টেবিলের উপর দোয়াত, কলম, কাগজ, সমস্তই মজুত ছিল, তিনি পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। নূতন মানুষকে যেভাবে পত্র লিখিতে হয়, সুন্দরীকুমারী সেই ভাবেই শব্দবিন্যাস করিতে লাগিলেন, স্বয়ং তিনি ব্রাহ্মিকা, মুখের বচনে এবং লিপির বয়ানে পদে পদে শিষ্টাচার দেখাইতে হয়, ডাইমনকুমারী প্রত্যেক পদে, প্রত্যেক বাক্যে, প্রত্যেক বর্ণে উচিতমত শিষ্টাচার প্রকাশ করিলেন।

পত্র লেখা সমাপ্ত হইল, বাকী কেবল দস্তখত করা। দস্তখতটী কিরূপ হইবে? কোন্ নাম দস্তখত করিবেন? মনে মনে এই তর্ক উঠিল। তর্ক উঠিবার কারণ কি? কারণ আছে।

কুমারীর আসল নাম ডাইমনকুমারী নহে, পিতা-মাতার দত্ত শৈশবের নাম হইতেছে মধবাসন্তী; ব্রাহ্মিকা হইয়া অবধি ডাইমনকুমারী নাম ধারণ। ফটিকচাঁদ গোস্বামী ঐ নামটীই ভালবাসে। ভালবাসিলে কি হয়, অপর লোককে পত্র লিখিবার সময় ঐরূপ নাম স্বাক্ষর করা কিছু দোষের কথা;

বাজারের গণিকাদলের ঐরূপ নাম থাকিলেই ভাল মানায়, ইহাই ভাবিয়া ডাইমনকুমারী সেই পত্রে স্বাক্ষর করিলেন, শ্রীমতী নববাসন্তী ভট্টাচার্য্য।

আমাদের দেশের ব্যবহার আছে, ব্রাহ্মণের কন্যারা দেবী, শূদ্রের কন্যারা দাসী উপাধিতে পরিচিত হয়, কিন্তু যাঁহারা এখন বিলাতী সভ্যতার দাস দাসী হইতেছেন, তাঁহারা পূর্ব্ব পদ্ধতিটীকে অসভ্য পদ্ধতি বলিয়া অবজ্ঞা করেন। কন্যারা যতদিন অবিবাহিত থাকে, ততদিন পিতার উপাধিতে, বিবাহের পর স্বামীর উপাধিতে গণনীয়া হয়; সেই সভ্য পদ্ধতি অনুসারে ভজহরি ভট্টাচার্য্যের কুমারী কন্যা স্বাক্ষর করিলেন, নববাসন্তী ভট্টাচার্য্য।

এইবার বিভ্রাট। পত্রে শিরোনাম দেওয়া হয় নাই। যাঁহার উদ্দেশে পত্র, তাঁহার নাম জানা নাই। পত্র লিখিতে আরম্ভ করিবার সময় নববাসন্তীর সে কথাটী মনে ছিল না। এখন হয় কি? বাসন্তী ভাবিলেন, ভারী ভুল হইয়াছে। ফটিকচাঁদ যখন নূতন বাবুর গল্প তুলিয়াছিল, আলাপের কথা বলিয়াছিল, সেই সময় নামটী জানিয়া লইলেই ভাল হইত। যাহা হয় নাই, তাহার আর চারা নাই, পত্রখানা কিন্তু পাঠাইতেই হইবে। খানিক-ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, গালে হাত দিয়া খানিকক্ষণ ভাবিয়া, আপনা আপনি ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া, কৌতুকে বাসন্তী বলিয়া উঠিলেন, তাহাই ঠিক। যাহা আমি জানি, তাহাই লিখিব। অবশ্যই বিশ্বাসী লোকের দ্বারা পত্র পাঠাইব, কিছুই গোলযোগ হইবে না। এইরূপ স্থির করিয়া বাসন্তী তখন চিঠিখানি মোড়ক করিলেন, সে সময় ওয়েকারের ব্যবহার ছিল,

যখন ওয়েফার দিয়া আঁটিলেন, হাসিয়া হাসিয়া লিখিলেন, "শ্রীযুক্ত নূতন বাবু।"

বলা উচিত, পত্রগর্ভ এবং শিরোনাম উভয়ই আলতার জলে লেখা।

বিশ্বাসীলোকে পত্র লইয়া যাইবে, কিন্তু কে সেই বিশ্বাসী লোক? পত্র হস্তে লইয়া ডাইমনকুমারী কি চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দাসী আসিয়া ডাকিল, "দিদিবাবু! অনেক রাত হয়েচে, বাড়ীর ভিতর চল।"

পত্রখানি বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে রাখিয়া দিয়া, গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দাসীর সঙ্গে ডাইমনকুমারী অন্দরমহলে প্রবেশ করিলেন। রাত্রে আর বর্ণযোগ্য বিশেষ ঘটনা কিছুই হইল না।

পরদিন প্রভাতে বেলা নবম ঘটিকার সময় ডাইমনকুমারী পূর্ব্বোক্ত বৈঠকখানার ভিতর দিকের একটী গবাক্ষের ধারে দাঁড়াইয়া কিঞ্চিৎ উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "নবজীবন!"

পাঠক মহাশয় স্মরণ রাখিবেন, ভজহরি ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম নবজীবন। দিদির আহ্বানে নবজীবন শীঘ্র শীঘ্র বৈঠকখানায় আসিয়া দেখা দিল। পুস্তকের ভিতর হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া নবজীবনের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ডাইমনকুমারী পশ্চিম দিকের মুক্ত-বাতায়ন-পথে দাঁড়াইয়া অঙ্গুলী সঙ্কেতে নবজীবনকে একখানি বাড়ী দেখাইয়া দিয়া, মৃদুস্বরে বলিলেন, "দেখ নবজীবন, ঐ যে বাড়ীখানি দেখা যাচ্চে, ছাদের মাথার উপর ছোট ছোট চূড়া, নম্বর আমি জানি না, এই চিঠিখানি নিয়ে তুমি একবার ঐ বাড়ীতে যাও; ঐ বাড়ীতে যে বাবু থাকেন, তাঁর হাতে এই চিঠিখানি দিও। বাবুর কাছে যদি বেশী

লোকজন থাকে, তা হলে তাঁকে তুমি চিন্তে পার্ব্বে না, জিজ্ঞাসা কোরে জেনে নিয়ে, তাঁকে একটু তফাতে ডেকে, এই পত্রখানি দিও, লোকের সাম্‌নে দিও না। বুঝেছ ?”

মাথা নাড়িয়া নবজীবন বলিল, “ঠিক বুঝেছি।”

একটু হেঁট হইয়া, জীবনের মুখে একটী মধুর চুম্ব দিয়া, ডাইমনকুমারী সেই পত্রখানি তাহার হাতে দিলেন, আবার সাবধান করিয়া বলিলেন, “আর দেখ, পত্রখানি লুকিয়ে নিয়ে যাও, কেহ যেন দেখ্‌তে পায় না।”

পত্র লইয়া নবজীবন চলিয়া গেল, ডাইমনকুমারী চেয়ারে বসিয়া বিদ্যাসুন্দর খুলিলেন। পাঠ করিবার জন্য নয়, নবীন ব্রতের ফলাফল ভাবিবার জন্য। পুস্তকের যে স্থানটি তিনি খুলিয়াছিলেন, সেইস্থানে সুড়ঙ্গপথে সুন্দরের বিদ্যার মন্দিরে প্রবেশ। একবার সেই দিকে চক্ষু দিয়া বিদ্যাবতী হাসিলেন; ভাবিলেন, বাঃ! বেশ জায়গা! ঐ বাড়ীর নীচে দিয়া এই বাড়ী পর্য্যন্ত যদি একটা সুড়ঙ্গ থাকিত, সেই রকমের যদি একটা মালিনী থাকিত, তাহা হইলে বড়ই মজা হইত। কেহই কিছু জানিতে পারিত না, কাহাকেও কিছু বলিতে হইত না। যাহা হউক, চিঠিখানি ত পাঠান গেল, পাইবেনও ঠিক, তবু এখন আমার সন্দেহ ঘুচিতেছে না, বুক যেন নাচিতেছে, চক্ষু যেন নাচিতেছে; এ সকল কিসের লক্ষণ ? ভাল কি মন্দ ? সন্দেহ আসিতেছে, তিনি আসিবেন কি না ? হিন্দুরা বলে, স্ত্রীলোকের বাম চক্ষু নাচিলে ভাল হয়; আমারও ত বাম চক্ষু নাচিতেছে; হিন্দুদের কথা যদি সত্য হয়, তবে হয়ত আমার আশা পূর্ণ হইতে পারিবে। লক্ষণ যদি মন্দ হয়, তবে ত—না না,—সে সন্দেহ

বৃথা; অবশ্যই তিনি আসিবেন। বিদ্যাবাগীশের মুখে যেরূপ শুনিয়াছি, তাঁহার চরিত্র যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহাতে আর সন্দেহ রাখিবার কারণ নাই;—অবশ্যই তিনি আসিবেন। কিন্তু কখন? সময় ত আমি লিখিয়া দিয়াছি, তবু যদি—সে সময়ে তাঁহার অন্য কোন কাজ থাকে,—না না,—অন্য কাজ থাকিবে না, যদিও থাকে, আমার সঙ্গে দেখা করিতে তিনি কখনই অন্যথা করিবেন না। আমার মত স্ত্রীলোকের পত্র,—আমি সুন্দরী কি না, তাহা আমি জানি না, কিন্তু তিনি আমাকে ছাদে দেখিয়াছেন, আমিও তাঁহাকে দেখিয়াছি, সে কথাও পত্রে লিখিয়া দিয়াছি, অবশ্যই আসিবেন।

নববাসন্তী এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় নবজীবন ফিরিয়া আসিল। সাগ্রহে বাসন্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাই, দিয়া আসিয়াছ?"

নবজীবন উত্তর করিল, হাঁ দিদি, দিয়াছি; সেখানে আর কেহ ছিল না, তিনি একাই ছিলেন। তিনি বেশ লোক, পত্রখানি পাঠ কোরে হাসিতে হাসিতে আমাকে কতই আদর কোল্লেন।"

সানন্দে ভ্রাতার বদনে চুম্বন করিয়া নববাসন্তী বিস্তর স্নেহ-বাক্য বলিলেন, "পত্র আমি পাঠাইয়াছি, তুমি লইয়া গিয়াছ, কাহারও কাছে সে কথাটা বলিও না,—বাড়ীর ভিতরেও না।" এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন। বালক চলিয়া গেল।

বলিতে হইবে না, এই দিন সোমবার।

এই দিনেই ডাইমনকুমারীর বৈঠকখানায় নূতন বাবুর নিমন্ত্রণ;—ডাইমনকুমারীর পত্রে ঐরূপ লেখা।

বৈকাল ;—বৈঠকখানায় ডাইমনকুমারী।—অন্যান্য দিন বৈকালে ডাইমনের যে প্রকার বেশ-ভূষা থাকে, এই সোমবার বৈকালে তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী জাঁকালো। আরও একটু বেশী,—বিবিদের মত উভয় কপোলে গোলাপী রং মাখা ;—পোষাকে, মস্তকের কেশে ও হস্তের রুমালে চমৎকার সুগন্ধ মাখা,—সেই সুবাসে গৃহ আমোদিত।

অভ্যাসমত চেয়ারে বসিয়া ডাইমনকুমারী ভাবিতেছেন, এইত বৈকাল,—আমন্ত্রণপত্রে বৈকালের কথাই লিখিয়া দিয়াছি।—ঘড়ির কাঁটা কোন্ ঘরে থাকিলে ঠিক বৈকাল বলা যায়, সেটা কিন্তু আমি নিশ্চয় করিয়া লিখিতে ভুলিয়াছি। হইলই বা ভুল, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত বৈকাল, সকলেই তাহা জানেন। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই তিনি আসিবেন, এইরূপ আমার আশা।

ভাবিতে ভাবিতে আর এক চিন্তার উদয়। ডাইমন ভাবিলেন, যে সময়ে তিনি আসিবেন, সেই সময় যদি ফটিকচাঁদ থাকে, কিংবা তিনি আসিবার পর যদি ফটিকচাঁদ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কি হইবে? ফটিকচাঁদ কি মনে করিবে? উভয়ের আলাপ আছে, সে কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ততটা সন্দেহের হেতু থাকিবে না, দু-এক কথাতেই সন্দেহ মিটিয়া যাইবে। সন্দেহই বা কি, ভয়ই বা কি?—আমি আপন ইচ্ছায় সকল কাজ করি, ইচ্ছা আমার সহচরী—ইচ্ছা আমার মঙ্গলদায়িনী,—স্বাধীনতার মহিমায় ইচ্ছা আমার শিরোমণি! ভয় কি?

বেলা অবসান হইতে লাগিল, গবাক্ষরন্ধ্র দিয়া সূর্য্যরশ্মী গৃহ

মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, তাহা অদৃশ্য হইল; ডাইমনকুমারী আসন হইতে উঠিলেন, রাস্তার দিকে দুই একবার উঁকি মারিলেন, অস্থিরচরণে কার্পেটের উপর পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। কে অগ্রে আসিবে, মনোমধ্যে সেই চিন্তাই প্রবলা। শনিবার রাত্রে মাতাল হইয়া ফটিকচাঁদ চলিয়া গিয়াছে, তদবধি তাহার কোন সংবাদ নাই,রবিবার এখানে আইসে নাই,সমাজেও যায় নাই, আজ এখানে আসিবে কি না তাহারও ঠিক নাই। দুই দিন যখন খবর নাই, তখন একটা ভাবনার কথা বটে; তাহার কি হইয়াছে, বুঝা যাইতেছে না। ফটিকের হাজিরা ঠিক ঠিক থাকে, একদিনও কামাই নাই, কল্য কামাই হইয়া গিয়াছে, আজ কি আবার কামাই করিবে? এইত তাহার আসিবার সময় হইয়াছে, এখনও ত আসিল না, বোধ করি, আজও হয়ত আসিবে না; হয়ত তাহার কোন রকম অসুখ হইয়া থাকিবে।

সন্ধ্যা হইল। আয়া আসিয়া মার্জ্জিত সামাদানে সেজ ঢাকা দিয়া দুইটা বাতি জ্বালিয়া দিয়া গেল;—টেবিলের উপর একটা, কার্পেটের বিছানার উপর একটা।—ডাইমনকুমারী পরিভ্রমণ করিতে করিতে পুনর্ব্বার চেয়ারে আসিয়া বসিলেন, দৃষ্টি রহিল দ্বারের দিকে।

নাট্যরঙ্গভূমির নায়িকারা এক এক সময়ে যেমন একা একা স্বগত কথা কয়, ডাইমনকুমারী সেইরূপে মৃদুকণ্ঠে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, বৈকাল ত ফুরাইয়া গিয়াছে. বৈকালে আসিবার জন্য নূতন বাবুর আমন্ত্রণ;—কৈ, তিনি ত এখনও আসিলেন না; তবে কি আসিবেন না? না—এমন হইতে পারে না; ফটিকচাঁদ বলিয়াছিল, নূতনবাবু ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছেন, ব্রহ্ম-

জ্ঞানীরা আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করেন না, মিথ্যা কথাও জানেন না; যদিও কথা দেন নাই, তথাপি পত্র পাইয়া যখন চুপ করিয়া আছেন, তখন অবশ্যই আসিবেন। নবজীবনের সাক্ষাতেই তিনি পত্রখানি পাঠ করিয়াছিলেন, আসিবার ইচ্ছা না থাকিলে অবশ্যই নবজীবনকে সে কথা বলিয়া দিতেন। তাহা যখন বলেন নাই, তখন অবশ্যই আসিবেন। তবে এত বিলম্ব হইতেছে কেন? বাড়ী ত ভুল হইল না? না,—তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই; পত্রে আমি বাড়ীর নম্বরটী স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিয়াছি, তবে—

ডাইমনকুমারী ভাবিতেছেন, মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, চৌকাঠের উপর নূতন বাবু!

প্রফুল্লবদনে চেয়ার হইতে উঠিয়া, ডাইমনকুমারী ত্বরিতপদে দ্বারের নিকটে গিয়া, করযোড়ে নমস্কার করিয়া মধুরবচনে বলিলেন, "আস্তে আজ্ঞা হয়; বিলম্ব দেখিয়া আমি কতই ভাবিতেছিলাম।" ইচ্ছা হইয়াছিল, বাবুর হস্তধারণ করিয়া লইয়া আইসেন কিন্তু কেমন সঙ্কোচ আসিল, ততদূর সাহস হইল না, সম্মুখের চেয়ারখানি দেখাইয়া দিয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন। অনুরোধের অপেক্ষা ছিল না, বিস্ফারিত নেত্রে কুমারীর মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে বাবু তৎক্ষণাৎ গৃহ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক আসন পরিগ্রহ করিলেন। অল্পক্ষণ একটু দূরে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ডাইমনকুমারীও আপন আসনে গিয়া বসিলেন।

বঙ্গবাসী গৃহস্থ ভবনে এখনকার প্রথম অভ্যর্থনা—প্রধান অভ্যর্থনা তামাক। ব্রহ্মজ্ঞানীরা বড় একটা তামাক খান না, তথাপি ডাইমনকুমারী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনার কি

ধূমপান অভ্যাস আছে?” মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক বাবু উত্তর করিলেন, পূর্ব্বে ছিল, এখন পরিত্যাগ করিয়াছি।

একটা গোল মিটিয়া গেল। কুমারীর মধুর স্বর শ্রবণ করিয়া আনন্দে বাবুটীর হৃদয় নাচিল। চুম্বক যেমন লৌহ আকর্ষণ করে, সুন্দরীর সুন্দর বদনখানি সেইরূপ নূতন বাবুর সুন্দর নয়নদুটি আকর্ষণ করিল;—অনিমেষ দৃষ্টি। উভয়েরই দর্শনতৃষ্ণা সমান;—অবিচ্ছেদে চারি চক্ষের সম্মিলন।

পাঠক মহাশয় বুঝিয়া লইবেন, এই নূতন বাবুটী আপনাদের পূর্ব্বপরিচিত হলধরপুরের চন্দ্রকান্ত বাবু। অগ্রে সম্ভাষণ করিবার নিমিত্ত চন্দ্রকান্ত বাবু ওষ্ঠ কম্পিত করিতেছিলেন, তাঁহার বাক্যস্ফুরণ হইবার অগ্রেই সুমধুর কণ্ঠে সুন্দরী বলিতে আরম্ভ করিলেন, “বাবু! আপনাকে আমি ছাদের উপর হইতে প্রায় প্রত্যহই দেখিতাম, আপনার স্মরণ হইতে পারে, আপনিও সেই সময় আমাদের ছাদের দিকে চাহিতেন, আমি মনে করিতাম, হয়ত আপনি কোন প্রকার কৌতূহলবশে অন্য কিছু দেখিতেন, শেষে বুঝিয়াছিলাম, আমার দিকেই দৃষ্টি।”

অলক্ষিতে মৃদু হাসিয়া চন্দ্রকান্ত বলিলেন, “তোমার মত সুন্দরীকে দেখিতে কাহার না সাধ হয়? সত্য সত্য তোমাকেই আমি দেখিতাম। তোমার মস্তকে আবরণ থাকিত না, আমি একজন অপরিচিত পর-পুরুষ, আমাকে দেখিয়া তুমি ঘোমটা দিয়া সরিয়া যাইতে না, তাহাতেই আমি মনে করিতাম, হয়ত তুমি ব্রাহ্মিকা।”

কুমারী বলিলেন, “উপদেশ পাইয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছি, হিন্দুদের অসংখ্য দেবদেবী সমস্তই মিথ্যা – সমস্তই কল্পনা, সেই-

জন্য একমাত্র সনাতন পরব্রহ্মের চরণে স্মরণ লইয়া উপাসনা-পদ্ধতি শিক্ষা করিতেছি।”

চন্দ্র। উত্তম। এ সংসারে তিনিই একমাত্র নিত্য, বাকী সমস্তই অনিত্য। এই অল্পবয়সে তুমি যে সেই নিত্য সত্য নিরঞ্জনের পদাশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিয়াছ, ইহা শুনিয়া আমি বড়ই সুখী হইলাম।

ডাই। আপনাকে নমস্কার। আপনার কথা শুনিয়া বুঝিতেছি, আপনিও সেই নিত্য সত্য নিরঞ্জনের—

চন্দ্র। ছেলেবেলা আমি ভ্রান্ত ছিলাম, অজ্ঞান লোকের দেখাদেখি ঠাকুর পূজা, গঙ্গাস্নান, তুলসীগাছে প্রণাম ইত্যাদি বাজে কাজে আমার অনেক দিন কাটিয়াছিল, জ্ঞানের উদয় হওয়াতে, সে সকল উপসর্গ ছাড়িয়া দিয়া পরব্রহ্মের—কেবল একমাত্র পরব্রহ্মের শরণাপন্ন হইয়াছি।

ডাই। বড়ই সুখের কথা। শুনিয়াছি, আপনি পল্লীগ্রামে ছিলেন, পল্লীগ্রামের প্রতি জগৎপিতার কৃপা হইয়াছে, পল্লীগ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইতেছে, দেশের পক্ষে ইহা পরম সৌভাগ্য।

চন্দ্র। (হাস্য করিয়া) কেবল সহরেই কি জগৎপিতার কৃপা হয়? কেবল সহরেই কি ব্রহ্মজ্ঞান অর্জ্জন হয়? সেই সর্ব্বময়ের সর্ব্বব্যাপি, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বান্তর্য্যামী,—আখ্যাগুলি কি তবে কোন কাজের নয়?

ডাই। (একটু অপ্রস্তুত হইয়া মৃদু হাসিয়া) আমি ঠকিয়াছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

চন্দ্র। তোমার মত সুন্দরীদের ক্ষমা করা বড়ই গৌরবের কথা, জন্মদিন হইতেই তোমার মত সুন্দরীরা সর্ব্বলোকের ক্ষমার

পাত্রী। সে কথা এখন থাকুক, বল দেখি, আমাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল কি জন্য ?

ডাই। (একটু চিন্তা করিয়া) এখানকার একটী গোস্বামীর সহিত সম্প্রতি কি আপনার আলাপ হইয়াছে ? যাঁহার নাম ফটিকচাঁদ বিদ্যাবাগীশ, তিনি কি—

চন্দ্র। (যেন একটু শিহরিয়া) ফটিকচাঁদ ?—ওঃ! দেখিয়াছি বটে, মাঝে মাঝে আমার কাছে যায় বটে, কিন্তু সে কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ ?

ডাই। তিনি আমার পণ্ডিত ;—তিনি আমাকে লেখাপড়া শিখান, ধর্ম্ম উপদেশ দেন, সঙ্গে করিয়া সমাজে লইয়া যান, তিনিও ব্রহ্মজ্ঞানী।

চন্দ্র। (বিস্ময় প্রকাশ করিয়া) ব্রহ্মজ্ঞানী ? সেই ফটিকচাঁদ গোস্বামী একজন ব্রহ্মজ্ঞানী ?—বড় আশ্চর্য্য কথা ! অল্প দিনের জানাশুনাতে আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তাহার চরিত্র ভাল নয়। সে যদি ব্রহ্মজ্ঞানী নামে পরিচয় দেয়, সেটা ব্রহ্মজ্ঞানের কলঙ্ক।

ডাই। (সন্দেহে সন্দেহে চন্দ্রকান্তের মুখপানে চাহিয়া) কেন ?

চন্দ্র। দুই তিনদিন আমি দেখিয়াছি, সে যখন আমার বৈঠকখানায় গিয়া আমার গা ঘেঁসিয়া বসিয়াছিল, তখন আমি তাহার মুখে মদের গন্ধ পাইয়াছিলাম। কেবল গন্ধমাত্র নয়, তাহার মুখে অনেক বেফাঁস কথা ছুটিয়াছিল। যারা যারা মদ খায়, তারা বিস্তর বিশ্রী কথা কয়, আরও মদের দোষ অনেক, মদের অনুচর অনেক ; মদের সঙ্গে সঙ্গে অনেক দোষ আসিয়া মানুষকে খারাপ করিয়া দেয়। (হঠাৎ মৌনাবলম্বন)

ডাই। (একদৃষ্টে বাবুর মুখের ভাব নিরীক্ষণ করিয়া) আপনি কি ভাবিতেছেন?

চন্দ্র। ভাবিতেছি, সেই ফটিকচাঁদ তোমার পণ্ডিত? সেই ফটিকচাঁদ তোমার বিদ্যাশিক্ষক? সেই ফটিকচাঁদ তোমার ধর্ম্ম-শিক্ষক? সে কি রোজ আইসে?

ডাই। আজ্ঞা হাঁ,—রোজ আইসে, কিন্তু কল্য আইসে নাই। একদিনও কামাই হয় না, কল্য কামাই—

চন্দ্র। কখন আইসে?

ডাই। বৈকালে। কোন কোন দিন সন্ধ্যা হয়।

চন্দ্র। আজ কেন তবে আইসে নাই?

ডাই। তাহাই আমি ভাবিতে ছিলাম, এমন সময়ে আপনি দর্শন দিলেন, সে ভাবনা ঘুচিয়া গেল।

চন্দ্র। (আশ্বাসে—সন্দেহে) আমি আসিলাম, তাহাতে পণ্ডিতের না আসার ভাবনা ঘুচিয়া গেল, ইহা কিরূপ?

ডাই। (কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া) আপনাকে দেখিয়া আমি বড় প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনার কথাগুলি শুনিয়া আমার অন্য ভাবনা দূর হইয়াছে; আপনি ব্রহ্মপরায়ণ ধার্ম্মিক পুরুষ। যদি আমার ভাগ্যে থাকে, সপ্তাহে এক একটী দিন যদি আপনি দয়া করিয়া দর্শন দেন, তাহা হইলে চরিতার্থ হইব।

চন্দ্র। সপ্তাহে একদিন কেন, যদি তুমি ইচ্ছা কর, প্রতি দিন আসিয়া তোমার সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের আলাপ করিয়া স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতে পারি। আহা, কি সুমধুর বাক্য-বিন্যাস! যেমন মধুর রূপ, তেমনি মধুর মধুর বচনগুলি।

যেরূপ সুন্দর কৌশলে সেই লিপিখানি তুমি রচনা করিয়াছিলে, তাহা পাঠ করিয়া আমার আনন্দসিন্ধু উদ্বেলিত হইয়াছিল। ঐ সুন্দর হস্তের অক্ষরগুলি পরমসুন্দর। দুই তিনবার পাঠ করিয়াও আশা মিটিল না; যতবার পড়ি, ততবারই পাঠের পিপাসা বাড়িয়া বাড়িয়া উঠে; শেষকালে যেন আহ্লাদে উন্মত্তপ্রায় হইয়া লিপিখানি আমি চুম্বন করিয়াছিলাম।

ডাই। (যেন একটু লজ্জার ভাব আনিয়া, কিঞ্চিৎ বিনম্র-বদনে বিনম্র স্বরে) আপনি ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত, ইংরাজী সভ্যতার প্রিয়পাত্র, লিপি চুম্বন করা আপনার অভ্যাসসিদ্ধ; আমার লিপি ভাল বলিয়া চুম্বন করিয়াছেন, এমন আমার বিশ্বাস হয় না, অভ্যাসবশেই চুম্বন।

চন্দ্র। অভ্যাস নয়, অভ্যাস নয়, এই সবে নূতন। প্রতি-দিন শত শত পত্র আমার সম্মুখে কাঁড়ি হইয়া থাকে, শত শত পত্র আমি পাঠ করি, কোন দিন একখানি পত্রও আমি চুম্বন করি নাই, লিপি চুম্বন করা আজ আমার নূতন, আজই আমার প্রথম। ইংরাজীতে আমি পণ্ডিত নই, ইংরাজী সভ্যতাও পূর্ণমাত্রায় আমার শিক্ষা হয় নাই, কি জানি, কাহার উপদেশে তোমার লিপিখানি আমি চুম্বন করিয়াছিলাম। ইংরাজী সভ্যতা যাহারা ভাল জানে, তাহারা ইংরাজ;—ইংরাজেরা চুম্বনের পরম বন্ধু। পুরুষেরা পুত্রকে চুম্বন করে, বিবিকে চুম্বন করে, ভগ্নীকে চুম্বন করে, মাতাকে চুম্বন করে, একটু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিলে সকলকেই চুম্বন করে; বিবি লোকেরা—বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, সকলেই পরস্পর চুম্বন করিয়া থাকে;—অধিক কথা কি, পথে, ঘাটে, হাটে, মাঠে, বাজারে, থিয়েটারে, যেখানে

যেখানে দেখা হয়, সেইখানেই চুম্বনের ঘটা! লিপি চুম্বন, করচুম্বন, অধরচুম্বন, ওষ্ঠচুম্বন, ললাটচুম্বন, নেত্রচুম্বন, শিরশ্চুম্বন, সভ্যজাতির সর্ব্বত্রেই চুম্বনের রীতি আছে; সংস্কারের দোষে আমাদের দেশে চুম্বন শব্দটী অশ্লীল শব্দের মধ্যে গণ্য হইয়া পড়িয়াছে; আমি যদি একটী অপরিচিতা বালিকাকে স্নেহ করিয়া চুম্বন করি, অন্য লোকে যদি দেখে, তাহা হইলে বাহিরে বাহিরে ঢাক বাজাইবে, সহস্র প্রকার নিন্দা করিয়া অকারণে আমার গ্লানি রটাইবে।

ভাই। সে রটানটা কিন্তু ধর্ত্তব্যই নহে; অজ্ঞান হিন্দুরাই সেইরূপ নিন্দা রটাইবার গুরু। হাঁ, ভাল কথা;—কথা পাড়িলেই কথা কহিতে হয়, আমি আপনাকে একটী কথা বলি, বলা উচিত নয়,—মেয়েমানুষ আমি, তথাপি বলি,—যদি দোষ ভাবেন, অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করিবেন।

চন্দ্র। তোমার কথায় দোষ?—সেটা কি কখন সম্ভব? তুমি মধুমতি, তোমার সকল কথাই মধু। যাহা বলিতে চাও, অসঙ্কোচে অসন্দেহে স্বচ্ছন্দে বল।

ভাই। অনুমতি পাইলাম, বলি তবে। একটু পূর্ব্বে ফটিক-চাঁদের কথা তুলিয়া, আপনি বলিয়াছিলেন, ফটিকচাঁদের চরিত্র ভাল নয়, ফটিকচাঁদ মদ খায়। আমিও জানি, ফটিকচাঁদ মদ খায়, কিন্তু মহাশয়, স্বরূপ বলুন দেখি, মদ জিনিষটা কি এতই খারাপ? মদ্যপান করিলে কি মানুষের চরিত্র থাকে না?

চন্দ্র। একেবারেই খারাপ এমন কথা আমি বলি না। হিসাব ঠিক রাখিয়া লোকে যদি সেই জিনিষ ব্যবহার করে, তাহা হইলে ততটা দোষ হয় না, কিন্তু হিসাব জানে ক'জন?

যেরূপ দেখা যায়, তাহাতে বেশ বলিতে পারি, আমাদের দেশে শতকরা পাঁচটী লোকও মদের হিসাব রাখিতে পারে না; মাতামাতি, ঢলাঢলি, গড়াগড়ি হয়ই হয়। সাহেব লোকেরা স্ত্রী-পুরুষে মদ খায়, তাহাদের মধ্যে যাহারা যথার্থ ভদ্র, তাহাদের ভিতর আসলেই ঢলাঢলি হইতে পায় না।

ডাই। আজ্ঞে হাঁ, আপনার কথাই ঠিক। তবে স্বীকার করুন, সেটা কেবল মানুষের দোষ, জিনিষের দোষ নয়।

চন্দ্র। অবশ্য,—মানুষের দোষ, জিনিসের দোষ নয়। মদের অনেকগুলি গুণ আছে। নিয়ম রাখিতে পারিলে—পরিমাণ রাখিতে পারিলে সুরাপানে উপকার হয়;—স্ফূর্ত্তি আইসে, মেজাজ ভাল থাকে, মস্তিষ্ক উর্ব্বর হয়, শরীরের লাবণ্যও উজ্জ্বল হইয়া থাকে, কবিগণের কল্পনাশক্তি তেজস্বিনী হইয়া উঠে। (কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া) দেখ বাসন্তী, এই প্রসঙ্গে একটা মজার গল্প আমার মনে পড়িয়া গেল। সত্য সত্য গল্প কথা নয়, ঘটনাটা প্রকৃত, কিন্তু কিছু পুরাতন।

ডাই। (সকৌতূহলে) কি রকম গল্প?

চন্দ্র। চমৎকার গল্প, তুমি বোধ হয় অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াছ, বোধ হয় তোমার জানা থাকিতে পারে, পারস্যদেশে একজন কবি ছিলেন, তাঁহার নাম হাফেজ। তিনি একজন প্রধান কবি। তাঁহার মৃত্যুর পর ৩০ বৎসরের মধ্যে সে দেশে আর কেহ কবি হইতে পারেন নাই। ৩০ বৎসর পরে সেখানে লেখা-পড়ার চর্চ্চা বেশী হইলে প্রায় সকলেই আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, আমাদের দেশ কবিশূন্য হইল! বারবার ঐ প্রকার আক্ষেপ উক্তি শুনিয়া শুনিয়া দ্বাদশজন শিক্ষিত যুবা পরামর্শ

করিল, কবি হইতে হইবে। স্থানীয় প্রাচীন প্রাচীন পুরুষগণের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহারা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, হাফেজ কি প্রকারে কবি হইয়াছিলেন? প্রাচীনেরা হাস্য করিয়া উত্তর দেন, পাগল না কি? মানুষ কি প্রকারে কবি হয়, অপরে কি তাহা বলিয়া দিতে পারে? ঐরূপ উত্তর প্রাপ্ত হইয়া যুবকেরা এক প্রকার হতাশ হইয়াছিল।

ডাই। তাহার পর?

চন্দ্র। তাহার পর সেই যুবকেরা পরামর্শ করিল, দেশের লোকেরা আমাদের উপর হিংসা করিয়া সত্যকথা বলিয়া দিল না, দিবেও না, দেশের লোকের কাছে তত্ত্ব পাওয়া যাইবে না, বিদেশ ভ্রমণ করিয়া সন্ধান লইতে হইবে।

ডাই। তবে তারা বিদেশে গিয়াছিল না কি?

চন্দ্র। নিশ্চয়।—বিদেশ ভ্রমণে গিয়াছিল;—একসঙ্গেই দ্বাদশবন্ধু। নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া কোথাও কিছু তত্ত্ব না পাইয়া, শেষকালে তাহারা একটা বনের ধারে উপস্থিত হয়। একটা প্রাচীন বৃক্ষমূলে একজন অতি বৃদ্ধ ফকির বসিয়াছিল। গাত্রমাংস লোল, সুদীর্ঘ শ্বেতশ্মশ্রু নাভিদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত, নেত্রপল্লব, ভ্রূযুগল, কর্ণলোম সমস্তই শুভ্রবর্ণ; মস্তকের কেশ শ্বেতবর্ণ জটার আকারে উভয় স্কন্ধদেশ অতিক্রম করিয়া উরুদেশ পর্য্যন্ত ঝুলিয়াছে; নেত্র নিমীলিত, করদ্বয় বক্ষসংলগ্ন; সাধু ফকির নিশ্চলভাবে ধ্যানমগ্ন।

ডাই। সেই ফকির কি করিল?

চন্দ্র। ফকির অগ্রে কিছু করিল না, যুবকেরা তাহাকে দেখিয়া ভাবিল, এই ফকিরের নিকটেই আশা পূর্ণ হইবে।

অতি বৃদ্ধ, অথচ সাধু; ইনি অবশ্যই নিগূঢ় তত্ত্ব বলিয়া দিতে পারিবেন। মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তাহারা ধ্যান-ভঙ্গের প্রতীক্ষায় করযোড়ে ফকিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

ডাই। তাহার পর?

চন্দ্র। অনেকক্ষণ পরে ফকির একবার নয়ন উন্মীলন করিল; যুবকগুলিকে তদবস্থায় দর্শন করিয়া, প্রসন্নবদনে বলিল, "অতিথি,—আসুন, আসুন, এইখানে বসুন, ভাগ্যফলে অতিথি মিলিল, আমি সাধ্যমতে সেবা করিব।" যুবকেরা কর-যোড়ে বলিল, "আমাদের একটী নিবেদন আছে; আশা পূর্ণ না হইলে আমরা বসিব না।" ফকির জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কি বলিতে চান?" একজন যুবক উত্তর করিল, "পারশ্যদেশে হাফেজ নামে এক মহা কবি ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর ৩০ বৎসরের মধ্যে আর একটীও কবি জন্মগ্রহণ করেন নাই; অতএব আমরা জানিতে চাই, হাফেজ কি প্রকারে কবি হইয়াছিলেন?"

ডাই। ফকির সে কথায় কি উত্তর দিয়াছিল?

চন্দ্র। প্রশ্ন শুনিয়াই ফকিরের দুটী চক্ষে দরদরধারে জল পড়িতে লাগিল। যুবকেরা ভয় পাইয়া ভাবিল, কি করিলাম? সাধুকে কাঁদাইলাম! আমরা এমন কি কথা বলিয়াছি যে, সাধুপুরুষ কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলেন? ভয়ে ভয়ে বারম্বার সেলাম করিয়া করুণবচনে একজন যুবক বলিল, "আমরা কি কুকর্ম্ম করিয়াছি? অপরাধ ক্ষমা করুন, দয়া করুন, হাফেজ কিরূপে কবি হইয়াছিলেন, তাহাই মাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছি, ইহাতে আপনার চক্ষে জল আসিল, ইহার কারণ কি?" কাতরকণ্ঠে

ফকির বলিল, "আমি সেই স্বর্গীয় হাফেজের খানসামা ছিলাম, এতদিনের পর তাঁহার নাম শুনিয়াই আমার চক্ষে জল আসিয়াছে। আপনারা যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহার উত্তর আমি কি দিব? আমি খানসামা, মুখ্যু মানুষ, তিনি কিরূপে কবি হইয়াছিলেন, আমি তাহা কিরূপে জানিব? যখন তিনি লিখিতেন, তখন আমি দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতাম, যাহা যখন চাহিতেন, তাহাই যোগাইয়া দিতাম, এই পর্য্যন্ত আমার কাজ ছিল।" অনেকটা আশ্বাস পাইয়া উৎসাহে উৎসাহে একজন যুবক আবার জিজ্ঞাসা করিল, "লিখিবার সময় আপনি উপস্থিত থাকিতেন, অবশ্যই আপনি জানেন, সে সময় তিনি কি করিতেন। দয়া করিয়া বলুন, লিখিবার সময় তিনি আর কি করিতেন?" খানিকক্ষণ ভাবিয়া ফকির বলিল, "লিখিবার সময় একটু একটু সিরাজী সরাপ পান করিতেন।" যুবকেরা আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল।

ডাই। আহ্লাদে নাচিল—তাহার পর?

চন্দ্র। তাহার পর ফকিরকে ঘন ঘন সেলাম করিয়া যুবকেরা ছুটিয়া পলাইল, বসিলও না, সেবাও লইল না, দূরে গিয়া আপনা আপনি বলা বলি করিল, ঐ কথাই ঠিক কথা। আমাদের কোরাণ শাস্ত্রে সরাপ নিষিদ্ধ, সরাপ খাইয়াই হাফেজ কবি হইয়াছিলেন।

ডাই। সত্যই ত মজার গল্প! তাহার পর?

চন্দ্র। তাহার পর যুবকেরা দেশে ফিরিয়া গেল, একজনের বড় একটা বৈঠকখানা উত্তমরূপে সাজাইল, মধ্যস্থলে বৃহৎ একটা গোলাকার টেবিল পাতিল, টেবিলের উপর দিস্তা দিস্তা কাগজ,

ভাল ভাল কলম, বড় বড় দোয়াত সাজাইয়া রাখিল, সন্ধ্যার পর এক ডজন সিরাজী সরাপ আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া টেবিলের চারিদিকে বারোখানা চেয়ারে বারোজনে বসিল।

ভাই। বাঃ! এটাও ত ভারি মজা!—তাহার পর?

চন্দ্র। তাহার পর বারোটা গ্লাসে সিরাজী ঢালিয়া বারো-জনে পান করিল, এক একখানা কাগজ টানিয়া লইয়া দীর্ঘ দীর্ঘ কলম ধরিল, কালী ডুবাইল, কাগজে অক্ষর লিখিবার চেষ্টা, কিন্তু একটীও অক্ষর বাহির হইল না, কবিতা আসিল না।

ভাই। তাহার পর?

চন্দ্র। তাহার পর যুবকেরা তিন তিন পাত্র সিরাজী উজাড় করিল, আবার কলম ধরিল, সেবারেও কিছুই লিখিতে পারিল না। একজন বলিল, 'এটা কি হইল? লোকে বলে, মদ খাইলে কবি হয়, ফকিরও বলিয়াছে, সিরাজী সরাপ খাইয়া হাফেজ কবিতা লিখিতেন, আমরা তবে পারিতেছি না কেন?' দ্বাদশ জনের মধ্যে একজন কিছু বেশী বুদ্ধিমান ছিল, মাথা উঁচু করিয়া সেই বুদ্ধিমান বলিল, 'তবে বোধ হয় আরও বেশী খাইত; আমরাও বেশী খাইব।' পরামর্শ মঞ্জুর। এক ডজন সিরাজী সাবাড় হইয়া গেল, আর এক ডজন আসিল; তাহার অর্দ্ধেক সাবাড় হইবার পর চেয়ার উল্টাইয়া বারোজনেই জাজীমের উপর গড়াগড়ি। কাহারও কাহারও বমি, কাহারও কাহারও বাকরোধ, কাহারও কাহারও চৈতন্যলোপ। তাহাদের কবি হওয়ার সাধ ফুরাইল! সিরাজীর জয় হইল!

ভাই। (হাসিয়া হাসিয়া মুখ রাঙ্গা করিয়া সকৌতুকে) সিরাজীর জয় হইল! হইবারই ত কথা! জিনিষের দুই শক্তি;

এক শক্তিতে বুদ্ধির তেজ বাড়ায়, এক শক্তিতে বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ করে। যাঁহারা স্বভাব-কবি, সুরাদেবী তাঁহাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হন, যাহারা গোঁয়ার, কষ্ট করিয়া কবিতা লিখিতে চায়, দেবী তখন দানবী হইয়া তাহাদের মুণ্ডে মুদ্গর প্রহার করেন। এই গল্পটী আমি জানিতাম না, কিন্তু জিনিষের গুণের কথা আমার জানা ছিল, আপনিও জানেন। দোষ গুণ বিবেচনা না করিয়া, কোন লোকের অথবা কোন জিনিষের নিন্দা যাহারা করে, তাহারা সংসারের কোন তত্ত্বই জানে না।

চন্দ্র। হাঁ, সেটাত সত্য কথাই বটে! তোমার ফটিকচাঁদ মদ খায়, কবি হইবার জন্য খায় না, অন্য মৎলবে খায়। হাঁ, তুমি বলিতেছিলে, ফটিকচাঁদ কল্য আইসে নাই, আজও আসিল না;—কেন আসিল না?—আমাকে তুমি পত্র লিখিয়াছিলে, সেটা কি ফটিকচাঁদ জানে? কাহারো মুখে শুনিয়াছে কি?

ডাই। কিছুই জানে না। শুনিবেই বা কাহার মুখে? যে ছেলেটী পত্রখানি আপনাকে দিয়া আসিয়াছিল, সেটী আমার ভাই; ভারি চালাক; তাহার মুখে কেহই কিছু শুনিতে পাইবে না।

চন্দ্র। (যেন কিছু অন্যমনস্ক হইয়া) আচ্ছা, ফটিকচাঁদ মদ খায়, তাহা তুমি জান, কিন্তু এখানে—তোমার এই ঘরে কখন কি কিছু খাইয়াছে?

ডাই। (অধোবদনে নীরব)।

চন্দ্র। ওকি! মৌন কেন? কথা কও? লজ্জা কি? ব্রাহ্মধর্ম্মের বিধানমতে তুমি আমার ভগ্নী, আমি তোমার ভ্রাতা, আমার কাছে লজ্জা কি? তোমাকে মৌনবতী দেখিয়াই, আমি

বুঝিতে পারিয়াছি, আমার প্রশ্নের সদুত্তর হইয়াছে, মৌনই অনুকূল উত্তর দিয়াছে; তথাপি তোমার মুখে একবার শুনিতে চাই।

ডাই। (ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া ঈষৎ হাসিয়া মৃদুস্বরে) মাঝে মাঝে খায়।

চন্দ্র। (কিয়ৎক্ষণ মৌন থাকিয়া) তবে তোমার ঘরে ও সব জিনিষ থাকে?

ডাই। (মৃদু হাসিয়া) কেন?—আপনার কি কিছু—

চন্দ্র। জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম। আমার ততটা স্পৃহা—

ডাই। (আসন হইতে উঠিয়া মৃদু হাসিয়া) অভাব হইবে না;—ভ্রাতা ভগ্নী সম্বন্ধ হইলেও আজ আপনি নূতন, ব্যবহার মতে আজ আপনি আমার অতিথি;—অতিথি-সৎকার করা গৃহস্থের ধর্ম্ম; হিন্দুশাস্ত্রে লেখা আছে, কুন্তীপুত্র কর্ণ অতিথি-সেবার জন্য সস্ত্রীক স্বহস্তে করাত দিয়া নিজ পুত্রের মাথা কাটিয়াছিল। হিন্দুশাস্ত্র মিথ্যা হইলেও অতিথিসেবাগুণ আমি স্বীকার করি। (আলমারী হইতে শিশি, গেলাস, ডিক্যাণ্টার ও একটা বেদানা (দাড়িম্ব) বাহির করিয়া আনিয়া টেবিলে রাখিয়া পুনরায় উপবেশন পূর্ব্বক) আসুন, ইচ্ছা করুন।

চন্দ্র। (আহ্লাদ গোপন করিয়া গম্ভীর বদনে) একটা গেলাস?—একটা ডালিম?

ডাই। (মৃদু হাসিয়া) অতিথিসেবায় একটাই ভাল।

চন্দ্র। অতিথির যাহা ইচ্ছা তাহা পূর্ণ করাই অতিথিসেবার নিয়ম।

ডাই। (সতৃষ্ণনয়নে অতিথির নয়ন নিরীক্ষণ করিয়া)

অতিথির যদি তাহাই ইচ্ছা হয়, তবে যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইতে—

চন্দ্র। (আহ্লাদে) বহুৎ আচ্ছা। (স্বহস্তে পাত্র পূর্ণ করিয়া জল মিশাইয়া) শক্তি বিদ্যমানে অগ্রে গ্রহণ করা আইন-নিষিদ্ধ—এটিকেটবিরুদ্ধ। (শক্তির হস্তে পাত্র প্রদান)

ডাই। (পাত্র চুম্বন করিয়া অতিথিহস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক) আইন পালন করা হইয়াছে, এইবার অতিথি-সেবা।

চন্দ্র। (মদ্য পান করিয়া) অতিথি-সেবার অনেক অঙ্গ।

ডাই। (বেদানা ছাড়াইতে ছাড়াইতে নতমুখে) গরিবের ঘরে সব সময় সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ হয় না।

চন্দ্র। (ঘড়ি খুলিয়া দেখিয়া) রাত্রি এখন অধিক হয় নাই, ফটিকচাঁদ হয়ত আসিলেও আসিতে পারে, যদি আইসে তখন তুমি কি করিবে?

ডাই। বলিব, আজ আর বিদ্যাশিক্ষা হইবে না। "গুণ হয়ে দোষ হলো বিদ্যায় বিদ্যায়।"

চন্দ্র। (হাস্য করিয়া) ধূলা পায়েই বিদায় হইবে?

ডাই। (পুনরায় পাত্র পূর্ণ করিয়া) আসৃতে আজ্ঞা হয়! বিদায় হইলেই মঙ্গল।

চন্দ্র। (ফুল্লবদনে পাত্র গ্রহণ করিয়া একনিশ্বাসে সমাপ্ত করিয়া) রূপবতী যুবতী স্বর্গের সামগ্রী,—সামগ্রীর ওষ্ঠাগ্রে অমৃতধারা।

ডাই। যাহারা স্বর্গে থাকে, তাহারাই অমৃতপানে অধিকারী।

চন্দ্র। আমি ত আজ স্বর্গে আসিয়াছি।

ভাই। (তৃতীয়বার পাত্র পূর্ণ করিয়া আস্বাদন পূর্ব্বক অতিথিহস্তে প্রদান করিয়া) দরিদ্রের কুটিরকে স্বর্গ আখ্যা দেওয়া, সেটা আপনার অনুগ্রহ!

চন্দ্র। (মদ্য পান করিয়া দাড়িম্ব ভক্ষণ করিতে করিতে) যেখানে জগন্নাথের উপাসনা হয়, সেইখানেই স্বর্গ।

ভাই। উৎকলে বিকলাঙ্গ জগন্নাথের পূজা হয়, সেটাও কি তবে স্বর্গ?

চন্দ্র। কতক পরিমাণে বটে। সব একাকার—সব একাকার! সেই অংশটীর সঙ্গে আমাদের ধর্ম্মের মিল আছে। এখন কথা হইতেছে যে, রূপবতীর মহিমা। যাঁহারা রূপবতীর রূপসাগরে সাঁতার দেন, তাঁহারা ভাগ্যবান, যাঁহারা রূপ-সাগরে ডুবিয়া যান, তাঁহারা পরম ভাগ্যবান।

ভাই। (ভাবার্থ বুঝিয়া ঈষৎ লজ্জাবনত বদনে) আপনি জমিদার, লোকে বরং আপনার খোসামোদ করে, কৌশলে আপনি আমার খোসামোদ করিতেছেন, আমার লজ্জা হইতেছে।

চন্দ্র। লজ্জা!—ভাই ভগ্নী সম্পর্কে ঘৃণাকর লজ্জাটী কি স্থান পায়? (সুন্দরীর মুখপানে সানুরাগ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে করিতে শশব্যস্তে আসন হইতে উঠিয়া সুন্দরীর পার্শ্বে গিয়া সাদরে কণ্ঠবেষ্টন পূর্ব্বক) ভগ্নি!—আদরিণী ভগ্নি! আজ তবে আমি বিদায় হই। ভাই-ভগ্নীতে বিদায়কালে যেরূপ মঙ্গল আচরণ করিতে হয়, স্বস্তি বাচনে তাহাই আমার প্রার্থনা।

ভাই। (কৃত্রিম লজ্জায় অতিথির হাত ছাড়াইবার ভঙ্গীতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ওকি কথা? ওকি করেন? ছাড়ুন, আমি—

চন্দ্র। ভাই-ভগ্নীতে মধুর চুম্বন, এটা হইতেছে নবীন সভ্যতার সুনীতি। (মুখের নিকট মুখ লইয়া গিয়া মধুর চুম্বন)

ডাই। (কৃত্রিম বিরক্তিতে তিরস্কার করিয়া) ছিঃ! আপনি ভারি নির্লজ্জ!

চন্দ্র। বটে! তবে আমায় বসিতে হইল। (উপবেশন করিয়া) ভগ্নি! তোমার বিবাহ হইয়াছে?—লক্ষণ দেখিয়া বোধ হইতেছে, এখনো তুমি কুমারী, সীমন্তে সিন্দূর-বিন্দু নাই।

ডাই। বিবাহ হইলেও সিন্দূর-বিন্দু থাকিত না, সিন্দূর আমরা মানি না। যাহা আপনি অনুমান করিয়াছেন, তাহা কিন্তু সত্য। সত্যই আমার বিবাহ হয় নাই। বিবাহের মর্ম্মটা বুঝিতে আমি পারি না, সেই জন্য বিবাহ করিতে ইচ্ছা হয় না।

চন্দ্র। মর্ম্ম বুঝিতে পার না? আচ্ছা, আর একদিন বুঝাইব। আজ আমি আসি, রাত্রে আর একটু কাজ আছে।

ডাই। দেখিবেন, স্মরণ রাখিবেন, ভুলিবেন না, অনুগ্রহ যেন থাকে। আমার একান্ত আশা—নিত্য নিত্য এক একবার দর্শন পাই।

চন্দ্র। ওঃ! তুমি কি ভুলিবার সামগ্রী? অবকাশ পাইলেই আমি আসিব। (উঠিয়া নিকটে গিয়া পুনরায় কণ্ঠ-বেষ্টন পূর্ব্বক চুম্বন করিয়া প্রস্থান)।

নবম কল্প।

নবীন প্রেম।

বৎসরের সকল ঋতুতে সকল দিন সকল মেঘে বৃষ্টি হয় না। কোন কোন মেঘ বাতাসে উড়িয়া যায়, কোন কোন মেঘে কোন কোন স্থানে অল্প অল্প বিন্দুপাত, কোন কোন মেঘে কোন কোন স্থান জলপ্লাবিত হয়। মেঘের প্রখর তেজ নাই, ধূম্র বাষ্পের সংযোগে মেঘের উৎপত্তি; অথচ সেই মেঘের এত পরাক্রম যে, প্রচণ্ড সূর্য্যতেজ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, পূর্ণিমা রজনীতে পূর্ণচন্দ্রের কিরণ ঢাকিয়া দেয়। মেঘের কার্য্য যেমন ঠিক ঠিক নির্ণয় করা যায় না, সংসারে মানবের ভাগ্যচক্রের গতিও সেইরূপ দুর্ব্বোধ্য। লোক যেমন বৃষ্টির জন্য হাহাকার করে, আকাশে মেঘোদয় দেখিলে কৃষকের যেমন আশা হয়, শীঘ্রই বৃষ্টি হইবে; সেই মেঘ উড়িয়া গেলে কৃষকের হৃদয় যেমন নিরাশা-অন্ধকারে আবৃত হয়, সংসারে সংসারী মানুষের আশাও সেইরূপ আনন্দ-বিষাদে পরিণত হইয়া থাকে; অথচ আশা না থাকিলে মানুষ বাঁচে না।

আমাদের এই আখ্যায়িকায় নায়ক-নায়িকা, সখা-নায়ক, সখি-নায়িকা, আনুষঙ্গিক অন্যান্য স্ত্রী-পুরুষ কত সময়ে কত প্রকার আশা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের আশার কি প্রকার ফল হইয়াছে, ক্রমে ক্রমে আমরা তাহা দেখাইব।

হরকান্ত বাবু আশা করিয়াছিলেন, তাঁহার ধর্ম্মের সংসার চিরদিন উজ্জ্বল থাকিবে; সূর্য্যকান্ত বাবু আশা করিয়াছিলেন,

সুখময় ভ্রাতৃভাব চিরদিন সমান থাকিবে, ধনসম্পত্তিও অক্ষুণ্ণ থাকিবে; উমানাথ, জটাধারী প্রভৃতি দুষ্টলোকেরা আশা করিয়াছিল, হরকান্তের ধর্ম্মের সংসারটী মাটি করিয়া দিয়া আপনারা সকল বিষয়ে প্রভুত্ব করিবে; রাধারাণী আশা করিয়াছিলেন, হরকান্তের দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী হইয়া পতীর দৃষ্টান্তে স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে সুখী হইয়া থাকিবেন; নববাসন্তী আশা করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয়ে ইচ্ছামত সুখ উপভোগ করিতে পারিবেন; কোন্ পক্ষের আশার কি প্রকার ফল, পাঠক মহাশয় অল্পে অল্পে তাহা দেখিতেছেন। কাহিনী যতই অগ্রসর হইবে, ক্রমে ক্রমে ততই আরো উজ্জ্বল উজ্জ্বল প্রমাণ দেখিতে পাইবেন।

সোমবারের রজনী প্রভাত হইয়াছে, নববাসন্তী ওরফে ডাইমনকুমারী দিবা-কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া অপরাহ্ণে বৈঠকখানায় আসিয়া বসিয়াছেন; কত কথাই মনে হইতেছে, কত প্রকার আশার সঞ্চার হইতেছে, কত প্রকার সন্দেহ মনে আসিতেছে, তাহা তিনি ভিন্ন অন্যে জানিবার সম্ভাবনা নাই; রমণী-হৃদয়ের গুহ্যভাব একান্তই দুর্ভেদ্য। যতই বেলা যাইতেছে, ডাইমন্‌কুমারী ততই অন্যমনস্ক হইতেছেন। একবার উঠিয়া দর্পণে মুখ দেখিলেন, আপনা-আপনি হাসিলেন, সুবাসিত রুমালে মুখখানি মার্জ্জন করিয়া আবার চেয়ারে গিয়া বসিলেন। পুস্তক খুলিলেন না, হারমোনিয়ম খুলিলেন না, ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা ভাবিলেন না, মন অন্যদিকে। কে কখন আসিবেন, তাহারই প্রতীক্ষায় ঘন ঘন দ্বারের দিকে চাহিতে লাগিলেন। দুইজনের আসিবার সম্ভাবনা; ফটিকচাঁদ আর নূতন বাবু। উভয়ের মধ্যে কে অগ্রে আসিবেন, কতক ভয়ে, কতক

সন্দেহে, কতক আনন্দে, কতক আশ্বাসে, অন্তরে কেবল সেই চিন্তা।

সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন, অল্পে অল্পে অন্ধকার দেখা দিল, বৈঠকখানায় আলো জ্বলিল, কেহই আসিলেন না। ডাইমনকুমারী উন্মনা। সংশয়ের আগুন অতিশয় কষ্টপ্রদ; সে আগুনে অঙ্গ দগ্ধ হয় না; কিন্তু স্তরে স্তরে অন্তর দগ্ধ হয়।

সিঁড়িতে মনুষ্যের পদশব্দ হইল, দুই মিনিটের মধ্যে একটী লোক গৃহ সমীপে দর্শন দিলেন। কে?—চন্দ্রকান্ত বাবু।

ডাইমনকুমারী উঠিয়া সানন্দে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন, হস্তধারণপূর্ব্বক গৃহমধ্যে আনিয়া যোগ্য আসনে বসাইলেন, নিজেও পার্শ্বাসনে বসিলেন,—সতৃষ্ণনয়নে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল উভয়েই নীরব।

চন্দ্রকান্তবাবুর মুখখানি কিছু গম্ভীর, ক্ষণে ক্ষণে কিছু বিষণ্ণ, ক্ষণে ক্ষণে কিছু প্রফুল্ল। অগ্রে কি কথা তিনি বলিবেন, তাহাই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন;—ভাবিয়া ভাবিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফটিকচাঁদ আইসে নাই?"

চমকিতা হইয়া ডাইমনকুমারী বলিলেন, "অগ্রেই এ প্রশ্ন কেন?"

চন্দ্র। নিত্য নিত্য আইসে, রবি, সোম দুইদিন আইসে নাই, আজ মঙ্গলবার, আজিও কি আসিবে না?

ডাই। আপনার প্রশ্নের মর্ম্ম আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

চন্দ্র। হাঁ, মর্ম্ম কিছু গুরুতর বটে। গুরুতর না হোক জটিল বটে।

ডাই। (সন্দিগ্ধমনে) কি রকম জটিল?

চন্দ্র। সেটা তোমার শুনিয়া কাজ নাই।

ডাই। (আরো সন্দেহে) বলিতেছেন জটিল, অথচ বলিতেছেন শুনিয়া কাজ নাই, ইহার অর্থ কি? কেন আমাকে সংশয়ের আগুনে দগ্ধ করেন? আপনি আসিলেন, দুই দণ্ড আনন্দ করিব, তাহা না হইয়া আপনি আমাকে অকারণে ভাবনার হ্রদে ডুবাইতেছেন; আমি বড় কষ্ট পাইতেছি। স্পষ্ট করিয়া বলুন, হইয়াছে কি? আপনার প্রশ্নের মর্ম্মটা কি?—কি কারণে জটিল? ফটিকচাঁদের সংবাদ কি আপনি কিছু জানেন?

চন্দ্র। (কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিয়া) ফটিকচাঁদ বোধ হয় আসিতে পারিবে না।

ডাই। নাই বা পারিল, তাহাতে কি? তাহার জন্য কি আপনি আমাকে উদ্বিগ্ন দেখিতেছেন?—না না—ও কথা নয়, আপনার মনে আরো কি আছে। আপনার বদন ওরূপ উদ্বেগপূর্ণ কেন? ফটিকচাঁদ আসিবে না, ইহা আপনি কিরূপে জানিলেন? আজ কি তাহার সঙ্গে আপনার দেখা হইয়াছিল?

চন্দ্র। দেখা হয় নাই, চার পাঁচদিন আমার সঙ্গে দেখা করে নাই; কিন্তু আজ প্রাতঃকালে—

ডাই। (সন্দিগ্ধনয়নে চাহিয়া) থামিলেন কেন? আজ প্রাতঃকালে কি? ফটিকচাঁদের কি কোন প্রকার পীড়া হইয়াছে?

চন্দ্র। (আরও একটু ভাবিয়া) এক রকম তাহাই বটে।

ডাই (সচকিতে) এক রকম, কি রকম?

চন্দ্র। রকম মন্দ নয়। মস্ত পীড়া।

ডাই। সত্যই আপনার কথাগুলি আজ ভারি জটিল। যাহা হইয়াছে, খুলিয়া বলুন?

চন্দ্র। খুলিয়া?—কি ইহার খুলিব? যাহা খুলিবার, পুলিসেই তাহা—

ডাই। (চমকিতা হইয়া) পুলিসে?—এ কি কথা?—ফটিকচাঁদ কি পুলিসে গিয়াছিল?

চন্দ্র। নিজে যায় নাই—ইচ্ছা করিয়া যায় নাই,—পেয়াদারা তাহাকে জোর করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

ডাই। (কতকটা ভাবার্থ বুঝিতে পারিয়া সকৌতুহলে) কেন? হইয়াছিল কি?

চন্দ্র। ছোটখাটো মল্লযুদ্ধ!—শনিবার রাত্রে ফটিকচাঁদ মাতাল হইয়া ফ্রিস্কুল ষ্ট্রীটের নহবতখানার নিকটে চিৎপাত হইয়া পড়িয়া ছিল, রাত্রি তখন প্রায় দুই প্রহর;—সেই অবস্থায় দুইজন পাহারাওয়ালা তাহাকে ধরে, তুলিয়া দাঁড় করায়,—মাতালের তখন অল্প অল্প জ্ঞান ছিল, নেশার জোরে গায়ে হয়ত একটু শক্তিও বাড়িয়াছিল, একটা পাহারাওয়ালার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিল; লাল পাগ্‌ড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল; বিলক্ষণ প্রহারও পাইয়াছিল; নেশার ঘোরে আর প্রহারের চোটে রাস্তার মাঝখানে বেহুঁস্ হইয়া পড়িয়াছিল, শেষকালে ঝোলা আনাইয়া পাহারাওয়ালা তাহাকে থানায় লইয়া গিয়াছিল।

ডাই। (বিস্মিতা হইয়া) উঃ! এত কাণ্ড?—তারপর?

চন্দ্র। তারপর আর কি? সমস্ত রাত্রি থানার গারদে খড়ের বিছানায় পড়িয়া ছিল, পাহারাওয়ালারা বিলক্ষণ গুঁতা-গাঁতা দিয়াছিল, ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল। পরদিন রবিবার, সে দিনটাও থানায় থাকিতে হইয়াছিল, দুটি দুটি শুষ্কচিঁড়া খাইতে পাইয়াছিল, রাত্রিকালে খড়ের বিছানায় গড়াগড়ি। সোমবার

(গত কল্য) লালবাজারে চালান হয়, ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বিচার।

ডাই। বিচারে কি হইল?

চন্দ্র। সেই কথাই ত বলিতেছিলাম। আজ প্রাতঃকালে পুলিসের একজন কনষ্টেবল আমার বৈঠকখানায় আসিয়া হাজির হয়। সে আসিয়া বলে, ফটিকচাঁদ গোস্বামী নামে আপনার কি কোন বন্ধু আছে?—"বন্ধু" কথাটা শুনিয়া আমি বিরক্ত হইলাম, নামটা কিন্তু স্মরণ ছিল? জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন? ওকথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? লোকটীকে আমার জানা আছে বটে, তাহার কি হইয়াছে? কনষ্টেবল উত্তর করিল, শনিবার রাত্রে মাতাল হয়ে রাস্তায় পড়েছিল, ঘাটির পাহারা-ওয়ালা তাহাকে ধরেছিল, মাতালটা হাঙ্গামা বাঁধিয়ে একজন পাহারাওয়ালাকে ঘুসি মেরেছিল, পাগ্‌ড়ি ছিনিয়ে নিয়েছিল, থানায় তাকে আটক কোরে রাখা হয়েছিল, কাল্‌কে পুলিসে তাহার বিচার হয়ে গেছে, পাহারাওয়ালাকে মারপিট করার অপরাধে দশ টাকা জরিমানা হয়েছে, জরিমানা দিতে না পার্‌লে দু-হপ্তা কয়েদ থাক্‌বার হুকুম। মাতালটা জরিমানা দিতে পারে নাই, হাজতে আছে; জমাদারের কাছে বলেছে, আপনি তার বন্ধুলোক, আপনি টাকা দিবেন। তাই শুনে জমাদার আমাকে আপনার ঠিকানা বলে দিয়ে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। কাল সন্ধ্যাকালে আমি এখানে এসেছিলাম, আপনি বাড়ী ছিলেন না, সেইজন্য আজ আবার এসেছি। জরিমানার দশ টাকা আর আমার বক্‌সিস এক টাকা, এই এগার টাকা আপনি দিবেন কি? কথাগুলো শুনিয়া আমার বড় ঘৃণা হইয়াছিল। বৈঠকখানায়

তখন আর কেহ ছিল না, তাহাতেই একটু মান বাঁচিয়া গিয়াছে।

ডাই। আপনি কি করিলেন?

চন্দ্র। ভাবিয়াছিলাম, অস্বীকার করিয়া পাহারাওয়ালাকে বিদায় করিয়া দিব; তারপর মনে হইল, লোকটা তোমার পণ্ডিত, তোমার সঙ্গে আমার নূতন আলাপ, পণ্ডিতটী দুই হপ্তা জেল খাটিবে, শুনিলে তুমি হয়ত কষ্ট পাইবে, তোমার খাতিরেই এগার টাকা ফেলিয়া দিয়া তাহাকে আমি বিদায় করিয়াছি। কল্য সন্ধ্যার পর তোমার কাছেই আমি আসিয়াছিলাম, সেই জন্যই পাহারাওয়ালা আমাকে বাড়ীতে দেখিতে পায় নাই।

ডাই। টাকা আপনি কেন দিলেন? মাতালকে খালাস করিতে আছে কি? জেল খাটিত, ফলভোগ করিত, তাহা হইলেই ভাল হইত।

চন্দ্র। (হাস্য করিয়া) পণ্ডিতের প্রতি তোমার এমন ভাব, সেটা আমি জানিতাম না, তোমার খাতিরেই টাকা দিতে আমার মন হইয়াছিল।

ডাই। কর্ম্মটা ভাল হয় নাই। দুষ্ট লোকের সাজা হওয়াই ভাল। মদ খাওয়াটা তত দোষ নহে, মাতাল হওয়াটা ভারি দোষ, পুলিসের সহিত হাঙ্গামা করা আরও বেশী দোষ।

চন্দ্র। (কি একটু ভাবিয়া) আচ্ছা, জরিমানার টাকা দিতে পারে এমন সম্বল কি তাহার নাই?

ডাই। কি জানি? আমার কাছে বলে তো, সমাজে কুড়ি টাকা মাহিনা পায়, আমাদের বাড়ীতেও মাসে পাঁচ টাকা মাহিনা পায়। সমাজের মাহিনাটা বোধ হয় মিথ্যা কথা।

চন্দ্র। (চিন্তা করিয়া) তবে বোধ হয়, পণ্ডিতটী তোমার গেল। সে আর এখানে আসিতে পারিবে না, (আবার কি ভাবিয়া) আসিলেও আসিতে পারে। তোমার সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছে, জরিমানার টাকা আমি দিয়াছি, তুমি সেটা জানিতে পারিবে না, ইহা মনে করিয়া নির্ভয়ে আসিলেও আসিতে পারে।

ডাই। না আসাই মঙ্গল। সে-রকম লোককে পণ্ডিত বলিতে আমার ঘৃণা হইবে। আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ রাখিবেন, দয়া করিয়া আমাকে শিক্ষা দিবেন; তাহা হইলেই তাহাকে আমি দূর করিব।

চন্দ্র। (আনন্দভাব গুপ্ত রাখিয়া) লোকের অন্ন মারিতে আমার ইচ্ছা নাই। শিক্ষা আমি তোমাকে দিতে পারি কিন্তু—

ডাই। ক্ষমা করুন, কিন্তু রাখিবেন না। তাহাকে আর আমি আসিতে দিব না। সে সব কথা ছাড়িয়া দিন, পুলিসের হাতে প্রহার পাইয়াছে, হাজতে বাস করিয়াছে, পুলিসে নিজের নাম প্রকাশ করিয়া চলাচলি করিয়াছে, জরিমানা দিয়াছে। খবরের কাগজেও হয়ত রিপোর্ট ছাপা হইবে; তাহার মুখ দেখিলে আমার পাপ হইবে। আমার বড় আহ্লাদ হইল। এখন আসুন, একটু আমোদ করা যাউক। (শিশি, গেলাস, বেদানা, পেস্তার আবির্ভাব, উভয়ের সুধাপান, আনন্দে হাস্যতরঙ্গে নবীন ক্রীড়া)

চন্দ্র। (হাস্য করিতে করিতে হঠাৎ গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া) আচ্ছা ভাই—না না,—আচ্ছা ভগ্নি! সত্যই কি তোমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা হয় না?

ডাই। (প্রশান্তবদনে) না ভাই, বিবাহে আমার ইচ্ছা হয় না। যে রকম দেখা যায়, তাহাতেই বিবাহের নামে আমার ঘৃণা। বিবাহের পর স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের দাসী হয়, কোন কার্য্যে স্বাধীনতা থাকে না। আমি কাহারও দাসী হইতে পারিব না, স্বাধীনতা হারাইব না।

চন্দ্র। ব্যবহারটা বড় দোষের বটে, কিন্তু অসভ্য লোকেরাই সেইরূপ ব্যবহার বাড়াইয়া দিয়াছে, অসভ্য হিন্দুদের মধ্যেই স্ত্রীজাতির ঐরূপ অপমান। যাহারা আমাদের মত সভ্য হইয়াছে, যাহারা পরম পুরুষের আশ্রয় লইয়াছে, তাদৃশ পুরুষেরা নারীগণের প্রতি কদাচ সেরূপ জঘন্য ব্যবহার করে না। তুমি যখন সমাজে যাও, তখন অবশুই জান, অবশুই দেখিয়া থাকিবে, আমাদের ব্রাহ্মভ্রাতারা নারীগণকে কত আদর করে, কত স্বাধীনতা দেয়, কত গৌরব বাড়ায়। বলিতে গেলে, ঘরে ঘরে পূজা করিয়া মাথায় রাখে। তুমি যদি একজন ব্রহ্মভ্রাতাকে বিবাহ কর, তাহা হইলে সেইরূপ আদর পাইবে, সেইরূপ পূজা পাইবে, সেইরূপ স্বাধীনতা পাইবে।

ডাই। (একদৃষ্টে বক্তার মুখপানে চাহিয়া সন্দেহক্রমে) আমার বিবাহের জন্য আপনার এত আগ্রহ কেন?

চন্দ্র। (ওষ্ঠ লেহন করিতে করিতে) আদরিণী ভগ্নি! আমার মুখে ও প্রশ্নের উত্তর শুনিতে চাও, তবে দয়া করিয়া একপাত্র সুধা—

ডাই। (তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা পালন করিয়া চকিত স্বরে) সুধার কি উত্তর দিবার শক্তি আছে?

চন্দ্র। (মদ্য পান করিয়া) বিলক্ষণ শক্তি। এই দেখ না,

এই সুধামুখীর মুখের উপর আমার গর্ভস্থ সুধা কেমন সুন্দর উত্তর দান করে। তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, তোমার বিবাহের জন্য আমার এত আগ্রহ কেন? আমার আগ্রহের কারণ এই যে, আমার অধিকারে ভাল ভাল ব্রাহ্ম ভ্রাতা আছে, তাহাদের মধ্যে একজন তোমার মত সুন্দরী পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র হইবার যোগ্য। যদি আজ্ঞা কর, একটী আমি শীঘ্র যোগাড় করিয়া দিতে পারি।

ডাই। (হাস্য করিয়া) আপনি কি ঘটক না কি?

চন্দ্র। (হাস্য করিয়া) দেখ ভগ্নি, তোমার উপকারের জন্য সব রকম আমি হইতে পারি। ঘটক হইতে পারি, ভাট হইতে পারি, পুরোহিত হইতে পারি, আচার্য্য হইতে পারি, সব পারি।

ডাই। (চিন্তা করিতে করিতে অন্যমনস্কভাবে এক পাত্র সুধা পান করিয়া, নায়কের হস্তে প্রসাদ দিয়া, ঈষৎ হাসিয়া) পারেন? আমার কিন্তু অন্য বরে প্রাণ সমর্পণ করিতে ইচ্ছা হয় না। ঘটক, পুরোহিত, ভাট, আচার্য্য সব আপনি হইতে পারেন, কিন্তু বর হইতে পারেন না কি? লজ্জা যদি বাধা না দিত, তাহা হইলে বলিতে পারিতাম, এই ঘটক ঠাকুরটীর মতন বরটী হইলে—

চন্দ্র। (সুধা পান করিয়া হাস্য করিয়া) ঘটকের মত বর হইলে মনের মিলন হয়? যদি হয়, তবে তাহাই কেন হউক না?

ডাই। (অধোবদনে মৃদুকণ্ঠে) শুনিয়াছি, আপনার পরিণীতা পত্নী আছে। সভ্যতার রাজ্যে এক পত্নী বিদ্যমানে পুরুষের অন্য পত্নী গ্রহণ করা নিষিদ্ধ।

চন্দ্র। (চেয়ারের পৃষ্ঠে একটু হেলিয়া পড়িয়া) ডাইভোর্স করিব।

ডাই। কি অপরাধে?

চন্দ্র। অপরাধ?—নানা অপরাধ।—লিখিতে পড়িতে জানে না, হারমোনিয়ম বাজাইতে জানে না, বিবি সাজিতে জানে না, মধুর মধুর গীত গাহিতে জানে না।

ডাই। সে আপরাধে কি ডাইভোর্স হয়?

চন্দ্র। হয় না তাহা জানি; তুমি যদি দয়া কর, তবে যে অপরাধে ডাইভোর্স হইতে পারে, সেই অপরাধ খাড়া করিয়া লইব;—ব্যভিচার সপ্রমাণ করিয়া দিব। একটু একটু আভাসও পাইয়াছি। আমার একটা মুহুরী আছে, তাহাকে আমি মধ্যে মধ্যে আমার শয়নঘরে দেখিতে পাই।

ডাই। পান্?—একশয্যায় শয়ন করিতে দেখিতে পান?

চন্দ্র। একটু চেষ্টা করিলেই ধরা যায়। একান্তই যদি ধরিতে না পারি, কবি হইব;—কবিদের অসাধ্য কিছুই নাই; কবি হইয়া নারীর ব্যভিচার কল্পনা করিয়া লইব। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, এই ত্রিলোক কবি-কল্পনার বশীভূত।

ডাই। (চিন্তা করিয়া) কল্পনা কৃপা করিলে আপনি সিদ্ধ-কাম হইতে পারেন, কিন্তু এ দেশে ত ডাইভোর্সের আইন নাই।

চন্দ্র। অসভ্য হিন্দুদের মধ্যে নাই। যাহারা সভ্য, তাহাদের মধ্যে সে আইনের জোর বেশ আছে। মুসলমানের মধ্যেও আছে; মুসলমানেরা ডাইভোর্সকে "তালাক" দেওয়া বলে। আমরা ব্রহ্মজ্ঞানী, আমরা কি "তালাক" দিতে অক্ষম হইব?

সাহেবের কাছে দরখাস্ত করিয়া ডাইভোর্সের আইন পাশ করাইয়া লইব।

ডাই। ওঃ!—ভবিষ্যতের কথা।—দরখাস্ত করিবেন, পাশ করাইবেন, তাহার পর কার্য্য হইবে। অনেক দূরের কথা। ততদিনে আমরা যৌবনের সীমা ছাড়াইয়া সমাধি যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত হইব।

চন্দ্র। আগে ত দরখাস্ত করিয়া রাখি; সাহেব লোকেরা সর্ব্বপ্রধান সভ্য, ভারতের যথার্থ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। সতীদাহ উঠাইয়াছেন, বিধবা বিবাহে মঞ্জুরি দিয়াছেন, গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ নিবারণ করিয়াছেন, বহু বিবাহ নিবারণের সহায় হইয়াছেন, আমাদের দরখাস্ত অবশ্যই মঞ্জুর হইবে। ব্রাহ্ম ভ্রাতাদের মঙ্গলের জন্য ডাইভোর্স আইন নিশ্চয়ই পাশ হইবে। যতদিন না হয়, ততদিনের মধ্যে আমরা যদি ঘরে ঘরে সেই প্রথা চালাই, তাহা হইলেই বা কে আমাদিগকে ধরিয়া ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইবে? (চেয়ার হইতে উঠিয়া সুন্দরীর নিকটে গিয়া বাহুপাশে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সানুরাগে ঘন ঘন চুম্বন)

ডাইমন্‌কুমারী মধুর হাস্যপূর্ণ আরক্ত বদনে সেই সোহাগের পরিশোধ দিবার উপক্রম করিতেছিলেন, হঠাৎ ভিতর মহলে খট্ খট্ করিয়া খড়মের শব্দ হইল;—শব্দ যেন বৈঠকখানার দিকে আসিতেছে, এইরূপ অনুমান। ডাইমন্‌কুমারী তৎক্ষণাৎ হস্ত-নেত্র-সঙ্কেতে চন্দ্রকান্তকে সরাইয়া দিয়া, বসনাঞ্চলে কপোল মার্জ্জন পূর্ব্বক শিথিল গাত্র বসন ও ললাটের বিশৃঙ্খল কেশগুচ্ছ ক্ষিপ্রহস্তে যথাযথ বিন্যস্ত করিয়া, দিব্য শান্ত হইয়া বসিলেন; হস্তে একখানি সংগীত পুস্তক; দৃষ্টি সেই

পুস্তকের অক্ষরের দিকে, কর্ণ সেই খড়মের শব্দের দিকে। চন্দ্রকান্তও শীঘ্র শীঘ্র নিজাসনে উপবেশন পূর্ব্বক একখানি ভগবদ্গীতা খুলিয়া ফেলিলেন; যেন কতই ভক্তি পূর্ব্বক মনো-নিবেশ করিয়া গীতাখানি তিনি দেখিতেছেন; বাহ্য লক্ষণ এই প্রকার।

রূপাবাঁধা হুঁকাতে আম্রপত্রের দীর্ঘ নল লাগাইয়া তামাক খাইতে খাইতে একটি লোক সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বেশ গৌরবর্ণ, মস্তকে অর্দ্ধপক্ক কেশ, মুখে অর্দ্ধপক্ক গোঁপ দাড়ী, চক্ষে সবুজ চস্‌মা; বয়স অনুমান পঞ্চান্ন বৎসর।

লোকটী কে?—ভজহরি ভট্টাচার্য্য;—ডাইমনকুমারীর জন্ম-দাতা পিতা। চস্‌মাবৃত নয়নে গৃহের ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ডাইমনকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাসন্তি! আজ তোমার পণ্ডিত আসেন নাই?"

বাসন্তী উত্তর করিলেন, "আজ তিন দিন অনুপস্থিত।"

ভজহরি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কারণ?—মাঝে মাঝে এক আধদিন কামাই হয় তা জানি, কিন্তু একেবারে তিন দিন?"

বাসন্তী উত্তর করিলেন, "সকল খবর আপনি রাখেন না, বেজায় কামাই। আরও আমি শুন্‌তে পাচ্ছি, পণ্ডিতটীর স্বভাবে কিছু কিছু দোষ ধরেছে। আজ আমি মনে কচ্ছিলেম, আপনার অনুমতি নিয়ে, ভবিষ্যতে তাকে এখানে আস্‌তে বারণ কোরে দেব।"

চস্‌মা ঘুরাইয়া চন্দ্রকান্তের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধভাবে ভজহরি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বাবুটী কে?"

বাসন্তী বলিলেন, "আপনি বসুন; উত্তর দিচ্ছি।"

একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া চন্দ্রকান্তের দিকে চাহিতে চাহিতে ভজহরি বসিলেন। বাসন্তী বলিতে লাগিলেন, "বাবুটী একজন জমিদার, পল্লিগ্রামে নিবাস, সম্প্রতি কলিকাতায় এসেছেন, আমাদের এই গলির ভিতর দুইখানা বাড়ীর পরে ইহাঁর বাড়ী, ভাড়াটে বাড়ী নয়, নিজের বাড়ী। সেই বাড়ীতেই সপরিবারে বাস কচ্ছেন। বিদ্যাবাগীশের সঙ্গে বাবুর আলাপ হয়েছিল; তাঁর মুখে আমি শুনেছি, বাবুটী অতি সুশীল, অতি সচ্চরিত্র, পরম ধার্ম্মিক, আমাদেরই ব্রাহ্ম ভ্রাতা। বিদ্যাবাগীশকে জবাব দিলে এই বাবুর দ্বারা আমার ধর্ম্মশিক্ষার বিশেষ সুবিধা হবে। একদিনের আলাপেই এই ব্রাহ্ম ভ্রাতার বহু সদ্‌গুণের পরিচয় আমি পেয়েছি।"

আনন্দ প্রকাশ করিয়া ভজহরি বলিলেন, "ব্রাহ্ম ভ্রাতা? পরম সন্তুষ্ট হলেম, পরম আপ্যায়িত হলেম, ব্রাহ্ম ভ্রাতার আগমনে আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিলাম।"

কন্যার সহিত কথা কহিতে কহিতে চন্দ্রকান্তবাবুর দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "আপনি ব্রাহ্ম ভ্রাতা, দয়া কোরে আমার বাড়ীতে দর্শন দিয়াছেন, এটা আমার পরম সৌভাগ্য। যদি কার্য্য ক্ষতি না হয়, যখন ইচ্ছা হবে, তখনই আপনি এইখানে দর্শন দিবেন, কোন বাধা নাই, কোন সঙ্কোচ নাই, কোন সন্দেহ নাই, সর্ব্বদাই আপনি আস্‌বেন, আমার এই মেয়েটিকে সদুপদেশ দিবেন, একত্রে উভয়ে পরমব্রহ্মের পবিত্রবাক্য আলোচনা করবেন। আপনার নামটী কি?"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, "আমার নাম শ্রীচন্দ্রকান্ত রায়।"

ভজহরি বলিলেন, "বাঃ! চমৎকার নাম। যেমন রাজ-

পুত্রের মতন চেহারা, নামটিও তেমনি সুন্দর, সদ্বংশে জন্ম, সৎশিক্ষায় পণ্ডিত, নিত্যধর্ম্মে দীক্ষিত ; না হবে কেন ? আপনি আমার কন্যাটীকে নিত্য নিত্য ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করলে আমার পরমানন্দ লাভ হবে। আপনার হস্তে ওখানি কি পুস্তক ?”

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, “আজ্ঞে—ভগবদ্গীতা।”

শীঘ্র আসন হইতে উঠিয়া মুখের নিকট হইতে হুঁকাটী নামাইয়া, ভজহরি ভট্টাচার্য্য ত্বরিত-স্বরে বলিলেন, “বেশ—বেশ ! পড় বাবা ! গীতা পাঠে বাধা দেওয়া আমার অনুচিত হয়েছে ; এমন জান্‌লে এখানে আমি বেশীক্ষণ থাকতেম না। থাক্ তোমরা, ভগবদ্গীতা পাঠ কর, আনন্দ কর—আনন্দ কর ! এখন আমি চল্লেম, তোমাদের মঙ্গল হোক্। ধন্য জগদীশ ! স্বস্তি—স্বস্তি—স্বস্তি।

খট্ খট্ করিয়া খড়মের শব্দ করিতে করিতে হুঁকাটী হস্তে লইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় অন্দরমহলে চলিয়া গেলেন, উৎসাহপ্রাপ্ত যুবক যুবতী সহাস্যবদনে পরস্পর নয়নভঙ্গী করিয়া মুখ চাওয়া-চাহি করিলেন। পুনর্ব্বার সুধাপান চলিল, পুনর্ব্বার সপ্রেম সানুরাগ চুম্বন। ডাইমনকুমারী পূর্ব্বে সোহাগ-ঋণ পরিশোধ করিবার অবসর পান নাই, এইবার অনুরাগে অনুরাগে মায় সুদ ঋণ পরিশোধ করিলেন। আদরের বিনিময়, আলিঙ্গনের বিনিময়, সোহাগের বিনিময়, চুম্বনের বিনিময়। প্রেমের সংসারে বিনিময়-বাণিজ্যে পরম লাভ।

বিবাহের কথা হইতেছিল, ডাইভোর্সের কথা হইতেছিল, ঘটকালীর কথা হইতেছিল, ক্ষণকালের জন্য তাহা বন্ধ রহিল। ডাইমনের হস্তের সঙ্গীত পুস্তক, চন্দ্রকান্তের হস্তের ভগবদ্গীতা

অযত্নে টেবিলের উপর বিনিক্ষিপ্ত। নূতন প্রকার আনন্দ, সে আনন্দের কাছে সংগীতের মহিমা, গীতার মহিমা স্থান প্রাপ্ত হইল না। অল্পে অল্পে আরও দুই তিনবার উভয়ের হস্তে, উভয়ের ওষ্ঠে সুধা-পাত্র ঘুরিল; মধ্যে মধ্যে ফটিকচাঁদের গল্প উঠিল। কর্ত্তার মুখে যে সকল মধুর বাক্য শ্রবণ করা হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া উভয়ে প্রেমানন্দে হাস্য করিলেন। শেষ পাত্র সমাপ্ত করিয়া চন্দ্রকান্তবাবু আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন; দক্ষিণ হস্তখানি ললাটে স্পর্শ করিয়া মিষ্ট বচনে বলিলেন, "গুণবতি! আজ আর আমি অধিকক্ষণ থাকিতে পারিব না, দুটী বন্ধুলোক আসিবে, খাতির করিতে হইবে। আজ আমি চলিলাম, নিত্য নিত্য আসিয়া চন্দ্রমুখ দর্শন করিব, কর্ত্তার নিদেশানুসারে বিমল আনন্দ উপভোগ করিব।"

ব্যগ্রস্বরে ডাইমনকুমারী বলিলেন, "একটু বসুন, একটী কথা আমার জিজ্ঞাসা করিবার আছে।"

চন্দ্রকান্ত পুনরায় আসন গ্রহণ করিলেন, সকৌতুহলে বলিলেন, "কি তোমার জিজ্ঞাসা?"

ডাইমনকুমারী বলিলেন, "আপনার আসিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়। কেন,—একটু বেলা থাকিতে আসিতে পারেন না?"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, "পারি, কিন্তু কেমন একটু বাধ বাধ ঠেকে। পাড়ায় আমি নূতন, আগে আগে সকলে আমায় চিনিত না, এখন অনেকে চিনিয়াছে; দিনের বেলায় তোমার কাছে আসিব, বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবার সময় যদি কোন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হইয়া পড়ে, সে লোক কি মনে করিবে, তাহা ভাবিয়াই কিছু সন্দেহ জন্মে।"

হাস্য করিয়া ডাইমনকুমারী বলিলেন,—"সন্দেহ জন্মে? কেন গা বাবু? দিনের বেলা বিলাসিনীদের বিলাস-মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় ভদ্রলোকের ছেলেদের আজকাল কিছুই লজ্জা হয় না, সে কার্য্যে তাহারা কোন সন্দেহই রাখে না, ব্রাহ্মিকা আশ্রমে দিনমানে প্রবেশে আপনার সন্দেহ হয়, এ কথা শুনিয়া আমার হাসি পাইতেছে।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, "একটু পুরাতন হ'ক, তাহা হইলে তখন আমি সর্ব্বক্ষণ হাজির হইতে পারিব;—পূর্ব্বাহ্নে পারিব, মধ্যাহ্নে পারিব, অপরাহ্নে পারিব, সায়াহ্নে পারিব, রাত্রিকালে ত পারি-বই পারিব; তখন আর আমার মনে কোন সন্দেহই আসিবে না।" এই বলিয়া তিনি পুনর্ব্বার উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আদরে আদরিণীকে চুম্বন করিয়া সস্নেহে বলিলেন, "আজ তবে আমি বিদায় হই, কল্য ঠিক সন্ধ্যার সময়ে দেখা হইবে।"

ঈষৎ হাসিয়া আদরিণী সেই সময় সাদর চুম্বনের পরিশোধ বাসনায় দুটী তিনটী চুম্বন করিলেন। চন্দ্রকান্ত বাবু বিদায় হইলেন।

দশম কল্প।

খোঁড়া বিদ্যাবাগীশ।

পাঁচদিন অতীত। একদিন বৈকালে ডাইমনকুমারী বৈঠক-খানায় দাঁড়াইয়া সুদীর্ঘ দর্পণে আপনার মুখচ্ছবি দর্শন করিতে-ছেন, এমন সময়ে একগাছা লাঠি হস্তে একটী লোক খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। কে সে?

দর্পণের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া ডাইমনকুমারী দেখিলেন, ফটিকচাঁদ গোস্বামী। দেখিবামাত্রই তাঁহার প্রফুল্লবদন সহসা বিবর্ণ হইল,—মর্ম্মে মর্ম্মে ঘৃণা আসিল। ফটিকচাঁদের মুখে, কপালে, নাসিকায়, ছড়া ছড়া ক্ষতচিহ্ন, কালসিটে পড়া; জানুদেশ, স্কন্ধদেশ, হস্তের মণিবন্ধ, চরণের নিম্নগ্রন্থি অসম্ভব পরিস্ফীত; পরিহিত বস্ত্রের ঠাঁই ঠাঁই চুন-হলুদের দাগ; বদন বিশুষ্ক, কেশ রুক্ষ, সম্মুখে দুটী বড় বড় দাঁত একেবারে অদৃশ্য,—সমূলে উৎপাটিত।

বসিতে না বলিয়াই তাচ্ছিল্যভাবে ডাইমনকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি!—তোমার এ দশা কেন?"

ফটিকচাঁদকে পুলিসে ধরিয়াছিল, পাহারাওয়ালারা বেদম প্রহার করিয়াছিল, পুলিসে চালান দিয়াছিল, বিচারে জরিমানা হইয়াছিল, কিরূপে জরিমানা দাখিল হইয়াছিল, সে সকল সংবাদ ডাইমনকুমারী জানিতে পারিয়াছেন, ফটিকচাঁদ তাহা জানিত না; যন্ত্রণাসূচক ক্ষীণস্বরে সে উত্তর করিল, "সেরাত্রে আমার একটু বেশী নেশা হয়েছিল, মিউনিসিপ্যালিটির কপালে

আগুন, রাস্তার উপর একখানা বাড়ীর সাম্‌নে একরাশ পাথর আর কতগুলো ইট কাঁড়ী করা ছিল, রাস্তায় যেতে যেতে, নেশা ছিল কি না,—বেটক্করে হোঁচট খেয়ে সেই ইট-পাথরের উপর পোড়ে গিয়েছিলুম, ভারী আঘাত লেগেছিলো, মুখ, হাত, পা সব ছোড়ে গিয়েছিলো, তাতেই আমার এ অবস্থা।"

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এইরূপ কৈফিয়ৎ দিয়া, ফটিকচাঁদ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, বিনা অনুমতিতে একখানা চেয়ারের উপর বাঁকিয়া বাঁকিয়া বসিয়া পড়িল। সেইদিকে চাহিয়া ডাইমনকুমারী মুখ বাঁকাইলেন, বিরক্ত হইলেন, বিরক্তির সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণা ও ক্রোধের উদয়; কিন্তু মুখের কথায় সে ভাবটা প্রকাশ করিলেন না।

কাঁচুমাঁচু মুখে ফটিকচাঁদ বলিল, "ভাই ডাইমন! তুমি আমাদের আদরিণী ব্রাহ্মিকা ভগ্নী, পরের উপকারে তোমার পরম আনন্দ, সেটা আমি বেশ জানি। লোকের উপকারের জন্য ঘরে তুমি অনেক প্রকার ঔষধ রাখ; গরিবেরা তোমার কাছে এলে তুমি তাদের ঔষধ বিতরণ কর; আমি তোমাকে—"

ডাইমনকুমারী উপবেশন করেন নাই, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ফটিকচাঁদের কথাগুলি শুনিয়া মুখ ভারি করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ও সব কথা হঠাৎ কেন তুলিতেছ? এখন তুমি আমার কাছে কি চাও?"

ফটিকচাঁদ বলিল, "তাইতো বল্‌ছিলেম,—তুমি আমাকে একটু ওষুদ দাও। দেখ্‌তেই তো পাচ্ছো, আমার সর্ব্বাঙ্গ ফুলেছে, বড় যাতনা, দিবা রাত্রি যাতনায় আমি ছট্‌ফট্ করি, দয়া কোরে আমাকে একটু ওষুদ দাও।"

রুক্ষস্বরে ডাইমন্ বলিলেন, "আমি কি ডাক্তার? কোন্ রোগে কি ওষুধ দিতে হয়, তা কি আমি শিখেছি? ফুলেছে, যাতনা পাচ্ছ, তা'ত আমি বুঝতেই পাচ্ছি; ডাক্তার ডাক, ডাক্তারকে দেখাও গে।"

কাতরবচনে ফটিকচাঁদ বলিল, "ডাক্তার?—ডাক্তার ডাক্‌বার ক্ষমতা আমার নাই; আমার অবস্থা ত সকলই তুমি জান, ডাক্তারের খরচা কোথা থেকে যোগাব? তাদের অনেক টাকা ভিজিট্ দিতে হয়, ঔষধের দাম অনেক; আমি গরিব, ডাক্তার ডাকা আমার কর্ম্ম নয়।"

পূর্ব্ববৎ মুখ ভারি করিয়া ডাইমনকুমারী বলিলেন, "হাঁসপাতালে যাও। গরিবের উপকারের জন্য হাঁসপাতাল আছে। আমি তোমাকে কি ওষুদ দিব?—বিশেষ কি জান, পুলিসের ডাণ্ডা যে রোগ এনে দেয়, সে রোগের ওষুধ আমার কাছে থাকে না।"

ফটিকচাঁদের শুষ্কবদন আরও শুখাইল; ফটিকচাঁদ কাঁপিতেছিল, আরও কম্প বাড়িল;—মনে মনে ভাবিল, কি সর্ব্বনাশ! ডাইমনকুমারী সে সব কথা কেমন কোরে জান্‌তে পেরেছে? কার মুখে শুনেছে? পারাবালা বেটারা আমাকে মেরেছিল, আমি পুলিসের হাতে ধরা পড়েছিলেম্, পুলিসে আমার জরিমানা হয়েছে, সব কথাই কি ডাইমন জান্‌তে পেরেছে? সে সব গুহ্য কথা কারা এসে ডাইমনের কাণে তুলেছে? বোধ হয় তা নয়, সে রাত্রে আমি টল্‌তে টল্‌তে বেরিয়েছিলুম, আর হাত পা সব ফুলে রয়েছে, সেই জন্যই বোধ হয় অনুমান কোরে আমাকে ধাপ্পা দিচ্ছে। মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া

সে তখন চকিতস্বরে বলিল, "কি কথা বল্‌ছো ডাইমন? পুলি-সের ডাণ্ডা? এই অদ্ভুত কথা তোমার মুখে কেন বেরুল? পুলিসের আমি কি ধার ধারি?"

সত্য সত্য ফটিক যেন আকাশ থেকে পড়লো, কিছুই যেন জানে না, সেই রকম ভাব দেখিয়ে আরও অনেক কথা বলিতে লাগিল। ডাইমনকুমারী আর ধৈর্য্য রাখিতে না পারিয়া উগ্র-স্বরে বলিলেন, "চলে যাও এখান থেকে!—তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী? মাতাল, জুয়াচোর, মিথ্যাবাদী, বদ্‌মাস্‌! চলে যাও এখান থেকে!—পুলিসের তুমি কি ধার ধারো? আমার সাক্ষাতে এই ডাহা মিথ্যা কথাটা তুমি বল্‌ছো? বেহুঁস হয়ে রাস্তায় পড়ে-ছিলে, গুঁতোগাঁতা দিয়ে পাহারাওয়ালা তোমায় তুলেছিলো, হাঙ্গামা কোরে পাহারাওয়ালাকে তুমি মেরেছ, পাগ্‌ড়ী ছিঁড়ে দিয়েছ, দু-রাত্রি থানার গারদে বাস কোরেছ, সোমবার লাল-বাজার পুলিসে চালান হয়েছিলে, দশ টাকা জরিমানা হয়ে-ছিল, একজন পাহারাওয়ালা এসে অন্য একজন বাবুর কাছ থেকে জরিমানার টাকা আদায় কোরে নিয়ে দিয়েছে, সোমবার রাত্রেও টাকা অভাবে পুলিসের হাজতে ছিলে, মঙ্গলবার খালাস পেয়েছ, সব তত্ত্ব আমি জানি, সব খবর আমি রাখি। ঢলা-ঢলির চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে;—নামটা পর্য্যন্ত পুলিসের এজ-লাসে ব'লে ফেলেছ; পুলিসের রিপোর্টে হয় ত সে নামটা ছাপা হয়ে গিয়েছে, যারা যারা খবরের কাগজ পড়ে, তারা সকলেই জান্‌তে পেরেছে, সমাজের কর্ত্তারাও,—সভ্যেরাও এই ঢলাঢলি জান্‌তে পেরেছেন। সমাজে তুমি চাকরি কর, এটা যদি সত্য হয়, তা হলে আরতোমাকে সেখানে চাকরি কোত্তে

হবে না,—সমাজবাড়ীর চৌকাট পার হলেই দরোয়ানেরা তোমাকে গলা টিপে তাড়িয়ে দেবে;—আমার কাছেও আর তোমাকে আস্‌তে হবে না;—তোমার মতন ভণ্ড পণ্ডিতে আমার দরকার নেই, এখনি বাহির হয়ে যাও।"

মায়া জানাইয়া ফটিকচাঁদ কাঁদিতে আরম্ভ করিল, দুই চক্ষু দিয়া দরদরধারে জল পড়িতে লাগিল, ডাইমনের পায়ে ধরিবার জন্য চেয়ার হইতে উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল, উঠিতে পারিল না, চেয়ার উল্টাইয়া ধুপ করিয়া পড়িয়া গেল। ডাইমনকুমারীর ক্রোধ বাড়িল; বৈঠকখানার যে দ্বার দিয়া অন্দরে প্রবেশ করা যায়, সেই দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া, ফটিকচাঁদকে সেই অবস্থায় টানিয়া টানিয়া সদরের দিকের সিঁড়ির উপর সজোরে ফেলিয়া দিলেন, গড়াইতে গড়াইতে ফটিক একবারে নীচে গিয়া পড়িল, তাহার পর আস্তেব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে, বাঁকিতে বাঁকিতে, খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে সদর-দরজা দিয়া রাস্তায় বাহির হইল; নাকে, মুখে, কপালে রক্ত পড়িতে লাগিল; অতি কষ্টে একটু সাম্‌লাইয়া, কুঁজো হইয়া, প্রায় হামাগুড়ি দিতে দিতে প্রস্থান করিল।

তখনও সূর্য্যাস্ত হইবার প্রায় এক ঘণ্টা বিলম্ব; আবার যদি ফিরিয়া আইসে, সেই সন্দেহে, ডাইমনকুমারী তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া, সদর-দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিলেন।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল, বৈঠকখানায় বাতী জ্বলিল, ডাইমন-কুমারী চঞ্চলা। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, মাতালটা দিনমানে আসিয়াছিল, তবু ভাল, সন্ধ্যার পর আসিলে নূতন বাবু ওটাকে দেখিতে পাইতেন, আমার উপর হয় ত রাগ করিতেন।

আকাশে চন্দ্রোদয় হইল, ডাইমনকুমারীর গৃহ মধ্যেও চন্দ্রোদয়। চন্দ্রকান্তবাবু দর্শন দিলেন। সদরদরজা বন্ধ ছিল, সন্ধ্যা হইবামাত্র ডাইমনকুমারী নামিয়া গিয়া দরজাটা খুলিয়া ভেজাইয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন, চন্দ্রকান্তের প্রবেশের অসুবিধা হয় নাই।

চন্দ্রকান্তবাবু আসন পরিগ্রহ করিলেন, এতক্ষণের পর একটু সুস্থ হইয়া ডাইমনকুমারীও উপবেশন করিলেন। সর্ব্বপ্রথমেই ডাইমনকুমারী হাস্য করিয়া বলিলেন, "ফটিকচাঁদ এসেছিল, সর্ব্ব শরীর ফুলেছে, খোঁড়া হয়ে গিয়েছে, আমার কাছে ওষুধ চেয়েছিল, আমি তারে তখনই তাড়িয়ে দিয়েছি।"

চন্দ্র। বেশ কোরেছ। তত বড় বদ্‌মাস লোকের মুখ দেখ্‌তে নাই, ছায়া স্পর্শেও পাপ হয়। তাড়ানো ত নয়, মঙ্গলাচরণ;—পরমপিতার অভিপ্রেত কার্য্য। এখন একটু আরামের ব্যবস্থা কর। আমার বাড়ীতে আজ জনকতক প্রজা এসেছিল, ঝাড়া দুই ঘণ্টা তাদের সঙ্গে বকাবকি কোরে গলাটা শুখিয়ে গেছে।

ডাই। (উঠিয়া শিশি, গেলাস ও ডালিম বাহির করিয়া আনিয়া সহাস্যবদনে) আসৃতে আজ্ঞা হয়;—আরাম করুন। (একটি পাত্র সুধাপূর্ণ করিয়া, শুষ্ককণ্ঠ চন্দ্রকান্তের হস্তে প্রদান, উভয়ের সুধা পান)

চন্দ্র। (সুধাপাত্র শূন্য করিয়া গম্ভীরবদনে) তবে এখন সেই প্রস্তাবটার আলোচনা হোক্।

ডাই। (যেন কিছু বুঝিতে না পারিয়া সন্দেহে ছলক্রমে) কোন্ প্রস্তাব?

চন্দ্র। (কপট বিস্ময়ে) মনে হয় না?—একদিনেই ভুল? সেই যে, বর নির্ব্বাচন?

ডাই। (মৃদু হাস্য করিয়া) ওঃ! সেই কথা?—আগে আপনার ডাইভোর্স হয়ে যাক্, তারপর বিবেচনা।

চন্দ্র। (হাস্য করিয়া) অধিবাসের পূর্ব্বে অর্চ্চনা করা চাই।

ডাই। (ভাব বুঝিতে পারিয়া, দ্বিতীয় পাত্র প্রদান করিয়া) অর্চ্চনাটা হোক্ তবে।

চন্দ্র। (সানন্দে মদ্যপান করিয়া) হাঁ,—কি বল্‌ছিলে? ডাইভোর্স?—বেশী দেরি হবে না,—সে পক্ষে নিশ্চিন্ত থাকো। এখনকার কথা এই যে, সভ্যজাতীর মধ্যে কোর্টশিপ্ আছে, তোমাতে আমাতে দিন কতক কোর্টশিপ্ চলুক।

ডাই। (মৃদু হাস্য করিয়া) কোর্টশিপ্ কি রকম?

চন্দ্র। (পুনর্ব্বার মদ্যপান করিয়া) কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণসিন্ধুতনয় সুন্দরের মুখ দিয়ে বলেছিলেন, "কাজের সহিত দেখা হইবে যখন, কেবা হারে কেবা জিনে বুঝিব তখন।" আগে ত চলুক্, তারপর বুঝাব।—বোধ হয় বুঝাতেও হবে না, আপনা আপনি বুঝ্‌তে পারবে;—হয় ত এখনই সেটা বুঝে নিয়েছ!

ডাই। (সুধাপাত্রের আদান প্রদান নির্ব্বাহ করিয়া) সত্য বল্‌ছি, কিছুই বুঝি নাই;—কারে বলে কোর্টশিপ্?

চন্দ্র। (সুধা পান করিয়া) বুঝ্‌তে পার নাই?—ঠিক বুঝেছ; চাতুরী খেল্‌ছো। আচ্ছা, বুঝাই। বিবাহের পূর্ব্বে বরকন্যার একত্র বাস।

ডাই। (অধোবদনে লজ্জা জানাইয়া) ছিঃ! আপনি বড় নির্লজ্জ!—আমি স্বাধীনা, আমি ব্রাহ্মিকা, আমাদের সম্প্রদায়ে লজ্জা করা নিষেধ, তবু আপনার ঐ কথাটা শুনে আমার যেন লজ্জা আস্‌ছে।

চন্দ্র। (গম্ভীরবদনে) ত্যাগ কর।—ত্যাগ কর,—লজ্জা পরিত্যাগ কর।—ছিঃ!—ঐ চন্দ্রমুখে কি লজ্জা মানায়? হিন্দুরা বলে, চাঁদে কলঙ্ক আছে; তোমার ঐ চাঁদমুখে যদি লজ্জা আসে, তবে সেটা চাঁদমুখের কলঙ্ক। লজ্জার কথা শুন্‌লে আমার বরং ঘৃণা হয়।

ডাই। ঘৃণা হয় সত্য কিন্তু শীঘ্র একবারে ছাড়া যায় না। মেয়েমানুষ আমি, পুস্তকে লেখা আছে, লজ্জাটা স্ত্রী-জাতির ভূষণ;—ছাড়ি ছাড়ি মনে করি, ছেড়েছিও অনেক, তবু যেন এখনও একটু একটু বাধে;—অভ্যাসের দোষ।

চন্দ্র। (মদ্যপানান্তে প্রতিধ্বনি করিয়া) অভ্যাসের দোষ! অভ্যাসটা নির্ম্মূল কোরে ফেল;—মাথা হেঁট কোরে থাক্‌লে কেন?—চন্দ্রমুখ উত্তোলন কর;—চকোরের বড় পিপাসা, চন্দ্রমুখি! চন্দ্রমুখে সুধাদান কর;—আচ্ছা, এই আমি তোমার লাজের মাথায় বাজ হেনে দিচ্ছি! (শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া নিকটে গিয়া নায়িকার গ্রীবা ধারণ পূর্ব্বক সানুরাগে মধুর অধরে পুনঃ পুনঃ চুম্বন)

ডাই। (ক্ষিপ্রহস্তে বসনাঞ্চলে মুখ মুছিয়া মৃদু হাসিয়া) আপনার যে দেখ্‌ছি আর বিলম্ব সয় না?

চন্দ্র। (সুধাপান করিয়া) বিলম্ব সয় না কি কোরে বল? এই ত বিলক্ষণ সহ্য কোরে আস্‌ছি।—ক'দিন হলো বল দেখি?

ডাই। (বিকসিত নেত্রে সটান মুখপানে চাহিয়া) এই সবে আট দিন।

চন্দ্র। (কপট বিস্ময় প্রকাশ) আট দিন?—মিথ্যা কথা! আমার জ্ঞান হচ্ছে যেন আট যুগ!—ঠিক আট যুগ যেন তোমার সঙ্গে আমার আলাপ।—এতদিনেও কি তোমার মনের মত হতে পাল্লেম না?—লজ্জার কথা, বল্‌ছিলে?—কার কাছে লজ্জা?—আমার কাছে ত লজ্জা থাক্‌তেই পারে না। যাঁদের সম্মুখে লজ্জা আসে, তাঁরাও ত আমাদের শুভ সম্মিলন জান্‌তে পাচ্ছেন। সেদিন ত কর্ত্তা এসেছিলেন, স্বচক্ষেই তো আমাদের দেখে গেলেন; আহ্লাদ প্রকাশ কোরে কত উৎসাহ দিয়ে গেলেন; তবে আর কিসের জন্য লজ্জা রাখ?—নিজে আমি চন্দ্র হয়ে চকোর হয়েছি, নিজেই আমি তোমার কাছে সুধা ভিক্ষা কচ্ছি, সুধামুখি! সদয় হও,—দয়া কোরে বিন্দু বিন্দু সুধা দানে এই নবীন তৃষিত চকোরের সুধা-পিপাসা শান্তি কর।

ডাই। জগৎপিতার যেটা ইচ্ছা, একদিন না একদিন সেটা সিদ্ধ হবেই হবে। তিনি ইচ্ছাময়, মানুষের ইচ্ছা না থাকিলেও এই স্বর্গীয় ইচ্ছা কদাচ অপূর্ণ থাকে না। আপনি ব্যস্ত হইবেন না, ডাইভোর্স আইন পাশ্র করাবার চেষ্টা দেখুন, আমিও এদিকে দিন কতক একটু বিবেচনা করি। ফটিক-চাঁদকে বিদায় করেছি, আর কোন বন্ধু-বান্ধব বড় একটা আমার কাছে ঘেঁসে না, আপনিই এখন আমার প্রাইভেট রুমের বন্ধু।

চন্দ্র। (ঈষৎ হাসিয়া) প্রাইভেট রুমের বন্ধু হওয়াই আমার দরকার। ডাইভোর্সের আগেও সেরূপ বন্ধুত্ব বেশ রক্ষা

হইতে পারে; সেই জন্যই বল্‌ছি, এখন থেকে দিনকতক কোর্টশিপ্ চলুক।

ডাই। (নতবদনে মৃদু হাসিয়া) কোর্টশিপে আমি রাজি হতে পার্‌বো না।

চন্দ্র। তবে আর আমি আজ এখানে বেশীক্ষণ বিলম্ব কর্‌তে পারবো না, সেই প্রজাগুলো এখনও রয়েছে; খানকতক কবুলতিতে দস্তখত করিয়ে নিতে হবে, সকাল সকাল যাই। (গোলাপি শিশির প্রতি দৃষ্টিপাত)

ডাই। (অভিপ্রায় বুঝিয়া—পাত্র পূর্ণ করিয়া প্রদান পূর্ব্বক) এইবার চকোরের একটু পিপাসা শান্তি হোক্।

চন্দ্র। (পাত্র গ্রহণ করিয়া) হোক্ একটু, কিন্তু যে সুধা এ চকোরের প্রয়োজন, সে সুধা স্বর্গের সুধা। (মদ্যপান করিয়া ডাইমনের অধরে ও ললাটে মধুর চুম্বন করিয়া) এই সুধাই পবিত্র সুধা। এ সুধার নাম সুন্দরী যুবতীর অধরামৃত! জন্ম জন্ম যেন এইরূপ সুধাপানে এ চকোর পরিতৃপ্ত হয়।

ডাইমনকুমারী সে চুম্বনের প্রতিদান করিলেন, দ্বিতীয়বার চুম্বন করিয়া চন্দ্রকান্ত সে রাত্রে বিদায় হইলেন।

ক্রমশঃ দিন গত হইতে লাগিল, চন্দ্রকান্ত নিত্য নিত্য ডাই-মনের ঘরে আইসেন, রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত থাকিয়া যান, বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারেন না। বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী বাড়ীতে আছেন, তাহা ছাড়া আরও কিছু কিছু উপসর্গ আছে। চন্দ্রকান্তবাবু কলিকাতায় আসিয়া নবচক্রী দলের কাপ্তেন হইয়া-ছেন;—আরমানি বিবি, য়িহুদি বিবি, কাশ্মীরী মহিলা, ফরাসী বিবি, বিলাতী বিবি আরও অন্যান্য বিবিলোকের

খাতির রাখ্‌তে হয়,—সহরের বাই-মহলে হাজিরা দিতে হয়, কাজে কাজেই ডাইমনকুমারীকে সমস্ত রজনী কোলে করিয়া রাখিতে পারেন না। জটাধারী বিশ্বাসের পরামর্শে সহরতলীর বাজার অঞ্চলে তিনি একটী বাগান কিনিয়াছেন, বাগানে মনোহর বৈঠকখানা আছে, হপ্তার মধ্যে দুই তিনদিন রাত্রি দশটার পর দুইটী একটী বাইজী লইয়া, দুটী পাঁচটী ইয়ার লইয়া সেই বাগানে তাঁহাকে আমোদ করিতে যাইতে হয়; কাজে কাজেই ডাইমনের প্রাইভেট রুমে দশটা পর্য্যন্ত সময় নিরূপণ।

পাঁচ বৎসর অতীত। দুষ্ট মন্ত্রীগণের মন্ত্রণায় দাদার সংসার হইতে চন্দ্রকান্তবাবু পৃথক হইয়া আসিয়াছিলেন, মন্ত্রীরা তাহার পর মন্ত্রণা দিয়াছিল, মফস্বলের জমীদারীর প্রাচীন আমলারা চোর, তাহাদিগকে জবাব দিয়া নূতন নূতন আমলা ভর্ত্তি কর। এজমালী কাছারী আছে, সেটাও ভাল নয়; দাদার কাছারী পৃথক করিয়া দিয়া তুমি এখন নূতন নূতন কাছারীবাড়ী স্বতন্ত্র নির্ম্মাণ করাও, নূতন নূতন নায়েব গোমস্তা নিযুক্ত কর। বুদ্ধি থাকিলেও চন্দ্রকান্তবাবু চক্রীর কুহকে বোকা বনিয়া গিয়াছিলেন, বোকা চন্দ্রকান্ত সেই সকল ফন্দীবাজ লোকের অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া তাহাদের পরামর্শমত কার্য্য করিয়াছিলেন। সেই প্রকার মন্ত্রী যে সংসারে প্রবেশ করে, যাহাদের কাছে প্রতিপত্তি লাভ করে, নিশ্চয়ই তাহারা তাহাদের ভিটায় ঘুঘু চরায়, বোকা চন্দ্রকান্ত সেটা আসলেই বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই।

কর্ত্তার আমল অবধি নিয়ম ছিল, মফস্বলে নায়েবরাই কিস্তি কিস্তি কালেক্টারীর লাটবন্দীর খাজনা সরবরাহ করিত, হরকান্ত বাবু সেই সকল নায়েবকে পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। সেই সকল

নায়েবকে দাদার ভাগে ফেলিয়া দিয়া চন্দ্রকান্তবাবু নূতন নূতন নায়েব নিযুক্ত করিয়াছিলেন; প্রত্যেক জমীদারীর নূতন নূতন কাছারীতে নূতন নূতন নায়েব আধিপত্য করিতেছিল; কর্ত্তার আমলে কলেক্টারীর মালগুজারী সরবরাহে যেরূপ নিয়ম ছিল, তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ছোটবাবুর কাছারী নূতন হইল, নায়েব গোমস্তা নূতন হইল, পুরাতন নায়েব গোমস্তারা বড় বাবুর ভাগে পড়িল। ষোল আনা ষ্টেটের প্রধান নায়েবরা অবশ্যই বেশী টাকা বেতন পাইত, সূর্য্যকান্তবাবু অর্দ্ধেক হিস্যাতে তত টাকা বেতন দিতে পারিলেন না, সুতরাং তাহাদিগকে ছাড়াইয়া সম্ভবমত অল্প অল্প বেতনে নূতন নূতন নায়েব বসাইয়া দিলেন। বলা উচিত, নূতন কর্ম্মে যাহারা যাহারা উমেদার হইয়াছিল, তাহারা সকলেই চক্রান্তকারী দলের পেটাও লোক; সূর্য্যকান্ত বাবুর অংশেও সেইরূপ, চন্দ্রকান্তবাবুর অংশেও সেইরূপ। নিগূঢ় তত্ত্বটা বাবুরা কিছুই জানিতে পারেন নাই। পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে, এই সময় নায়েবরা যোগ করিয়া কালেক্টরীর লাটবন্দীর খাজনা বাকী ফেলিতে লাগিল, আখিরি কিস্তিতে নির্দ্দিষ্ট দিবসে সূর্য্যাস্তের মধ্যে টাকা দাখিল না হওয়াতে জমিদারীগুলি একে একে নীলাম হইয়া গেল। কি হইল, কেন গেল, কিস্তির টাকা কেন বাকী পড়িল, বাবুরা অগ্রে তাহার কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, শেষকালে বুঝিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন।

জমিদারীগুলি গেল, তথাপি এক রকমে সংসার চলিতে লাগিল। হলধরপুর গ্রামে ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে হরকান্তবাবুর প্রায় দুই শত বিঘা খরিদা ঠিকাব্রহ্মোত্তর জমী ছিল, সেই সকল জমী প্রজাবিলি ছিল, তাহার উৎপন্ন অর্থে দুই সহোদরের কষ্টে

স্বচ্ছে দিন চলিতে লাগিল। হলধরপুরে ভদ্রাসন বাড়ী আর সহরের জানবাজারের বাড়ীখানি এওয়াজদরাজস্বত্রে দুই ভ্রাতার অংশে পড়িয়াছিল; বাবুগিরি ঘুচিয়াছিল, ক্রিয়া-কর্ম্ম লোপ পাইয়াছিল, কিন্তু বাস করিবার অথবা সংসার খরচ করিবার ততটা অসুবিধা হয় নাই। চক্রী লোকেরা তাহাও নষ্ট করিবার যোগাড় করিতে লাগিল। ছোট বাবুটী কাপ্তেন, তাঁহার বেশী খরচ, চক্রীরা রকমারী মহাজন জুটাইয়া অর্দ্ধেক সুদে চন্দ্রকান্ত দ্বারা ধড়াধড় হাণ্ডনোট কাটাইতে আরম্ভ করিল; জমীদারী নিলাম হইয়া গিয়াছে, মহাজনেরা তাহা জানিত না, জমীদারের ছেলে বলিয়া কর্জ্জদান করিতে তাহাদের সন্দেহ হইত না। অর্দ্ধেক সুদ, এ কথার অর্থ এই যে, যত টাকা আসল, খাতক তাহার অর্দ্ধেক লইয়া ষোল আনা টাকার খত লিখিয়া দিতেন। অনেক বড় লোকের কাপ্তেন ছেলেরা ঐ রূপেই টাকা সংগ্রহ করে;—ন্যায্য খরচের টাকা নয়, বাজে খরচের টাকা। চন্দ্রকান্তের ঐরূপ দশা কিন্তু সূর্য্যকান্তবাবু সে ধরণের লোক ছিলেন না, সুতরাং তাঁহাকে নষ্ট করা চক্রীলোক-দিগের পক্ষে কিছু কঠিন হইয়াছিল। কিছুদিন গোপনে গোপনে মন্ত্রণা করিয়া, বাস্তুঘুঘুরা নূতন ফন্দী স্থির করিল;—অনেক দিনের পুরাতন ষ্ট্যাম্প যোগাড় করিয়া, হরকান্ত বাবুর দস্তখতি খানকতক খত প্রস্তুত করিল;—অনেক টাকার খত।

জালিয়াতেরা খুব হুঁসিয়ার। ১২৭১ সালে হরকান্ত বাবুর মৃত্যু হইয়াছে, এখন ১২৮০ সাল। ইংরাজের রাজ্যে একটা তামাদি আইন আছে, সেই আইনের প্রসাদে অনেক ঋণছ্যাঁচড় লোক নিষ্কৃতি পায়, অনেক ধর্ম্মভীরু ভালমানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া

থাকে। হরকান্ত বাবুর নামে যাহারা জাল খত প্রস্তুত করিল, তাহারা তামাদি আইনের দিকে বিশেষ নজর রাখিয়াছিল, পুরাতন ষ্ট্যাম্প খরিদ করিবার সময় যেরূপ সাবধান, খতগুলিতে তারিখ দিবার সময়ও সেইরূপ সাবধান হইয়াছিল। এক একখানি খত ১২৬৯ সালের, এক একখানি খত ১২৭০ সালের, তামাদি হইবার কিছু বিলম্ব ছিল, সূর্য্যকান্তবাবু আর চন্দ্রকান্ত বাবু উভয়েই সেই জালিয়াতির জালে বাঁধা পড়িবেন, কর্ত্তার নাম জাল করিবার উদ্দেশ্য তাহাই। পিতৃঋণের জন্য সকল পুত্রেরাই দায়ী হয়, এ ক্ষেত্রে হরকান্তবাবুর উভয় পুত্রই ঐ সকল জাল খতে ডিক্রির টাকা শোধ করিয়া দিতে বাধ্য থাকি-বেন, চক্রী লোকেরা ইহা বেশ বুঝিয়া রাখিয়াছিল। সেই সকল খতের মহাজন ভিন্ন ভিন্ন। হরকান্তবাবুর সৌভাগ্যে যাহারা হিংসা করিত, তাঁহার মৃত্যুর পর যাহারা একপ্রকার প্রকাশ্য শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারাই সেই সকল মহাজনকে অনেক টাকার লোভ দেখাইয়া সেই পাপ কার্য্যে লিপ্ত করিয়া-ছিল। পাপীদের পাপ চক্রে—বাবুদের জমিদারীগুলি নীলাম হইয়া গিয়াছিল; যাহারা নীলাম খরিদ্দার, তাহারাও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের লোক। কাণ্ডটা বেনামী;—উমানাথ তরফদার আর জটাধারী বিশ্বাস সমস্ত পাপ কার্য্যের যোগাড়ে।

জাল খত প্রস্তুত হইল, কিন্তু কি ভাবিয়া জালিয়াতেরা শীঘ্র শীঘ্র নালিস রুজু করিবার পরামর্শ দিল না,—দুই মাস, ছয় মাস বিলম্ব করিবার যুক্তি স্থির করিয়া রাখিল।

দুষ্ট লোকের চাতুরী নানা প্রকার। দুষ্ট লোককে কায়দায় আনিবার জন্য দুষ্টেরা শীঘ্র শীঘ্র উপযুক্ত ফাঁদ প্রস্তুত করিতে

পারে না, সাধুলোকেরাই তাহাদের চক্র-ফাঁদে আগে ধরা পড়েন। সূর্য্যকান্ত ও চন্দ্রকান্ত নির্ব্বিরোধী ভদ্রলোক। তাঁহারা কখন কাহারও শক্রতাচরণ করেন নাই, অথচ তাঁহাদের শক্র হইয়াছে। ধর্ম্মের সংসারটী নষ্ট করিবার নিমিত্ত বদ্‌মাস লোকেরা নূতন চক্র সৃজন করিয়াছে। কি ভাবিয়া তাহারা শীঘ্র শীঘ্র আদালতে উপস্থিত হইল না, তাহারাই এবং তাহাদের পরামর্শদাতারাই বলিতে পারে। বাস্তবিক শীঘ্র শীঘ্র নালিস হইল না।

দ্বিতীয় খণ্ড।

ভবের খেলা।

প্রথম কল্প।

জনার্দ্দন ঠাকুর।

মেদিনীপুর জেলার একখানি গ্রাম। সুপ্রসিদ্ধ গ্রাম নহে, মাঝারি ধরণের সামান্য গ্রাম। বসতি অনেক, কিন্তু ব্রাহ্মণের বাস অল্প; সেই কারণে গ্রামখানির বেশী খ্যাতি নাই। ব্রাহ্মণ দশ ঘর, কায়স্থ এক ঘর, সদ্গোপ পঞ্চাশ ঘর, তাঁতি চল্লিশ ঘর, পল্লবঘোষ পাঁচঘর, নাপিত একঘর, রজক একঘর, কুম্ভকার তিন ঘর, কামার দুই ঘর, শাঁকারী এক ঘর, ইহা ছাড়া অন্যান্য জাতি প্রায় সত্তর আশী ঘর। মুসলমানের সম্পর্ক নাই।

গ্রামে বাজার নাই। সোমবারে আর শুক্রবারে দুটী ছোট ছোট হাট হয়। গ্রামবাসীরা হাটের দিন আবশ্যকমত জিনিষ-

পত্র খরিদ করিয়া রাখে, তাহাতেই একরকম চলে। যেখানে হাট হয়, সেইখানে খানকতক দোকান আছে। বেণে মশ্‌লার দোকান, কাপড়ের দোকান, ময়রার দোকান, কলুর দোকান, কামারের দোকান, আর মুদীখানার দোকান।

অনেক দিনের প্রাচীন গ্রাম। বহু প্রাচীন বড় বড় অশ্বত্থ বৃক্ষ, বড় বড় দীঘী, বড় বড় সরোবর, দুই একখানা কোটা-বাড়ীর ভগ্নশেষ, গুটিকতক ভগ্ন দেবমন্দির, সেইগুলিই গ্রামের প্রাচীনত্বের নিদর্শন। ভগ্ন অট্টালিকার ও ভগ্ন মন্দিরের মাথার উপর বড় বড় বৃক্ষলতা উৎপন্ন হইয়া তলা পর্য্যন্ত শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে; সংস্কারাভাবে অথবা মালিক অভাবে কয়েকটি ভাল ভাল জলাশয় মজিয়া যাইতেছে; এক একটি বৃহৎ পুষ্করিণীর বুকের উপর বড় বড় দাম;—অনেক দূর পর্য্যন্ত বড় বড় ঘাস জন্মিয়াছে, তাহার উপর গরু বাছুর চরে, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ছুটাছুটি করে, খেজুরের ছাট্ হাতে করিয়া রাখালেরা গরু চরায়। পূর্ব্বে সেখানে জল ছিল, এখনকার অবস্থা দেখিলে তেমন লক্ষণ কিছুতেই বুঝা যায় না।

গ্রামের গৌরবের সাক্ষী এইটুকু আছে যে, গ্রামের মধ্যে মদের দোকান নাই, গাঁজার দোকান নাই, তাড়ির দোকান নাই; বলিতে গেলে, আবকারীর সম্পর্ক মাত্রই নাই। এক-খানি আফিঙের দোকান আছে, তাহাও ভাল চলে না। আর একটী গৌরবের কথা আছে;—গ্রামের মধ্যে প্রকাশ্য গণিকা নাই।

গ্রামের নাম পরমহংসপুর। এ নাম পূর্ব্বে ছিল না; এটা নূতন নাম। নূতন হইলেও শতবর্ষের কম নয়! পূর্ব্বে ইহার

কি নাম ছিল, এখনকার বর্ত্তমান গ্রামবাসীরা তাহা স্মরণ করিয়া বলিতে পারে না। নূতন নাম হইবার কারণটী এইরূপ শুনা যায় যে, শতবর্ষ পূর্ব্বে সেই গ্রামে একজন পরমহংস থাকিতেন, তাঁহার বহুতর অদ্ভুত অদ্ভুত কীর্ত্তির কথা এখনো প্রচার আছে। গ্রামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি সেই পরমহংসের পরম ভক্ত; তাঁহার বাসনা হইয়াছিল, পরমহংসের গৌরবার্থ গ্রামের নূতন নাম দেওয়া; তিনি বলিয়াছিলেন, গ্রাম যেন এখন অবধি "পরমহংসপুর" বলিয়া ঘোষিত হয়। তিনি ছিলেন জমীদার, গ্রামের মধ্যে ক্ষমতা-প্রতিপত্তিও বেশ ছিল, সুতরাং সকলেই তাঁহার মতে সম্মত হইয়াছিল; অতএব সেই অবধিই ঐ নূতন নাম প্রচার হইয়াছে। পরমহংসের ভক্তের দ্বারাই এই নাম-করণ। পুরাতন নাম বিলুপ্ত।

গ্রামের পশ্চিমদিকে একটী বেগবতী নদী। সেই নদীতীরে বহুপূর্ব্বে একটী শিবমন্দির ছিল, সেই মন্দিরে পঞ্চমুখ মহেশ্বরের শুভ্রবর্ণ প্রস্তর মূর্ত্তি বিরাজ করিত। যাঁহাদের শিব, তাঁহারা নির্ব্বংশ হওয়াতে, শিব সেখানে বেওয়ারিস্ হন; পূজা বন্ধ হয়, ভোগ বন্ধ হয়, সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যা দেওয়াও বন্ধ হয়, অযত্নের এক-শেষ। ডানপিটে ছোঁড়ারা শেষকালে মূর্ত্তিটী পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিয়াছিল। পূর্ব্বকথিত পরম-হংস সেই শূন্যমন্দিরে আসন পাতিয়াছিলেন। তাঁহার গুটী-কতক চেলা ছিল, চেলারা আপনাদের নাম বাড়াইবার জন্য পরমহংসের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিত। পরমহংস যখন দেহ রক্ষা করেন, সেই সময় একজন শিষ্য তাঁহার অনুমতি লইয়া পরমহংস হইয়াছিল। সেই নূতন পরমহংস মরণকালে এক

উইল করিয়া গিয়াছিল, "আমার বংশে যেন চিরদিন এক এক জন পরমহংস হয়।" পরমহংস হইবার পূর্ব্বে তাহার বিবাহিতা পত্নীর গর্ভে দুটী পুত্র আর একটী কন্যা জন্মিয়াছিল। পুত্র-বানের উইলে "বংশ" শব্দ ব্যবহার অবশ্যই সার্থক। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে ব্যক্তি একমাত্র জগদীশে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া পরমহংস হইয়াছিল, সেই ব্যক্তির উইল ছিল। পরম-হংস যেন উইল করিয়া এই উচ্চ আশ্রমটীকে সামান্য স্থাবর সম্পত্তি জ্ঞান করিয়া কিম্বা কোম্পানীর কাগজ মনে করিয়া বংশধরগণকে "পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিসনক্রমে পরম সুখে ভোগ-দখল" করিবার অধিকার দিয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, সেই উইলকর্ত্তার একটী পৌত্র এখন পরমহংসপুরের পরমহংস। প্রথম পরমহংস যে মন্দিরে বাস করিতেন, সে মন্দির অনেক দিন পূর্ব্বে নদীগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে; বর্ত্তমান পরমহংস অন্য স্থানে বাস করেন। গ্রামের একজন ধনবান ব্রাহ্মণের একখানি কালীবাড়ী আছে, সেই কালীবাড়ীর অদূরে আস্তাবলের মত ছোট একটী ঘর বানাইয়া, এখনকার পরমহংস সেই নূতন আশ্রমে বাস করিতেছেন।

এই পরমহংসের কার্য্যকলাপের একটু পরিচয় দিতে হইল। তিনি উলঙ্গ নহেন, কৌপীনও পরেন না, গৈরিক বসনও ব্যবহার করেন না; সাদা সাদা থানধুতি পরেন, থানের দোবজা স্কন্ধে রাখেন, শীতকালে কম্বল গায়ে দেন; চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার করেন না, নদীতে স্নান করিতে যাইবার সময় কাষ্ঠপাদুকা ধারণ করেন। উপবাসী অথবা ফলমূলাশী নহেন; দিনমানে কালীঠাকুরাণীর অন্নভোগের প্রসাদ পান, মৎস্য-মাংস সব চলে; রাত্রিকালে

মা-কালীর শীতুলের অর্দ্ধেক সামগ্রী তাঁহার আশ্রমে যায়। লোকে বলে, মহাপ্রসাদে এই মহাপুরুষের মহারুচি।

কোন প্রকার জপ কিম্বা পর্ব্ববিশেষে হোমাদি করা তাঁহার কার্য্য নয়, এক এক সময়ে নেত্র মুদিয়া যুগল হস্ত বক্ষে রাখিয়া ধ্যান করেন, ইহাই লোকের চক্ষে পড়ে। যাহারা তাঁহাকে দেখিতে যায়, তাহাদিগকে তিনি ধর্ম্ম উপদেশ দেন; কিন্তু গ্রামের বেশী লোকে তাঁহার উপদেশ শুনিতে যায় না।

গ্রামের দক্ষিণ পল্লীতে একজন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের নিবাস; তাঁহার নাম জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী। শিষ্য-যজমান রাখিয়া দান দক্ষিণা গ্রহণ করা তাঁহার জীবিকা। ব্রাহ্মণ-শূদ্র উভয় জাতিই তাঁহার যজমান, উভয় জাতিই তাঁহার শিষ্য। বলা উচিত, গ্রামের অনেক লোক সঙ্গতিসম্পন্ন; তাহার মধ্যে ঘর কতক সদ্গোপ প্রচুর ধনশালী; জনার্দ্দনের সদ্গোপ শিষ্য অনেক। শিষ্যেরা তাঁহাকে "ঠাকুর" বলিয়া ডাকে; সেই দৃষ্টান্তে প্রায় সকলেই তাঁহাকে ঠাকুর বলে; সকলের মুখেই তাঁহার নাম হইয়াছে "জনার্দ্দন ঠাকুর।"

জনার্দ্দন ঠাকুরের তিন পুত্র, তিন কন্যা। দুটী পুত্রের বিবাহ হইয়াছে, ছোটটী নবমবর্ষীয়; কন্যা তিনটীরও বিবাহ হইয়াছে;—বড় দুটী বিধবা, ছোটটী সধবা। গৃহিণী কিছু মুখরা; পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে প্রায়ই কোঁদল হয়, বিনা উপলক্ষে স্বামীকেও কটুকথা বলেন; দ্বারে ভিখারী আসিলে হাত মুখ নাড়িয়া তাহাদের সঙ্গে ঝগড়া করেন; কেবল ছেলে-মেয়েগুলিকে কখনো রুক্ষকথা বলেন না। ঝঙ্কার ঝাড়েন, কিন্তু ছেলে-মেয়েরা সে ঝঙ্কারকে ভূতের ঢেলা মনে করে।

শিষ্য যজমান অনেক, কিন্তু জনার্দ্দন ঠাকুর কোটাবাড়ী করিতে পারেন নাই, মাটীর ঘর। চারিদিকে উচ্চ উচ্চ প্রাচীর ঘেরা পাঁচখানি বড় ঘর, দুখানি ছোট ঘর, একখানি রান্না ঘর। প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্রাকার ধানের গোলা।

বাড়ীখানি একমহল। সদর মহলে স্থান আছে, কিন্তু প্রাচীর নাই। উত্তর দিকে দিব্য খড়্‌টী করা, উলু দিয়া ছাওয়া একখানি প্রশস্ত ঘর;—চণ্ডীমণ্ডপ নহে, বসিবার ঘর। ঠাকুরের অন্য কোন ক্রিয়া-কর্ম্ম নাই, কিঞ্চিৎ লাভের আশায় বৎসরের মধ্যে কেবল একদিন সরস্বতী পূজা হয়; মা সরস্বতী উপযুক্ত স্থান না পাইয়া, সেই বৈঠকখানাতেই অধিষ্ঠান করেন। ঢাক ঢোল বাজে না, যাত্রা-কবি হয় না, লোকজন খায় না, নিমন্ত্রিত লোকেরা,—শিষ্যেরা, যজমানেরা, ঘটের নিকটে প্রণামী রাখিয়া এক একটী রসকরা খাইয়া চলিয়া যায়।

পাঠক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, সহরেই ত প্রণামীর ধূম, পল্লীগ্রামেও কি প্রণামীর উপদ্রব আছে? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিতে পারি, সাধারণতঃ নাই, গুরুপুরোহিতের বাড়ীতে পূজাপর্ব্ব হইলে শিষ্যযজমানেরা বাধ্য হইয়া প্রণামী দেয়; কোন কোন স্থলে ব্রাহ্মণের বাড়ীর প্রতিমার সম্মুখে মাতব্বর মাতব্বর শূদ্রেরা প্রণামী দিয়া প্রণাম করে।

দ্বিতীয় কল্প।

নারী-নিগ্রহ।

ঠাকুরের শিষ্যযজমান অনেক, কিন্তু ঠাকুরের মুখে সর্ব্বক্ষণ হাহারব;—সর্ব্বদাই অভাব। স্বচ্ছলে দিন গুজরাণ হইতেছে, এমন কথা তাঁহার মুখে কেহ কোন দিন শুনিতে পায় না। কষ্ট জানাইয়া বিমর্ষবদনে সকলের কাছেই তিনি বলেন, "দিন চলা ভার! অতগুলি পরিবার পালন করা আমার অসাধ্য! যাহা কিছু আনি, কিছুতেই কুলায় না।" লোকেরা চুপ করিয়া শুনিয়া যায়, কেহই কিছু বলে না। একদিন একজন মুখফোড় স্পষ্টবক্তার খর্পরে পড়িয়া ঠাকুর বড় লজ্জা পাইয়াছিলেন। সেই মুখফোড় লোকটি পূর্ব্বোক্ত কালীবাড়ীর পূজক। ঠাকুর তাহার কাছে কাঁদুনী গাহিয়া বলিতে শুরু করিয়াছিলেন, "কিছুতেই আমার কুলায় না।" শুনিবামাত্র পূজক ব্রাহ্মণ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কুলাবে কিসে?—ও সকল ফাল্‌তো কাঁদুনী আমি শুন্‌তে চাই না। জানো সব, বোঝ সব, মনে মনে আছে সব, কাজের বেলা ন্যাকা হও। কুলাবে কিসে? যা কিছু পাও, ব্রাহ্মণীর পাদপদ্মে অঞ্জলি দাও, তার কিছু নিকাস রাখ কি? পরকে দাও না, নিজের পত্নীকে দাও, ভালই কর; পত্নী, অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী, মন্ত্রপূতা সহধর্ম্মিণী, সংসারের সর্ব্বময়ী গৃহিণী, উপার্জ্জিত অর্থ তাঁর হাতে না দিয়া আর কার হাতে দিবে?—দাও, বেশ কর।—কিন্তু গৃহিণীটী সর্ব্বগ্রাসিনী, হিতা-

হিত বিবেচনাশক্তি বড় কম। তুমি হয় ত মনে কর, আমি কালীমন্দিরের এককোণে বোসে থাকি, সর্ব্বক্ষণ কেবল পাঁজি-পুঁথি পড়ি, গ্রামের কোন খবর রাখি না; তা নয় দাদা,—সব খবর আমি রাখি। ঠাকুর! তোমার ব্রাহ্মণীটী বিষম কঞ্জুসী, কোন্‌গুলি ন্যায্য, কোন্‌গুলি বাজে খরচ, সেটা তিনি বিবেচনা করেন না। বাজে খরচ দূরে থাক, যেগুলি না হলে নয়, সেই পক্ষেই তাঁর বেশী আঁটাআঁটি। তিনি কেবল জমা ভালবাসেন আর ঝগ্‌ড়া কলহ ভালবাসেন;—যত টাকা তাঁর কাছে জমা হয়, সে টাকাগুলি সিন্দুকের ভিতর থেকে তোমার মুখপানে একবারও উঁকি মেরে চাইতে পায় না;—আমি শুনেছি, মাসে মাসে তিনি বাপের বাড়ীতে বড় বড় হুণ্ডি পাঠান; তোমার সংসারের দিকে, তোমার ভাল মন্দের দিকে, আসলে তাঁর নজর নাই। তুমি নারীদাস,—অত্যন্ত নারীদাস; সেই জন্যেই সর্ব্বদা হাহা কোরে বেড়াও, মুখ ফুটে কিছুই বল্‌তে পার না;—পেট ভরে খেতে পাও না, তা পর্য্যন্ত আমি শুনেছি। ভিখারিরা মুষ্টি ভিক্ষা পায় না, গিন্নীর গালাগালি খেয়ে, গালাগালি দিয়ে ফিরে যায়। সংসারে এ সব ভারি অলক্ষণ। রাগ করোনা ভাই, গিন্নীটী তোমার অলক্ষণা;—মূর্ত্তিমতী অলক্ষণা। মুখে কেবল "নেই নেই নেই নেই" শব্দ। অনেক স্ত্রীলোকের মুখে আমি শুনেছি, তোমার গৃহিণীর মুখে কেহ কখন হাসি দেখ্‌তে পায় না;—সর্ব্বদাই যেন মুখখানি রাগ-রাগ—ভার ভার, সর্ব্বদাই রক্তমুখী; রাগের রঙে মুখখানি যেন মাখা। সে রকম মুখ দেখ্‌লে মা লক্ষ্মী ভয় পেয়ে ছুটে পালান। যে সংসারে স্ত্রী-লোকেরা কর্ত্তা, সে সংসারের ঐ রকম দশা হয়। তবে হাঁ, স্ত্রী

যদি মঙ্গলা হয়, ধর্ম্মশীলা হয়, শিক্ষিতা হয়, মিষ্টভাষিণী হয়, হাস্যমুখী হয়, একান্ত পতিরতা হয়, তাহার যদি ভাল মন্দ বিবেচনা-শক্তি থাকে, তা হ'লে তার হাতে কর্ত্তৃত্ব দেওয়াতে কোন দোষ ঘটে না, তাদৃশী গুণবতী স্ত্রীর অধিষ্ঠানে সংসারের সকল দিকে মঙ্গল হয়ে থাকে। তোমার ব্রাহ্মণীর মতন দুঃশীলা, মুখরা, স্বার্থপরায়ণা, কুলক্ষণা স্ত্রীর অধিষ্ঠানে কদাচ তুমি সুখী হ'বার আশা কত্তে পার না; তাদৃশী স্ত্রীর পরামর্শ নিয়ে কাজ করা, তাদৃশী স্ত্রীকে ভয় করা, তাদৃশী স্ত্রীর অনুগত হয়ে থাকা তোমার মস্ত ভুল। শাস্ত্রেই আছে, "স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।" স্ত্রী-জাতির পরামর্শে যাহারা বিষয়-কর্ম্ম করে, তাহাদের সর্ব্ব-কর্ম্ম বিফল হয়। তবে যে সকল বুদ্ধিমতী রমণীর সুবুদ্ধি সৎপথে যায়, সে সকল রমণীর সৎপরামর্শ কল্যাণকর হয়ে থাকে। তোমার ব্রাহ্মণীর বুদ্ধি অবশ্যই আছে, কিন্তু সে বুদ্ধি সৎপথে ফেরে না; তা তুমি জানো, নিত্য নিত্য ভুগ্‌ছো, তথাপি সেই ব্রাহ্মণীকে ভয় কর। তাই জন্ম বল্‌ছি, তুমি একান্ত নারীদাস। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মাত্রেই স্ত্রীবাধ্য, এই একটা দুর্নাম আছে। কথাটা সত্য হইতে পারে; কিন্তু আমিও ত একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত, আমি কখন তোমার মতন তেমন দুষ্ট নারীর আজ্ঞাকারী হয়ে থাকি না।"

জনার্দ্দনঠাকুর এতক্ষণ মুখ বুঁজিয়া পূজকঠাকুরের দীর্ঘ বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছিলেন, আর শুনিতে পারিলেন না; মনে বড় কষ্ট হইল, কার্য্য আছে বলিয়া, একটী হাই তুলিয়া, শীঘ্র শীঘ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বক্তাকে নমস্কার করিয়া বিমর্ষবদনে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, জনার্দ্দনের মুখের মত ম্লানমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিতেছিলেন, কত কি ভাবিতে ভাবিতে জনার্দ্দন ঠাকুর মন্থরপদে নিজালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠিক সেই সময়ে সূর্য্যাস্ত। সময় গোধূলি। গ্রামে চতুর্দ্দিকে শঙ্খধ্বনি আরম্ভ হইল, সেই ধ্বনি শ্রবণে জনার্দ্দনের বুকের ভিতরে যেন বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। যে সকল যজমানের বাড়ীতে নারায়ণশিলা অথবা দেববিগ্রহ আছেন,নিত্য সন্ধ্যাকালে জনার্দ্দনকে সেই সকল বাড়ীতে আরতি করিতে যাইতে হয়, সে দিন তাঁহার মন ভাল ছিল না, অসুখ বোধ হইতেছিল, কোন জায়গায় যাইতে মন সরিল না। যে দুটী পুত্র বড় বড়, সেই দুটীকে ডাকিয়া, নিজের অসুখ জানাইয়া, তাহাদের প্রতি আরতি সমাধার ভার দিলেন।

জনার্দ্দনের পুত্রেরা উচিতমত শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই; উপনয়নের পর কিছুদিন দশকর্ম্মের পুঁথিগুলি নাড়াচাড়া করিয়াছিল, এখন আর সে সকল পুঁথি ভ্রমেও স্পর্শ করে না,বিশেষ কোনরূপ কাজ-কর্ম্মও করে না; বৈকালে প্রতিবাসীদের বাড়ীতে গিয়া তাস খেলে, গল্প করে, পরনিন্দা করে, তবলা বাজায়, গান গায়, তামাক খায়, গ্রীষ্মকালে ও বর্ষাকালে একএকদিন মাল-মশলা লইয়া অন্য লোকের পুকুরে পুকুরে মাছ ধরিতে যায়। যেদিন যেদিন মাছ ধরে, সেই সেইদিন সন্ধ্যাকালে ঘরে আসে, অন্যান্য দিন রাত্রি চারি দণ্ড, ছয় দণ্ড, কোন কোনদিন একপ্রহর পর্য্যন্ত বাহিরে বাহিরে কাটায়। তাহারা পিতার অবাধ্য; কিন্তু কি ভাগ্য,—সেদিন বিনা বাক্যব্যয়ে পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিল; আরতি করিবার জন্য দুই ভাই দুই দিকে চলিয়া গেল।

বাড়ীর ভিতর হইতে একটী প্রদীপ জ্বালিয়া আনিয়া জনার্দ্দন ঠাকুর বাহিরের ঘরে একটী পিল্‌সুজের উপর রাখিলেন, অনন্তর পদপ্রক্ষালন করিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, খড়ম পায়ে দিয়া, দুর্গানাম করিতে করিতে গৃহ মধ্যে প্রবেশিলেন; ঘরের একটী কুলুঙ্গিতে কোশাকুশী ছিল, দেয়ালে বংশদণ্ডে একখানি কুশাসন ছিল, আসনখানি পাড়িয়া, ঘরের একধারে পাতিয়া বসিয়া, সন্ধ্যাবন্দনা করিলেন, তাহার পর সন্ধ্যা সন্ধ্যা বলিয়া দুইবার ডাকিয়া বিছানার উপর বসিলেন।

ঠাকুরের যে দুটী বিধবা কন্যা বাড়ীতে আছে, তাহাদের মধ্যে একটীর নাম সন্ধ্যালতা। পিতার আহ্বানে সন্ধ্যালতা বাহিরে আসিয়া, মস্ত একটা ডাবা হুঁকায় তামাক সাজিয়া দিল, আসন ও কোশাকুশী যথাস্থানে তুলিয়া রাখিয়া, পিতার দিকে চাহিতে চাহিতে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল, একটু পরে আবার আসিয়া একধামী মুড়ি, একটু গুড়, এক ঘটী জল, আর ছোট একটী পাথরবাটিতে একটী পান বিছানার ধারে রাখিয়া, ঘরের দেয়াল ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; পিতার জলযোগ শেষ হইলে আর এক ছিলিম তামাক সাজিয়া দিয়া, পাত্রগুলি লইয়া থম্‌কে থম্‌কে প্রস্থান করিল; পিতা যদি আরো কিছু বলেন, তাহাই ভাবিয়া, থম্‌কিয়া থম্‌কিয়া যাওয়া।

ঠাকুর মহাশয় চিন্তাকুলচিত্তে তামাক খাইতেছেন, এমন সময় তিনটী লোক সেই ঘরে উপস্থিত। একজন প্রাচীন ব্রাহ্মণ আর দুইজন অর্দ্ধবৃদ্ধ তন্তুবায়। ব্রাহ্মণটী ঠাকুরের বিছানায় বসিলেন, ঘরের এককোণে একখানা কম্বল ছিল, ঠাকুরের অনুমতিক্রমে সেই কম্বলখানা পাতিয়া তন্তুবায়েরা বসিল। ব্রাহ্মণের

নাম রামজীবন সমাদ্দার, তন্তুবায়দ্বয়ের একজনের নাম বংশীধর, দ্বিতীয় জনের নাম পদ্মলোচন; তাহাদের উভয়ে খুড়া-ভাইপো সম্বন্ধ। তাহারা জনার্দ্দন ঠাকুরের যজমান।

বঙ্গের অন্যান্য স্থানের তাঁতিদের ন্যায় পরমহংসপুরের তাঁতিরাও গরিব হইয়াছে। পদ্মলোচনের পিতৃদায়; শ্রাদ্ধের আর পাঁচটী দিন বাকী। জনার্দ্দন ঠাকুর যত টাকা দক্ষিণা দাবী করিয়াছেন, পদ্মলোচন তাহা প্রদানে অক্ষম; কাঁদিয়া কাটিয়া সেই দাবীটা কমাইবার অভিপ্রায়ে পিতার সহোদরকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে, রামজীবন সমাদ্দার মধ্যস্থ হইয়া আসিয়াছেন।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া, গলার কাচা দুই হাতে টানিয়া ধরিয়া, কাঁদ-কাঁদমুখে পদ্মলোচন বলিল, "ঠাকুর! তত টাকা আমি কোথা থেকে দিব? অবস্থা তো আপনি সব জানেন, দুই বেলা অন্ন জোটে না, পরিবার অনেকগুলি। পিতৃদায়, যেমন কোরে হোক্ উদ্ধার হতেই হবে; তিন বিঘা ধানজমী বন্দক দিয়েছি, তাতে পেয়েছি পঞ্চাশ টাকা, আর গরজে প'ড়ে চব্বিশ টাকায় বড় বড় দুটো তেঁতুলগাছ বেচে ফেলেছি, তাই আমার সম্বল; নমো নমো তিলকাঞ্চন কোরে শুদ্ধ হবো, এই আমার ভরসা; আপনি যা চান তা আমি কোথা পাব? গুরু-পুরুতেরা শিষ্ট যজমানের মা-বাপ, আপনি আমার মা-বাপ, গরিব সন্তান ব'লে দয়া করুন। ধার-কর্জ্জ কোরে আমি বড় জোর পাঁচটী টাকা দিতে পারি।"

পদ্মলোচনের খুড়া বংশীধর সেই বাক্যে সায় দিল; উঠিয়া গিয়া, ঠাকুরের দুই পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া কাতরে বলিতে লাগিল, "পদ্মলোচনের একটী কথাও মিথ্যা নয়, গরিবের প্রতি

আপনি দয়া করুন;—তিলকাঞ্চনের শ্রাদ্ধে পঁচিশ টাকা দক্ষিণা!—"

শেষ কথা না শুনিয়া রুক্ষকণ্ঠে গর্জ্জিয়া জনার্দ্দন বলিলেন, "তিলাকাঞ্চন তিলাকাঞ্চন আমি বুঝি না, পঁচিশ টাকা না হোক্, কুড়ি টাকার এক পয়সা কমে হবে না,—সাফ্ কথা।"

এইবার মধ্যস্থ মহাশয় মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক হস্ত বিস্তার করিয়া জনার্দ্দনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভায়া হে! ঝোপ বুঝে কোপ দিও, সানকীর উপর বজ্রাঘাত কেন? পাঁচ টাকা ওরা দিতে চাচ্ছে, তুমি না হয় তার উপর—"

কথা হইতেছে, এমন সময় সিদ্ধেশ্বর আসিয়া ম্লানবদনে ঘরের দরজার এক পাশে দাঁড়াইল। জনার্দ্দনের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম সিদ্ধেশ্বর। এই বৎসর সিদ্ধেশ্বরের উপনয়ন হইয়াছে, মাথায় এখনও বেশী চুল বাহির হয় নাই, কর্ণবেধের কর্ণসূত্র এখনও মাঝে মাঝে নূতন ছিদ্রের রক্তরসে সিক্ত হয়। জনার্দ্দন সেই পুত্রটীকে বেশী ভালবাসেন। স্নেহাস্পদ পুত্রের ম্লানবদন দর্শন করিয়া শশব্যস্তে সস্নেহবচনে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বাবা! মুখখানি মলিন কেন বাবা! চা খাওয়া হয় নি কি?"

সিদ্ধেশ্বর উত্তর করিল, "আজ্ঞে, চা আমি অনেকক্ষণ খেয়েছি।"

জনার্দ্দন পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তবে এখানে কেন এসেছ?—আমাকে দেখ্‌তে?—এই তো দেখা হলো; যাও বাবা, ব্যাকরণখানি নিয়ে কালকের মতন সন্ধি-সমাস অভ্যাস করো গে।—দাঁড়িয়ে রইলে যে?"

নতমুখে মৃদুস্বরে সিদ্ধেশ্বর বলিল, "আজ্ঞে - তেল নেই। মার কাছে একটা পয়সা চাইলুম, মা দিলেন না,—বল্লেন, আজ আর পড়াশোনা হবে না।"

ভট্টাচার্য্য অবাক!—বালকের কথা শুনিয়াও বটে, তিনজন অপর লোকের সম্মুখে সেরূপ কুৎসিত কথা শুনিতে হইল, সে অপমানেও বটে,—ভট্টাচার্য্য অবাক! কালীবাড়ীর পূজক ব্রাহ্মণের অনেক কথা মনে পড়িল, ব্রাহ্মণীর প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিল;—নামাবলীর খুঁট হইতে দুটী পয়সা বাহির করিয়া বালকের হাতে দিয়া নম্রস্বরে বলিলেন, "যাও বাবা,—তেল আনো গে—দিদিকে একটু দাঁড়াতে বোলো।"

পূর্ব্বে বলিতে ভুল হইয়াছে, গ্রামের হাটখোলা ভিন্ন গ্রামের মধ্যে মধ্যে এক একটা পল্লীতে এক একখানা মুদীর দোকান আছে। সকল পল্লীতে নাই। জনার্দ্দন ঠাকুরের বাড়ীর নিকটেও একখানা মুদীর দোকান ছিল।

সিদ্ধেশ্বর তেল কিনিতে গেল। অবসর পাইয়া রামজীবন সমাদ্দার পূর্ব্বকথার ধূয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "পাঁচটাকা ওরা দিতে চাচ্ছে, তুমি না হয় তার উপর আর এক টাকা ধোরে নিও। তোমারও জেদ বজায় হবে, ওদেরও গায়ে লাগ্‌বে না। একেই বলে কাজীর বিচার। কেমন,—কি বলো?"

মাথা হেঁট করিয়া, খানিকক্ষণ চিন্তার পর মাথা তুলিয়া, মুখে একটু হাসি আনিয়া, জনার্দ্দন বলিলেন, "কাজীসাহেব যখন অনুরোধ কচ্চেন, তখন আর তুচ্ছ টাকার জন্য বৃথা বাগ্‌-বিতণ্ডা করা ভাল দেখায় না। আচ্ছা, কুড়ি টাকার জায়গায়

দশ টাকা। এ কথার উপর কিন্তু আর দোস্‌রা কথা চল্‌বে না। কি বল সমাদ্দার দাদা?—আমার এই বিচারটাই যথার্থ কাজীর বিচার।"

দশ টাকাতেই রফা। ঠাকুরের পায়ের নিকট হইতে উঠিয়া বংশীধর সেই কম্বলে গিয়া বসিল; অন্য কথা চলিতে লাগিল। আধ ঘণ্টা পরে বংশীধর ও পদ্মলোচন বিদায় লইল। প্রণাম করিতে পারিল না;—মৃতাশৌচ।

তাহারা বিদায় হইবার পর জনার্দ্দন ডাকিলেন, "সন্ধ্যা!" রামজীবনের মুখপানে চাহিয়া তিনি বিকটমুখে বলিলেন, "বংশে বেটা ভারি বেয়াদব! অশুধ গায়ে ছুঁয়ে গেল!"

কন্যাকে আহ্বান করা হইয়াছে, রামজীবন রহিয়াছেন, সেজন্য তাহার আসিতে লজ্জা হইবে, এমন কোন কারণ ছিল না। পাড়ার লোক রামজীবন;—জনার্দ্দন তাঁহাকে দাদা বলেন, ছেলে-মেয়েরা সেই সম্পর্কে রামজীবনকে জ্যেঠামশাই বলে, লজ্জা করিবার কোন কারণ নাই।

সন্ধ্যালতা আসিয়া উপস্থিত। পিতার মুখপানে চাহিয়া স্নেহময়ী কন্যা স্নেহের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বাবা! কেন ডাক্‌ছেন?—তামাক দিব?"

জনার্দ্দন বলিলেন. "হাঁ. সেটাও একবার চাই বটে; জীবন দাদা অনেকক্ষণ এসেছেন, তাঁতিদের গণ্ডগোলে একবারও তামাক দেওয়া হয় নি; একটু পরে দিও। এখন আমাকে একখানা কাপড় এনে দাও; এখুনি আমাকে কাপড় ছাড়্‌তে হবে; একটা তাঁতি আমাকে অশুধগায়ে ছুঁয়ে গেছে।"

নীচমুখে মৃদু হাসিয়া সন্ধ্যালতা বাড়ীর ভিতর গেল, এক-

খানি রাত্রিবাস কাপড় আনিয়া দিল, শুদ্ধাচারী ভট্টাচার্য্য কাপড় ছাড়িয়া শুচি হইলেন। একছিলিম তামাক সাজিয়া দিয়া, ছাড়া কাপড়খানি লইয়া, সন্ধ্যালতা প্রস্থান করিল।

কন্যার প্রস্থানের পর জনার্দ্দন ঠাকুর নিজে দুই তিন টান টানিয়া, হুঁকাটি রামজীবনের হস্তে দিলেন। তামাক খাইতে খাইতে রামজীবন বলিলেন, "ভায়া! তোমাকে একটী কথা বল্‌তে চাই;—মনে কিছু করোনা!—গৃহীলোকের পক্ষে সেটা বিশেষ দরকারী কথা। ছেলেটী এলো, তার সঙ্গে তুমি যে রকম সম্ভাষণ কোল্লে, শুনে আমার হরিভক্তি উড়ে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণের ছেলে, ব্যাকরণ পড়ে, পৈতে হয়েছে, বল্‌তে গেলে এখনও নবীন ব্রহ্মচারী; তারে তুমি আগে ভাগে জিজ্ঞাসা কোরে বস্‌লে, চা খাওয়া হয়েছে কি না?—সন্ধ্যাহ্নিক হয়েছে কি না, সে কথাটা আসলে জিজ্ঞাসা কোল্লে না। তোমার মতন বাপ এ দেশে এখন অনেক হয়েছে। তোমাদের দোষেই ত দেশের ধর্ম্মকর্ম্ম ক্রমশ লোপ পেয়ে আস্‌ছে; কিছুদিন পরে কিছুই থাক্‌বে না। তোমরা হচ্ছ ভট্টাচার্য্য, লোকের বাড়ীর পুরোহিত, লোকের বাড়ীর গুরু, তোমরাই আগে ভাগে কুকর্ম্মের পথ দেখাও, তার পর সমস্ত ভেড়ার দল মাথা গুঁজিয়া তোমাদের অনুগামী হয়। তোমরাই সব রকম পাপ কর, অপর লোককেও পাপকর্ম্ম শিখাও। কেন না, দেখা দেখি কাজ করা অনেক লোকে ভালবাসে;—ভাল মন্দ বিচার করে না, সেই জন্য বল্‌ছি, গুরু পুরোহিত হয়ে তোমরাই পাপকার্য্যের গুরু হও। নিজে নিজে সব কর,—সজ্ঞানে ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপ কর;—দোষ দাও কলিযুগের!—কলিযুগের কি দোষ?—কলি আবার

কে?—তোমরাই ত মূর্ত্তিমান কলি!—নবমবর্ষীয় নবীন ব্রহ্ম-চারীকে তুমি সন্ধ্যাকালে চা খাবার কথা জিজ্ঞাসা কোল্লে, সন্ধ্যা-গায়ত্রীর কথা একটীবার মুখেও আন্‌লে না। ছেলে প্রশ্রয় পেয়ে গেল। এরকম ছেলে কি এর পর আমাদের ঠাকুর দেবতা মান্‌বে?—পিঁপুল পাক্‌লে কি আর ও রকম ছেলেরা স্বধর্ম্মের তন্ত্রে মন্ত্রে—স্বধর্ম্মের ক্রিয়া-কলাপে একটুও বিশ্বাস রাখ্‌বে?—কখনই না—কখনই না। কেবল সকাল সন্ধ্যা চা খেয়ে খেয়ে খোস্‌মেজাজী হয়ে যাবে।"

বৈকালে কালীমন্দিরে এক রকম লাঞ্ছনা, রাত্রিকালে নিজের বাড়ীতে আর এক রকন লাঞ্ছনা, দুই প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া, জনার্দ্দন ঠাকুর নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইলেন;—কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "ঢের কথা বোল্‌ছো দাদা, ঢের কথা বোল্‌ছো। কথাটা কি জান,—ছেলেবেলা থেকে একটু একটু চা খাওয়া অভ্যাস, যে দিন না খায়, সেই রাত্তিরে ছেলেটার অসুখ হয়। অতি শিশুকালে বেজায় শ্লেষ্মার ধাত ছিল,—নিত্যই সর্দ্দিকাশী, নিত্যই শ্লেষ্মার রোগ। ছেলের যখন দু-বছর বয়েস, সেই সময় একবার সঙ্কট রোগ হয়েছিল,—যায় যায় এমনি অবস্থা,—গ্রামের কবিরাজেরা কিছু কত্তে পার্‌লে না, কোম্পানীর ডাক্তারও হেরে গেল;—আমি হতাশ হয়ে পড়্‌লুম। ভগবানের ইচ্ছায় সেই সময় ও পাড়ার জান্‌কী-বাবুদের বাড়ীতে কলিকাতা থেকে একজন ভাল ডাক্তার এসে-ছিলেন, তাঁকে এনে দেখাই, তিনি ওষুদের ব্যবস্থা কোরে দেন, সেই ওষুদেই ছেলেটী আরাম হয়। সেই ডাক্তারটী ব'লে গিয়ে-ছিলেন, রোজ রোজ একটু একটু চা খেলে ধাতটা গরম

থাক্‌বে।—সেই অবধি দুই বেলা চা খাওয়া অভ্যাস।—আমি খাই না,—জন্মেও কখন চা ছুই নাই, চা নামে একটা জিনিষ আছে, তাও জান্‌তুম্ না,—এখন জান্‌তে পাচ্চি। ঐ ছেলেটী একাই একটু একটু চা খেতে শিখেছিল। এখন আরো সুবিধে হয়েছে;—দাদারা চা খাওয়া ধরেছে,—বউ দুটীও দুটি বেলা বাটি বাটি চা খায়; ওরা পাঁচজনেই খায়, আমি কিন্তু ছুঁই না।"

হাসিয়া রামজীবন বলিলেন, "খুব বাহাদুর তুমি! চা খেয়ে যে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়;—না খেলে যে মানুষ মরে, এমন কোন কথা নাই। ওরা খেতে শিখেছে, থাক; সে কথা বল্‌ছি না—চা খায় ব'লে যে ব্রাহ্মণের ছেলে সন্ধ্যে আহ্নিক বর্জ্জিত হবে, সে কথাটা কি ভাল ভায়া?"

অপ্রস্তুত হইয়া জনার্দ্দন বলিলেন, "আজ আমি জ্ঞান পেলেম, এখন অবধি সে বিষয়ে খুব কড়াকড়ি রাখ্‌বো, ভুল্‌বো না। ছেলেরা সন্ধ্যাহ্নিক করে কি না, সেটা আমি দেখি না; করে, এই জানি। এখন অবধি কাছে বসিয়ে পরীক্ষা কর্‌বো।"

রামজীবন বলিলেন, "তাই করাই উচিত; ছেলেপুলে যদি গোড়া থেকে বিগ্‌ড়ে যায়, তাদের আর সুপথে বাগিয়ে আন্‌বার উপায় থাকে না। স্বধর্ম্মের সংদৃষ্টান্ত দিন দিন অল্প হয়ে আস্‌ছে, শীতকালে যেমন দিন ছোট হয়, অধার্ম্মিক লোকের চক্ষে আমাদের হিন্দুধর্ম্মও সেইরূপ ছোট দেখাচ্ছে; এই ধর্ম্মের উপর কত বড় বড় আঘাত হয়ে গেছে, তা হয় তো তুমি শুনে থাক্‌বে;—বুদ্ধদেবের আঘাত, মহম্মদের আঘাত, যিশুখৃষ্টের চেলাদের আঘাত, কেশবসেনের চেলাদের ছোট ছোট আঘাত;

এত আঘাত সহ্য ক'রেও হিন্দুধর্ম্ম এখন খাড়া আছে,—গোড়া বড় শক্ত, সেই জোরেই টেঁকে আছে, তা নইলে থাক্‌তো না। এমন দুর্দ্দিনে তোমাদের মত লোকেরা বাড়ীর ভিতর যদি ছেলে-পিলেকে ধর্ম্মশিক্ষা না দেয়, তা হলে অল্পদিনের মধ্যেই হিন্দুধর্ম্ম কেবল নাম মাত্র সার হবে। ইংরিজীপড়া ছেলেরা ত এখুনিই আমাদের ধর্ম্মের কথায় নাক মুখ বাঁকায়, গোটা কতক সাদা-চুল এদেশ থেকে তফাৎ হয়ে গেলেই একেবারে তারা খিঙ্গী পদ পাবে। ভরসা ছিল, মেয়েদের উপর,—হিন্দুর মেয়েরা সদা সর্ব্বদা ধর্ম্মকর্ম্মরতা; ফিরিঙ্গী সাহেবেরা ঠাঁই ঠাঁই মেয়েস্কুল খুলে সে দফাও নিকেশ কোরে আন্‌ছে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, ছোট ছোট মেয়েরা স্কুল থেকে ফিরে এসে, কচি কচি নাকের ছোট ছোট নোলক নেড়ে নেড়ে, মায়ের কাছে যিশুখৃষ্টের গীত গায়! সাবধান ভায়া, সাবধান!—বড় দুর্যোগ।—খবরদার, খবরদার, খবরদার! কদাচ গোড়া আল্‌গা রেখ না। আজ তবে আমি আসি, রাত্তির অন্ধকার, পথেও বন জঙ্গল, সাপ খোপ আছে, শেয়াল কুকুর আছে, গাঁয়ের ভিতর রেতের বেলা পথ চল্‌তে ভয় করে। এখন আমি চোল্লেম; আমার কথাগুলো মনে রেখ,—ভুল না।"

সমাদ্দার মহাশয় বিদায় হইলেন। জনার্দ্দন ঠাকুর প্রদীপ নিবাইয়া হুঁকাটি হাতে করিয়া ঘরের দ্বারে চাবি দিয়া, নানা-খানা ভাবিতে ভাবিতে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। খড়মের খটাখট্ শব্দ শুনিয়া বাড়ীর মেয়েরা আপনাদের খোস-গল্পের মজলিস্ ভাঙ্গিয়া গায়ে মাথায় কাপড় দিয়া অন্যান্য গৃহ-কার্য্যে ব্যাপৃতা হইল।

রামজীবন সমাদ্দার মেয়েস্কুলের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন, পরমহংসপুরে মেয়েস্কুল আছে। গ্রাম্যলোকের উপকারে সাহেবলোকের গুণে ঘাট্‌ নাই। পরমহংসপুরে একটী বঙ্গবিদ্যালয়, একটী বালিকাবিদ্যালয়, একটী দাতব্য ঔষধালয়, একটী ডাকঘর, চৌকিদারী ট্যাক্‌সের দারোগার একটী আফিসঘর, আর বড়রাস্তার ধারে পুলিস দারোগার একটী থানা আছে। ইংরাজী-স্কুল হয় নাই, হইবারও বড় দেরি নাই;—জনকতক যুবক কলিকাতার স্কুলের কর্ত্তাদের কাছে ঘন ঘন দরখাস্ত ঝাড়িতেছে।

তৃতীয় কল্প।

পলায়ন,—মরণ,—নির্ব্বাসন।

একটী গুহ্যকথা এইখানে বলিয়া রাখি। বলা হইয়াছে, জনার্দ্দন ঠাকুরের তিন কন্যার মধ্যে দুই কন্যা বিধবা; বড়টীর নাম সন্ধ্যালতা, মেজটীর নাম স্নেহলতা। অল্পবয়সে বিধবা হইলে মেয়েদের প্রাণে কোন সুখ থাকে না; জনার্দ্দনের বিধবা কন্যা দুটী সংসারের কাজকর্ম্ম করে, পাঁচজনের সঙ্গে গল্পগাছাও করে, কিন্তু হৃদয় ম্রিয়মান্, বিধবা হইলেও মনে এক এক সময় এক একটা সাধ হয়, এক একটা জিনিস কিনিতে ইচ্ছা হয়, এক একদিন বৈকালে ক্ষুধা পায়, এক আধটী গুড়ের নাগরী কিনিয়া রাখিবে, ঘরে মুড়িভাজা হইলে মুড়ি দিয়া খাইবে, এইরূপ মনে করে; হাতে কিন্তু পয়সা আইসে না; সংসারের গতিক যেরূপ, তাহাতে মেয়েদের আশা মনেই মিলাইয়া যায়; গর্ভধারিণীর কাছে একটী পয়সা চাহিলে ঝঙ্কারের দাপটে মেদিনী কাঁপিয়া উঠে। একটা কিছু উপায় চাই;—সন্ধ্যালতা ভাবিল, একটা কিছু উপায় চাই। বাবুদের যেমন পকেট খরচ থাকা আবশ্যক, মেয়েদেরও সেইরূপ কিছু কিছু নিজ খরচ হাতে রাখা দরকার, এ কথাটা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না, অন্যায় বলিতে পারিবেন না।

সন্ধ্যালতার বয়ঃক্রম প্রায় অষ্টাদশ বর্ষ, স্নেহলতার বয়ঃক্রম

কিছু কম পঞ্চদশ বর্ষ; উভয়েই লেখা-পড়া জানে। অল্পমূল্যে কিছু কিছু বিদ্যা বিক্রয় করিয়া যদি কিছু সংস্থান করা যায়, মাঝে মাঝে সন্ধ্যালতার মনে এইরূপ কল্পনার উদয় হয়। এক-বৎসর পূর্ব্বে কল্পনাদেবী সন্ধ্যালতাকে প্রসাদ দান করিয়াছেন, আশালতার গুটিকতক সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিয়াছে। অপ্রকাশ্য-রূপে সন্ধ্যালতার একটী চাকরি হইয়াছে।

গ্রামের সদেগাপবাসিন্দাগণের মধ্যে জনকতক সদেগাপ প্রচুর ধনশালী, পাঠক মহাশয় একথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছেন। ধনবান সদেগাপের বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রেরা বাবুনামে বিখ্যাত। তাহাদের বাড়ীর মেয়েরা লেখাপড়া শিখিতে চায়, বাড়ীর কর্ত্তারা হয় ত মানের খাতিরে আপনাদের মেয়েগুলিকে খৃষ্টানীস্কুলে পাঠাইতে নারাজ। মেয়েরা কিন্তু আবদার ছাড়ে না।

সেই সকল ধনবান সদেগাপ নিশ্চয়ই জনার্দ্দন ঠাকুরের শিষ্য। এক বাড়ীর গৃহিণী একটী গুরুকন্যাকে নিজ কন্যা-গণের শিক্ষয়িত্রী মনোনীত করেন। কথাটা কিন্তু গোপনে থাকে। সন্ধ্যালতা বেড়াইতে যাইবার নাম করিয়া সেই শিষ্যের বাড়ীতে গতিবিধি করে, পাঁচটী মেয়েকে প্রথমভাগ বর্ণপরিচয় পড়াইতে সুরু করে; দুই এক মাসের মধ্যে নিকটস্থ অন্যান্য বাড়ীর বিশ পঁচিশটী বালিকা সেইখানে জমা হয়। সন্ধ্যালতা সেইখানে এক রকম ছোটখাটো পাঠশালা ফাঁদিয়া বসিয়াছে। মাসে মাসে পাঁচ ছয়টাকা আয় হইতেছে। গোপনে গোপনে এক বৎসর এই কার্য্য চলিতেছে। বাড়ীর লোকেরা আসল কথা কিছু জানে না;—মেয়ে বেড়াইতে যায়, পাঁচজনের সঙ্গে পাঁচ রকম গল্প করিয়া অন্যমনস্ক থাকে, ইহাই তাহারা জানে।

গুরুকন্যা সন্ধ্যালতা গুপ্তপাঠশালার ছাত্রীদের মুখে মিষ্ট-কথায় গুরু-মা। গুরুকন্যা গুরু মা হইবে, বিচিত্র কথা নয়। গুরু-মা নিত্য নিত্য ছাত্রীগুলিকে বিদ্যা শিক্ষা দেয়। ছাত্রীগুলি বালিকা, প্রথমে এই কথা বলা হইয়াছে, বাস্তবিক কিন্তু বালিকা-গুলির মধ্যে পাঁচ সাতটি অঙ্কুর-যৌবনা ও পূর্ণ-যৌবনা কুলবধূ ও কুলকন্যা আছে। গুরু-মা তাহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দেয়, গোপের বাড়ীর দুই একটি যুবাপুরুষও এক একদিন সেই পাঠ-শালার শোভা দেখিতে যায়। ঘনিষ্ঠতায় ঘনিষ্ঠতায় হাস্য-পরি-হাসও বেশ চলে।

এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর, ক্রমে ক্রমে চারি বৎসর পরিপূর্ণ;—সন্ধ্যালতার পাঠশালাটির পঞ্চমবর্ষে প্রবেশ। জননী দেখিতে পান, সন্ধ্যালতার মন যেন কিছু উড়্ উড়্;—অনুমান করেন, জিজ্ঞাসা করেন, ধমক দেন, পাড়াবেড়ান বন্ধ করিতে চান, সন্ধ্যালতা কিছুতেই কথা কয় না। সেই বৎসর সরস্বতী-পূজার রাত্রে শিষ্যবাড়ীতে যাত্রা হইবে; যে বাড়ীতে পাঠ-শালা, সেই বাড়ীতেই যাত্রা। মাতা-পিতার অনুমতি লইয়া, পাঁচ সাতজন প্রতিবেশিনীর সঙ্গে সন্ধ্যালতা যাত্রা শুনিতে গেল, সমস্ত রাত্রি যাত্রা শুনিয়া, পরদিন সকালবেলা ঘরে আসিল। মুখখানি শুষ্ক, চক্ষুদুটি বসা, ঘন ঘন হাই, বড়ই বেয়াড়া। জননী সেই মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্তর তিরস্কার করিলেন, কর্ত্তাকে বলিয়া দিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন, সন্ধ্যালতা অধোবদনে নীরব।

দুই বৎসর পূর্ব্বাবধি সন্ধ্যালতার ভাবান্তর। পাঠশালা স্থাপনের দুইবৎসর পরে শিক্ষাদায়িনী একরাত্রে স্নেহলতার কাছে

গুপ্তবৃত্তান্ত প্রকাশ করে; বৃত্তান্ত শুনিয়া স্নেহলতার আহ্লাদ হয়। তদবধি প্রতি রজনীতে দুটি ভগ্নী এক বিছানায় শুইয়া সেই পাঠশালার কথা আলোচনা করে; পাঠশালে যেদিন যাহা হয়, সন্ধ্যালতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেই কথাগুলি গল্প করিয়া স্নেহলতাকে শুনায়। আমোদ আছে স্থির করিয়া স্নেহলতাও মধ্যে মধ্যে এক একদিন দিদির সঙ্গে শিষ্যবাড়ী বেড়াইতে যায়।

মাঘীপূর্ণিমা-সন্ধ্যালতা যথাসময়ে শিষ্যবাড়ীতে বেড়াইতে গেল, সেখানে "মোচ্ছব" আছে বলিয়া স্নেহলতাকেও সঙ্গে লইল। যে যাওয়া, সেই যাওয়া;—আর তাহারা ঘরে ফিরিল না। উদ্বেগে উদ্বেগে জনার্দ্দনের রাত্রি কাটিল; মহোৎসবে কীর্ত্তনাদি হইবে, সেই জন্য হয় ত আসিতে পারিল না, ইহা ভাবিয়াই ব্রাহ্মণ একটু প্রবোধ মানিয়া রহিলেন; রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল, চারিদণ্ড বেলা হইল, কন্যারা ফিরিল না;—কেমন মা বলা যায় না, ব্রাহ্মণীর মুখে কোন কথা নাই, মনে যেন কোন ভাবনাই নাই, সেইরূপ সুস্থির! ব্রাহ্মণ কিন্তু অস্থির হইলেন;—তাতাতাড়ি নামাবলী লইয়া অন্বেষণে বাহির হইলেন, শিষ্যবাড়ীতে সন্ধান না পাইয়া, গ্রামখানা তিনি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন, অস্নানে অনাহারে বেলা আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিলেন, কোথাও কোন সন্ধান পাইলেন না; অবশেষে মর্ম্মাহত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়া, লেপ মুড়ি দিয়া শয়ন করিলেন। কোথাও পাওয়া গেল না,-স্বামীর মুখে এইটুকু মাত্র শুনিয়া স্নেহময়ী গর্ভধারিণীর তখন একটু ভাবনা হইল, চক্ষুদুটী ছলছল হইয়া আসিল।

সাতদিন পরে প্রকাশ পাইল, ভবসুন্দর নেউগীর বড়ছেলে নিরুদ্দেশ;—মাঘীপূর্ণিমার মোচ্ছবের রাত্রি হইতে আর কেহই তাহাকে দেখিতে পায় না। জনার্দ্দন ঠাকুরের দুটী কন্যা হারাইয়া গিয়াছে, পাড়ার সকল লোকেই তাহা জানিয়াছিল, পাড়ার লোকের মুখে সমগ্র গ্রামের লোকেরাও শুনিয়াছিল; যাহারা চতুর লোক, তাহারা তত্ত্ব কথা বুঝিয়াছিল,—পরস্পর বলাবলি করিয়াছিল, "ভবসুন্দর নেউগীর সেই বদ্‌মাস ছেলেটা—সেই গুলীখোর হরিমাধব নেউগীটা জনার্দ্দন ঠাকুরের মেয়ে দুটোকে নিয়ে দেশ থেকে চম্পট দিয়েছে! গুপ্তচর খবর এনেছে, একেবারে কলিকাতায় নিয়ে হাজির!"

জনার্দ্দনের মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল। আহার নিদ্রা নামমাত্র, দিবা রাত্রি দারুণ চিন্তা, চক্ষে জল নাই, যেন আগুনের উত্তাপে নয়ন বিশুষ্ক, বদন পরিশুষ্ক, সকল কাজেই ভুল;—শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা, গায়ত্রীপাঠ এবং সন্ধ্যাহ্নিকের মন্ত্রেও ভুল হইতে লাগিল। কন্যাদের অনুসন্ধান তখনও শেষ হয় নাই;—যেখানে যেখানে যাইবার সম্ভাবনা, মাসীবাড়ী, পিসীবাড়ী, কুটুম্ববাড়ী, বন্ধুবাড়ী, সর্ব্বত্রই পত্র লেখা হইয়াছে, কোথাও কোন প্রকার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। লোকে বলে, কলিকাতায়;—কলিকাতা সহরে পলাতক আসামী খুঁজিয়া বাহির করা সহজ কথা নয়;—একেবারেই অসাধ্য; পুলিসের পক্ষেও দুঃসাধ্য।

একমাস, দুইমাস, দেখিতে দেখিতে তিন মাস অতীত হইয়া গেল, কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। জনার্দ্দন ঠাকুর প্রায় শয্যাগত। ছেলে দুটী অবাধ্য, তাহাতে আবার মূর্খ, তাহাদের

দ্বারা পিতার ইচ্ছামত কোন কার্য্যই হয় না; তাহারা কেবল ইয়ারকি লইয়াই মত্ত। ছোট ছেলেটি কিছু ভাল।

জনার্দ্দন এখন আর বাড়ীর বাহির হন না, কাহারও সঙ্গে বড় একটা কথা কন না, যজমান রক্ষা কিরূপে হয়? যাহাদের বাড়ীতে নিত্যপূজায় ব্রতী, নিত্য নিত্য তাহাদের বাড়ীতে যাইতেই হয়। জনার্দ্দন নিজে আধমরা, যায় কে? পুত্র দুটীকে ডাকিয়া তিনি যজমান রক্ষার ভার দিলেন। তাহারা যেন দায়ে পড়িয়া নিত্য পূজার ঘরগুলি বজায় রাখিতে লাগিল। মন্ত্র জানুক, না জানুক, ফুল, জল ছড়াইয়া নৈবেদ্য লইয়া আইসে, তাহাই তাহাদের ঠাকুর পূজা। সিদ্ধেশ্বরের বয়স তখন বারো বৎসর, সিদ্ধেশ্বরও দুই তিন বাড়ীতে পূজা করিতে যায়। দিব্য দিয়া তিন পুত্রের প্রতি পিতার একান্ত নিষেধ, তাহারা যেন ভবসুন্দর নেউগীর ভিটায় কদাচ পদার্পণ না করে।

সংসার এক রকম চলিতেছে। জনার্দ্দন ঠাকুর এখন আর রাত্রিকালে বাড়ীর ভিতর শয়ন করেন না, বাহিরের বৈঠকখানাতেই নিদ্রা যান।—নিদ্রা যান কি জাগিয়া থাকেন, কেহই তাহা জানে না। জানে না সত্য কিন্তু অতি অল্পই নিদ্রা, বেশীর ভাগ জাগরণ। সহচরী কেবল চিন্তা-রাক্ষসী।

একরাত্রে জনার্দ্দনের মহা দুঃচিন্তা প্রবলা। কালীবাড়ীর পূজক ঠাকুর ব্রাহ্মণীর গুণ-কীর্ত্তন করিয়া যে সকল শক্ত শক্ত কথা বলিয়াছিলেন, সেই চিন্তা আসিল; পুত্রগণের ধর্ম্মচর্চ্চায় ঔদাস্যের কথা তুলিয়া রামজীবন সমাদ্দার যে সকল বাক্যবাণ ঝাড়িয়াছিলেন, সেই চিন্তা আসিল;—আচম্বিতে

কন্যা দুটী কুলের বাহির হইয়া গিয়াছে, হৃদয়-দগ্ধকারিণী সেই ভয়ঙ্করী চিন্তা আসিয়া স্তবকে স্তবকে হৃদয় দগ্ধ করিতে লাগিল;—একটীবারও চক্ষের পাতা বুজিতে পারিলেন না; ঘরে আলো জ্বালিয়া রাখিয়াছিলেন. আস্তে ব্যস্তে একবার শয্যা হইতে নামিয়া, বালিশের ওয়াড়ের ভিতর হইতে ছোট একটা কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া, সেই আলোর কাছে গিয়া বসিলেন;—কম্পিতহস্তে মোড়কটী খুলিলেন;—মোড়কে যাহা ছিল, ঊর্দ্ধমুখ হইয়া সেই পদার্থগুলি গালে ঢালিয়া দিলেন; জল খাইলেন না, একটী পান খাইলেন;—অকস্মাৎ মুখে এক প্রকার নূতন হাস্যরেখা দেখা দিল;—আর একবার ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া, দুই হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া করুণকণ্ঠে বলিলেন, "তারা!—ত্রাণ কর।"

দীপ নির্ব্বাণ না করিয়াই জনার্দ্দন আবার বিছানায় গিয়া শয়ন করিলেন। গাঢ়নিদ্রা হইল। অনেক দিনের পর সেই রাত্রে জনার্দ্দনের দুর্ব্বল আত্মার কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ।

রজনী প্রভাত। জনার্দ্দন উঠিলেন না। বেলা এক প্রহর, জনার্দ্দন উঠিলেন না। ব্রাহ্মণী আসিয়া ডাকাডাকি করিলেন, উত্তর পাইলেন না; পুত্রেরা আসিয়া জোরে জোরে দ্বারে করাঘাত করিয়া বার বার ডাকিল, কোন সাড়া-শব্দ নাই। দুই চারিজন প্রতিবাসীও আসিয়া উপস্থিত হইলেন; দরজায় ধাক্কা মারিতে মারিতে সকলে একসঙ্গে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিয়া মহা গোলমাল করিলেন, কোন সাড়া-শব্দ নাই। অবশেষে অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলাই সাব্যস্ত করিলেন; দ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলে দেখিলেন, ঘরে

প্রদীপ জ্বলিতেছে, বিছানার উপর জনার্দ্দন ঠাকুর মরিয়া রহিয়াছেন!

সকলে হায় হায় করিতে লাগিলেন। কতিপয় প্রতিবেশিনী গৃহিণী আসিয়া কাঁদুনি গাহিয়া গেলেন, পুত্রেরা কোঁচার কাপড়ে মুখচক্ষু ঢাকিয়া ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া কাঁদিল, অল্পক্ষণ মধ্যেই ক্রন্দন থামিয়া গেল।

সহর হইলে ডাক্তারেরা দেহচ্ছেদ করিয়া মৃত্যুর কারণ অবধারণ করিবার চেষ্টা করিতেন, পল্লীগ্রামে সে প্রকার উপদ্রব নাই, ব্রাহ্মণের দেহ অপর জাতিতে স্পর্শ করিল না, কিন্তু গ্রামের প্রবীণ লোকেরা শরীরের লক্ষণ দেখিয়া বুঝিয়া লইলেন, বিষপানে মৃত্যু।

পাছে কোন প্রকার হাঙ্গামা বাধে, পাছে কোন প্রকার ফ্যাসাৎ উপস্থিত হয়, সেই ভয়ে পুলিসে খবর দেওয়া হইল না; নির্ব্বিঘ্নে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা হইয়া গেল। জনার্দ্দনের ভবলীলা ফুরাইল। একাদশ দিবসে যৎসামান্য আয়োজনে শ্রাদ্ধক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল, ত্রয়োদশ দিবসে পুত্রেরা যথারীতি নিয়মভঙ্গ করিলেন।

সময় কাহারও প্রতীক্ষা করে না। জনার্দ্দন ঠাকুর চলিয়া গেলেন, এক দুই করিয়া ক্রমশ দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, এক মাস অতীত হইল, পুত্রেরা কোন প্রকারে যজমান ঘর রক্ষা করিয়া আসিল, এই রকমে ছয়মাস।

ব্রাহ্মণী দজ্জাল ছিলেন, কিন্তু অসতী ছিলেন না। তাহাকে এগারোটার অধিক একাদশী করিতে হইল না; ছয়মাস পূর্ণ হইবার পাঁচদিন পূর্ব্বে গ্রহণীরোগে তিনি লীলাসম্বরণ করিলেন।

দুটি পুত্র সংসারের কর্ত্তা হইল, দুটী বধূ গৃহণী হইল, সিদ্ধেশ্বরটি তাহাদের অধীনে রহিল।

সংসারের বন্দোবস্ত এইরূপ হইল, কিন্তু বেশীদিন বজায় রহিল না। ভাই ভাই বিবাদ হইতে আরম্ভ হইল, শিষ্য যজমান ভাগ করিয়া লইবার চেষ্টা হইল, কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নিরাশ করিবার ফন্দী স্থির হইল, কিন্তু কার্য্য হইবার পূর্ব্বেই আশা নির্ম্মূল। পর্ব্বতের মূষিক প্রসব; শিষ্যেরা প্রতিজ্ঞা করিল, মূর্খ গুরুপুত্রের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে না, সঙ্গতিমান যজমানেরা পণ করিল, মূর্খ পুরোহিতের দ্বারা ক্রিয়া করাইবে না। বড় বড় ঘর হাত ছাড়া হইল, কেবল ঘর কতক গরিব যজমান অবশিষ্ট থাকিল; তাহাও আবার তিন ভাগ। সংসার অচল হইয়া দাঁড়াইল। জনার্দ্দনের পাঁচ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমী ছিল, তাহা লইয়াই গণ্ডগোল। যে দুটি পুত্র মাথাধরা, তাহাদের মধ্যে যেটী জ্যেষ্ঠ, তাহার নাম ব্রজেশ্বর, মধ্যমের নাম বীরেশ্বর; প্রকাশ আছে, কনিষ্ঠের নাম সিদ্ধেশ্বর। মা-লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি ঘুচিলে সংসারের যেরূপ দুর্দ্দশা হয়, জনার্দ্দনের সংসারের এখন সেইরূপ দুর্দ্দশা। ভাই ভাই বিবাদ বাধিয়া উঠিল, বৌদুটী পরস্পর ঝগড়া আরম্ভ করিল, ঝগ্‌ড়ার জ্বালায় ঘরের চালে কাক চিল বসে না, এক একদিনের ঝগ্‌ড়ার তুফানে রান্নাঘরে হাঁড়ি চড়ে না, রাগে রাগে সকলেই উপবাসী থাকে।

এই গোলযোগের সময় ব্রজেশ্বর বাহিরে বাহিরে একজন খরিদ্দার খাড়া করিয়া, পৈতৃক ব্রহ্মোত্তর পাঁচ বিঘা বিক্রয় করিবার জোগাড় করে, দস্তুরমত ষ্ট্যাম্পকাগজে কোবালা প্রস্তুত হয়; তিন ভাই সই না দিলে টাকা দিবে না বলিয়া খরিদ্দার আপত্তি

উত্থাপন করে। ব্রজেশ্বর বলে, ও জমি আমার নিজের; কর্ত্তা আমাকেই ঐ ভূমিখণ্ড দান কোরে গিয়েছেন; দলিল নাই, মুখে মুখে দান। খরিদ্দার সে কথা গ্রাহ্য না করিয়া অপর দুই ভ্রাতার দস্তখত লইবার জন্য সেই কোবালা হাতে করিয়া তাহাদের বাড়ীতে যায়। তাহাতেই গণ্ডগোল।

ব্রজেশ্বর অগ্রে দস্তখত করিয়াছিল, পাঁচজন সাক্ষীও সই দিয়াছিল; পাঁচজনের মধ্যে দুই জনের নামের উপর টিপসই, একজনের নামের উপর ঢেরাসই; তাহারা লেখা-পড়া জানে না, কলম-ছোঁয়া সাক্ষী। কেবল দুইজন মাত্র হাতে কলমে দস্তখত করিয়াছিল। বলিয়া দিতে হয়, সেই পাঁচজনেই ব্রজেশ্বরের সানকীর ইয়ার।

খরিদ্দার সেই গ্রামের একজন সদ্গোপ। তাহার নাম রূপচাঁদ ঘোষ। সে যখন তাহাদের বাড়ীতে গিয়া বীরেশ্বর ও সিদ্ধেশ্বরের সই চাহিল, তখন তাহারা দুই ভাই একযোগে মাথা নাড়িয়া স্পষ্টই বলিল, আমরা কিছুই জানি না।

ব্রজেশ্বর তখন বাড়ীতে উপস্থিত ছিল, জোরে জোরে কথা কাটাকাটির পর তিন ভাইতে লাঠালাঠী আরম্ভ হইল; খরিদ্দার সেই দাঙ্গা থামাইতে পারিল না; একটা লাঠির আঘাতে বালক সিদ্ধেশ্বরের একখানি পা ভাঙ্গিয়া গেল; বীরেশ্বর বিলক্ষণ বলবান, নামটিও যেমন, বিক্রমও তদ্রূপ; যথার্থই বীরেশ্বর একজন বীর। ঘরে একখানা টাঙ্গী ছিল, ছুটিয়া গিয়া বীরেশ্বর সেই টাঙ্গীখানা বাহির করিয়া আসিয়া সজোরে ব্রজেশ্বরের মাথায় এক কোপ বসাইয়া দিল; এক কোপেই কর্ম্ম ফর্শা! বৌ দুটী কাঁদিয়া উঠিল। রূপচাঁদ ঘোষ হতভম্বা হইয়া ছুটিয়া

পাড়ার লোকদিগকে জানাইয়া, থানায় খবর দিতে গেল। জমাদার ও বরকন্দাজ সঙ্গে লইয়া দারোগা স্বয়ং ঘটনাক্ষেত্রে তদারকে আসিলেন। রাগের মাথায় দাদাকে খুন করিয়া বীরেশ্বর তখন সরিয়া পড়িয়াছিল; সিদ্ধেশ্বরকে আর বৌটিকে ভয় দেখাইয়া দারোগা মহাশয় সত্য কথা বাহির করিয়া লইলেন; রূপচাঁদ ঘোষও দারোগার সঙ্গে আসিয়াছিল, থানার এজাহারের সঙ্গে খেলাপ না হয়, সেইরূপ সাবধানে সে ব্যক্তিও ঠিক ঠিক সত্য কথা বলিল। তদারকী কাগজে দারোগা মহাশয় সব কথাগুলি লিখিয়া লইলেন। ইহার পর খুনী আসামীর অন্বেষণ।

"কোথায় গিয়াছে—কোথায় গিয়াছে—এই দিকে গিয়াছে—ওই দিকে গিয়াছে—নদীর দিকে ছুটিয়াছে" পুলিসের লোকের আর গ্রামের লোকের তাড়াতাড়ি ওই রকম প্রশ্নোত্তর। অনেকক্ষণ অনুসন্ধান করা হইল, শেষকালে একজন কুম্ভকারের চাকঘরে হাঁড়ি-কলসীর আড়ালে বীরেশ্বরকে পাওয়া গেল। কাপড়ে রক্তমাখা, শরীরে কম্প, মুখে কাঁপা কাঁপা—আলাৎ পালাৎ বুলি, দুই চক্ষু আরক্ত, ঠিক যেন পাগলের মূর্ত্তি।

তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার; সেই দিনেই ফৌজদারীতে চালান; সাক্ষীসাবুদ পরিষ্কার; ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে বেশী কষ্ট পাইতে হইল না, মোকদ্দমা মুলতুবীও থাকিল না, সেই দিনেই দায়রা সোপরদ্দ।

একমাস পরে জেলার জজ আদালতে সেসন খোলা হইল। সেসন জজ দুইজন আসেসর* লইয়া বিচার করিলেন, বিচারে

* মফস্বলের যে যে স্থলে জুরীর প্রথা আছে, সেই সকল স্থলে আসেসরেরাই জুরীর কাজ করেন।

ফাঁসির হুকুম হইল, নির্দ্দিষ্ট দিবসে বীরেশ্বরের ফাঁসি হইয়া গেল।

জনার্দ্দনঠাকুরের বংশ প্রায় লোপ। তিনি নিজে বিষ খাইয়া মরিয়াছেন, গ্রহণী রোগে গৃহিণী মরিয়াছে, টাঙ্গীর আঘাতে ব্রজেশ্বরের মরণ, আদালতের বিচারে বীরেশ্বরের ফাঁসী। বাঁচিয়া রহিল, কেবল ঠাকুরের দুটী বিধবা পুত্র-বধূ আর কনিষ্ঠ পুত্র সিদ্ধেশ্বর। বধূ দুটীও বন্ধ্যা। দারুণ কষ্টে পড়িয়া অনাহারে অনাহারে সিদ্ধেশ্বর যদি মরে, তাহা হইলে জনার্দ্দনের বংশে বাতী দিবার কেহই থাকিবে না।

সিদ্ধেশ্বর শীঘ্র শীঘ্র মরিল না বটে, কিন্তু বাস্তবাড়ী পরিত্যাগ করিতে হইল। শিষ্য যজমান ছুটিয়া গিয়াছে, ব্রহ্মোত্তর জমিও কোবালায় উঠিয়াছে, জমিটা হস্তান্তর করাই তখন নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল; তাহা না হইলে তিনটি প্রাণীর উদরান্নের সংস্থান হয় না। ব্রজেশ্বরের দস্তখতী কোবালাখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া নূতন কোবালা লেখাপড়া হইল; রূপচাঁদ ঘোষ গ্রামের কতিপয় মাতব্বর লোককে সাক্ষী করিয়া লইল, সাক্ষীদের সাক্ষাতে সিদ্ধেশ্বর আর বিধবা বধূদ্বয় সেই কোবালায় দস্তখত করিল। দাম হইল কত? ব্রজেশ্বরের সঙ্গে পণ ধার্য্য হইয়াছিল, একশত টাকা; এখন একটি বালক আর দুটী অবীরা স্ত্রীলোককে তত টাকা দিতে রূপচাঁদ নারাজ হইয়াছিল, কুড়ি টাকা কমিয়া গেল, নূতন কোবালায় অঙ্কপাত হইল, আশীটাকা। রূপচাঁদের কুড়িটি "রূপচাঁদ" বাঁচিয়া গেল।

কোবালা রেজেষ্টারী হইল। বৌ দুটী অল্প অল্প লেখাপড়া জানিত, টিপসই আবশ্যক হয় নাই, তাহারা স্বহস্তে কলম ধরিয়া

আঁকাবাঁকা করিয়া নাম দুটী লিখিয়া দিয়াছিল। রেজিষ্ট্রার তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া, পাড়ার ভদ্রলোকের দ্বারা সনাক্ত করাইয়া, প্রকৃত দলীল সাব্যস্ত করিয়া গেলেন।

জমি বিক্রয় করিয়া আশীটাকা হইল, তাহাতে ক'দিন চলে? সবগুলি থাকিলে বরং মাসকতক চলিতে পারিত, কিন্তু সবগুলি থাকিল না। জনার্দ্দনের মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধখরচ ও সংসারের খরচের জন্ত পঞ্চাশ টাকা ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছিল; যাঁহার কাছে ঋণ, তিনি সর্ব্বদা তাগাদা করিয়া এই সুযোগে টাকাগুলি আদায় করিয়া লইলেন, দয়া করিয়া সুদ গ্রহণ করিলেন না।

ঋণ পরিশোধ করিয়া বাকী রহিল্ল মাত্র ত্রিশ টাকা। তিন-জনের খোরাক, বাড়ীতে শালগ্রাম ছিলেন, অবস্থামত তাঁহার সেবা, ত্রিশ টাকায় ক'দিন যায়?—দুই মাসে কুড়ি টাকা ফুরাইল, বাকী রহিল দশ টাকা; সেই দশটি টাকা ফুরাইলে তখনকার কি উপায়?

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বালক সিদ্ধেশ্বর একটা উপায় স্থির করিল। একটি আশ্রয় তাহার মনে পড়িল। হলধরপুরের হরকান্ত রায় প্রথমে যে বাড়ীতে বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই বাড়ীতেই জনার্দ্দন ঠাকুরের বিবাহ হইয়াছিল; স্বর্গীয়া পদ্ম-রাণীর পিতৃব্য-কন্যাই জনার্দ্দনের পত্নী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের পিতৃবংশ এখন গরিব হইয়া গিয়াছে, সেখানে যাইলে তাহা-দিগের গলগ্রহ হইতে হইবে; সুতরাং সেখানে যাইতে সিদ্ধে-শ্বরের মন সরিল না; মাতুলালয়ের সম্পর্কে হলধরপুরের হরকান্ত বাবুর পুত্রেরা সিদ্ধেশ্বরের মাসতুত ভাই; পদ্মরাণী সিদ্ধেশ্বরের মাসী ছিলেন। সেই সম্পর্কে হরকান্ত বাবুর মৃত্যুর

পর জনার্দ্দন ঠাকুর একবার সিদ্ধেশ্বরকে সঙ্গে লইয়া হলধরপুরে গিয়াছিলেন, হরকান্তবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র সূর্য্যকান্তবাবু পরম সমাদরে তাঁহাদিগকে একমাস রাখিয়াছিলেন; সিদ্ধেশ্বরের বয়স তখন সাড়ে আট বৎসর; নবম বর্ষে উপনয়ন দিবেন, জনার্দ্দনের মুখে সেই কথা শুনিয়া, উপনয়নের খরচ বলিয়া, সূর্য্যকান্ত বাবু তাঁহাকে পঞ্চাশ টাকা দান করিয়াছিলেন। সিদ্ধেশ্বর দেখিয়া আসিয়াছিল, জানিয়া আসিয়াছিল, সূর্য্যকান্ত বাবু জমীদার, সংসার বেশ গুলজার। শৈশবের কথা হইলেও তাহা সিদ্ধেশ্বরের বেশ মনে ছিল; এখন নিতান্ত দুর্দ্দশায় পড়িয়া অত্যন্ত কাতর হওয়াতে সেই কথা আবার নূতন হইয়া মনে পড়িল। পাড়ার দুইজন মুরুব্বীর সহিত দেখা করিয়া, তাঁহাদের অনুমতি লইয়া, একটি শুভদিন দেখিয়া, দুটী ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে সিদ্ধেশ্বর হলধরপুরে যাত্রা করিল। ঘরের সামান্য জিনিষ পত্র ঘরেই রহিল, আবার যদি ফিরিতে হয়, তাহাই ভাবিয়া, সিদ্ধেশ্বর গৃহের শয্যাপত্র অথবা তৈজসপত্র কিছুই সঙ্গে লইল না, ঘরগুলি চাবি বন্ধ থাকিল। বৌ দুটীর খানকতক রূপার গহনা ছিল, বৌ দুটি কেবল তাহাই সঙ্গে লইল। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের মা-বাপেরা বড় গরিব, কিছুতেই পিত্রালয়ে স্থান পাইবে না, সেই কারণেই অগত্যা হলধরপুরে যাইতে রাজী। রজতালঙ্কারের সঙ্গে স্বর্ণালঙ্কারের মধ্যে কেবল দুটি ছোট ছোট নথ। চারিখানি পাশা, চার ছড়া পলকাঁটি আর দুই ছড়া কণ্ঠমালা।

বৌ দুটি লইয়া সিদ্ধেশ্বর হলধরপুরে গেল, ভদ্রাসনে সন্ধ্যা রহিল, শালগ্রাম ঠাকুর উপবাস করিতে থাকিলেন।

সূর্য্যকান্ত বাবু তাহাদিগকে বাটীতে উপস্থিত দেখিয়া

আনন্দিত হইলেন; কিন্তু সিদ্ধেশ্বরের মুখে আদ্যোপান্ত দুর্ঘটনা শ্রবণ করিয়া বিস্তর দুঃখ প্রকাশ করিলেন। অনন্তর বৌঠুটীকে অন্দরে পাঠাইয়া, সিদ্ধেশ্বরকে নিকটে বসাইয়া আরো অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। যাহা যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার মনের কষ্ট আরো বাড়িল। পরম যত্নে তিনি আশ্রিত তিনটী প্রাণীকে আপন আশ্রমে স্থান দিয়া রাখিলেন। অশন-বসনের, মিষ্টবচনের, আদর-যত্নের কোন অংশেই তাহারা কিছু-মাত্র অভাব অনুভব করিল না। সূর্য্যকান্তবাবুর জমিদারীগুলি তখন নিলাম হয় নাই; একমাস পরে তিনি সিদ্ধেশ্বরকে নিজ বাড়ীর সেরেস্তায় একটী মুহুরিগিরী কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। জনার্দ্দনের কনিষ্ঠা কন্যা আশালতা চিরদিন শ্বশুরালয়েই বাস করিতে লাগিল।

পাঠক মহাশয়! দেখুন, অনুভব করুন, আলোচনা করুন, স্মরণ করিয়া রাখুন, ধর্ম্মের খেলা কেমন, অধর্ম্মের খেলা কেমন, তাহার একটী উত্তম প্রমাণ জনার্দ্দন ঠাকুর!—হতভাগ্য জনার্দ্দ-নের এই জীবন-কাহিনীতে আপনারা এ দেশে সংসার-তত্ত্বের অনেকটা আভাষ প্রাপ্ত হইলেন। এখন ভবেশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া, উপসংহারে আমাদের মুখে শ্রবণ করুন, এই এক রকম ভবের খেলা!

চতুর্থ কল্প।

সারদার ধর্ম্মজীবন।

হরকান্তবাবুর পরলোকযাত্রার পর পুত্রেরা পরস্পর পৃথক হয়, তাঁহাদের বিমাতা শ্রীমতী রাধারাণীদেবী সারদাকে লইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া যান। নদীয়া জেলার মোহনপুরগ্রামে তাঁহার পিত্রালয়। রাধারাণীর পিতার নাম যোগেশ্বর মুখোপাধ্যায়; যোগেশ্বরের তিন পুত্র, দুই কন্যা। তিনি সঙ্গতিহীন লোক ছিলেন না, দুইখানি নম্বরীতালুক আর গ্রামের মধ্যে পঞ্চাশ যাট বিঘা নিষ্কর জমি ছিল; বাৎসরিক আয় পাঁচহাজার টাকা। স্বচ্ছন্দে সংসার চলিত। যথাসম্ভব ব্যয় করিয়া বৎসর বৎসর কোজাগর পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজা, দীপান্বিতা অমাবস্থায় কালীপূজা, মাঘমাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুনী পূর্ণিমায় রাধাকৃষ্ণের দোল এবং ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের নিশাপূজা, এই কয়েকটি কার্য্যে যোগেশ্বরবাবু বিশেষ ভক্তিপূর্ব্বক উৎসব করিতেন; দুর্গোৎসব করিতে পারিতেন না, দুর্গোৎসবে খুব ঘটা না করিলেও অন্যান্য উৎসব অপেক্ষা ব্যয় অধিক, পাছে সঙ্কুলান না হয়, সেইজন্য দুর্গা আনিতে তাঁহার ভরসা হইত না।

রাধারাণী জমীদারের স্ত্রী হইয়াছিলেন, অসময়ে বিধবা হইয়া পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন, মাতা পিতার একটু বেশী বেশী আদর যত্ন পাইতেন। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে, রাধারাণীর

বালিকাকন্যার নাম সারদা; মাতামহাশ্রমে সারদারও যথেষ্ট আদর। রাধারাণীর তিনটি ভাই ইংরাজী পড়ে, রাধারাণীও গ্রাম্যবিদ্যালয়ে একাদশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত কিছু কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন. তাঁহার ভগ্নীও কিছু কিছু শিখিয়াছিল, বিবাহের পর বন্ধ হইয়াছে।

মেয়েরা লেখাপড়া শিক্ষা করে, সে বিষয়ে রাধারাণীর পরম উৎসাহ; তাঁহার পিতাও সে পক্ষে বড় একটা আপত্তি করেন না। সারদার যখন পাঁচ বৎসর বয়স, সেই সময় রাধারাণী তাহাকে হলধরপুরের বালিকাবিদ্যালয়ে পাঠাইবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু হরকান্তবাবু রাজী হন নাই। রাধারাণী এখন পিত্রালয়ে আসিয়াছেন, মেয়েটীও একটু বড় হইয়াছে, বয়স সাত বৎসর, এই সময় তাহাকে বিদ্যালয়ে দিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। মোহনপুর ক্ষুদ্র গ্রাম, তথাপি সেখানে একটি বালিকা-বিদ্যালয় ছিল। গ্রামের লোকের প্রতি দয়া করিয়া পাদরীসাহেবেরা সেই বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মেমসাহেব আসিয়া শিক্ষাদান করেন না, বৎসরে দুইবার একটি বিবি আসিয়া বালিকাগুলিকে পরীক্ষা করেন; যে যেমন পড়ে, যে যেমন পড়িতে পারে, তাহাকে সেই রকম পারিতোষিক দেন; পুতুল, ছবি, কেতাব, ছোট ছোট আয়না, রংকরা ছোট ছোট বাক্স, আর দুই একখানি গিল্‌টির গহনা পুরস্কার দেওয়া হয়। বিবিটী হাসিয়া হাসিয়া মেয়েদের সঙ্গে নানা রকম গল্প করেন। কেবল ঐ দুইবারমাত্র তিনি দর্শন দেন; বার মাসের শিক্ষাদায়িনী স্বতন্ত্র। একটি গতযৌবনা কৃষ্ণবর্ণা বাঙ্গালী খৃষ্টানী সেই বিদ্যালয়ের গুরু-মা। একটী ভাল দিন দেখিয়া

রাধারাণী একখানি নূতন কাপড় পরাইয়া সারদাকে সেই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

সারদাসুন্দরী বর্ণপরিচয় অভ্যাস করিতে লাগিল। এক বৎসরের মধ্যেই দুই তিনখানা পুস্তক সায় করিয়া বোধোদয়, কথামালা ও পদ্যপাঠ পড়িতে লাগিল। রাধারাণীর কনিষ্ঠা ভগ্নীর নাম নন্দরাণী, বিবাহ হইলেও নন্দরাণী শ্বশুরালয়ে যায় না; জামাইটি ঘরজামাই। ইংরাজী লেখাপড়া জানে না, ঘরজামাই থাকিয়া, শ্বশুরবাড়ীর গ্রামের একজন জমীদারের সেরেস্তায় অল্প বেতনে চাকরি করে। ভাল লেখাপড়া জানে না বলিয়া নন্দরাণী তাহাকে অশ্রদ্ধা করে না;—ভক্তি করে, সেবা করে,তামাক সাজিয়া দেয়, গ্রীষ্মকালে বাতাস করে, পতির কাছে একদিনও মুখ ভারি করিয়া থাকে না। এক এক রাত্রে নন্দরাণী হাসিতে হাসিতে স্বামীকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়িতে বলে, পড়া আরম্ভ হইলে কাছে বসিয়া স্থির হইয়া শোনে; যেখানে যেখানে ঠেকে, মিষ্টবচনে শুধরাইয়া লয়, বড় বড় কথার মানে বলিয়া দেয়। নন্দরাণীর বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষ।

সারদার শিক্ষানৈপুণ্য দর্শনে নন্দরাণী ভারি সুখী। অষ্টম-বর্ষীয়া বালিকা বোধোদয়ের মানে বলে, পদ্যপাঠের ব্যাখ্যা করে, অঙ্কশাস্ত্রের কথা কয়, তাহা শুনিয়া সকলেই সুখী হন। নন্দরাণী তাহাকে সন্ধ্যার পর কাছে বসাইয়া তাহার পড়াগুলি শোনে, নূতন পড়া বলিয়া দেয়, পদ্যপাঠের নূতন নূতন ছন্দ পাঠ করিবার পদ্ধতি শিখায়। বালিকার পুস্তকের দপ্তরে এক-খানা খৃষ্টানী ধর্ম্মপুস্তক থাকে, নন্দরাণী সেখানা স্পর্শও করে না; বিদ্যালয়ে সারদাও সে পুস্তকের প্রতি মনোযোগ রাখে না;

পড়িতে হয়, পড়ে, কিন্তু ভাল লাগে না,—সেদিকে মন যায় না। একটু কৌতুক করিবার জন্য নন্দরাণী এক একদিন বড় মজা করে। সন্ধ্যার পর স্বামী গৃহে আসিলে, নন্দরাণী সারদাকে ডাকিয়া আনে; একখানা সতরঞ্চি পাতিয়া তিন জনে বসে; নন্দরাণী একবার সারদাকে, আর একবার স্বামীকে রামায়ণ পড়িতে দেয়। জামাইটী হারিয়া যায়, সারদার জিত হয়। বদনে অঞ্চল ঝাঁপিয়া নন্দরাণী হাস্য করে। রাধারাণীও অবকাশমতে স্নেহময়ী কন্যাটীকে বিদ্যাশিক্ষা দেন।

যোগেশ্বরবাবুর ধর্ম্মের সংসার; কর্ত্তা, গৃহিণী, পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ, সকলেই ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। যাঁহার সহিত রাধারাণীর বিবাহ হইয়াছিল, তাঁহার সংসারটিও ধর্ম্মের সংসার। রাধারাণী সেখানে সকলের সহিত মিলিয়া স্ব-ধর্ম্মের সেবা করিতেন; খুব ছোটবেলা সারদাও "হরিবোল, হরিবোল" বলিয়া হাসিয়া হাসিয়া, দুই হাত তুলিয়া নাচিত। মোহনপুরে আনিয়া স্কুলে দিয়া, রাধারাণী সারদাকে ধর্ম্ম-কর্ম্মে অবহেলা করিতে শিখান নাই। সারদা সেখানে উলঙ্গ হইয়া যমপুকুর পূজা, পুণ্য পুকুর পূজা, অশ্বত্থবৃক্ষ পূজা, তুলসীবৃক্ষ পূজা ও বিল্ববৃক্ষ পূজা নিত্য নিত্য করিয়াছে, হিংসার ব্রত বলিয়া রাধারাণী তাহাকে সেঁজুতি ব্রত করিতে দেন নাই। বয়স অল্প হইলেও ধর্ম্মকর্ম্মে সারদার যথেষ্ট ভক্তি।

পল্লীগ্রামে কোন ভদ্র-পরিবারে পাচক ব্রাহ্মণ অথবা পাচিকা ব্রাহ্মণী থাকে না, বাটীর পরিবারেরাই রন্ধনাদি সমস্ত গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করেন; যাঁহাদের সঙ্গতি কিছু বেশী, বাজে কাজের জন্য তাঁহারা এক একজন দাসী রাখিয়া দেন। ভদ্র-

পরিবারে পাচক পাচিকা থাকে না, অভদ্র পরিবারে থাকে, এমন কথা ,আমরা বলিতেছি না,—ফল কথা—পল্লীগ্রামে সে রীতিটা আসলেই নাই। আজকাল দুই-একজন সহরের চাল-চলন দেখিয়া, বধূগুলিকে বিবি বানাইবার অভিলাষে পাচিকা রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন ; সেটাও কিন্তু মঙ্গলদায়ক নহে।

যোগেশ্বরবাবুর সংসারে পরিবার অনেকগুলি, কিন্তু রন্ধন করিবার পাত্রী অতি অল্প। গৃহিণীর বয়স হইয়াছে, তিনি আর বেশী পরিশ্রম করিতে পারেন না, তিন পুত্রের মধ্যে দুটী পুত্রের বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু বৌ দুটী ছোট ছোট ; হিসাবে ধরিলে নন্দরাণীও ছেলেমানুষ ; অন্যান্য কার্য্যে পটু হইলেও রন্ধন-কার্য্যে অপটু ; সুতরাং রাধারাণীর উপরেই দুইবেলা রন্ধনের ভার। সেই কারণে সারদার বিদ্যাশিক্ষার মহলা লইতে তিনি বড় একটা অবকাশ পান না। গৃহশিক্ষা সম্বন্ধে যাহা কিছু সাহায্য করে নন্দরাণী।

সারদা নবম বর্ষে পদার্পণ করিল। বর্ষ বৃদ্ধির পর ছয় সাত মাস কতক ইচ্ছায়, কতক অনিচ্ছায়, সারদাসুন্দরী সকাল সকাল আহার করিয়া বিদ্যালয়ে গেল, কিন্তু মন কেমন বিচলিত হইয়া উঠিল ;—একদিন বৈকালে বিদ্যালয় হইতে ঘরে আসিয়া, দুটি-খানি মুড়ি খাইয়া, ম্লানবদনে ছলছল চক্ষে জননীর নিকটে গিয়া, গলা জড়াইয়া ধরিয়া, মুখের কাছে মুখ রাখিয়া, কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "মা ! আমি আর স্কুলে যাব না।"

একটু যেন চমকিয়া রাধারাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন যাবে ?"—জিজ্ঞাসা করিয়াই মুখ তুলিয়া, কন্যার বিরস মুখ দেখিয়া, কাতরে সবিস্ময়ে পুনরায় চঞ্চলস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন

সারু?—কাঁদ্‌ছো,—কেন মা?—হয়েছে কি? স্কুলে যাবে না বোল্‌ছো,—কেন?—হয়েছে কি? গুরু-মা তোমায় বোকেছে বুঝি?"

চোক্ষের জল মুছিয়া সারদা উত্তর করিল, "না মা, গুরু-মা বকেন নি, কিন্তু আমি যাব না। যিশু কিষ্টের বই পড়ায়, তাও পড়্‌ছিলুম, এখন আবার গুরু মা বলেন, যিশু কিষ্টের গান গাইতে হবে। অনেক মেয়ে গায়, আমি কিন্তু পারি না, বুক কেমন ধড়াস্ ধড়াস্ করে। গুরু-মা বলেন, কর্ত্তা সায়েবের হুকুম, মেমসায়েবের আদেশ, গাইতে হবে। শুধু তা নয়, গুরু-মা আমাদের সকলকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে বড় বড় বক্তিতা শোনান;—আমাদের শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করেন, মা-দুর্গার নিন্দা করেন, মা-কালীর নিন্দা করেন, দেবের দেব মহাদেবের নিন্দা করেন। আমার চক্ষে জল আসে, ভয়ে আমার গা কাঁপে।"

মুখখানি নীচু করিয়া রাধারাণী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর মেয়েটীর হাত ধরিয়া কোলে বসাইয়া, মুখ চুম্বন করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "তবে আর যেও না। জানি আমি, ওদের ঐ রকম রঙ্গ, তবু তোমায় পাঠিয়েছিলুম; কেন পাঠিয়েছিলুম শুনবে?—মেয়েদের কিছু কিছু লেখাপড়া শিখে রাখা ভাল, সেই জন্যে। তা যখন—

শেষ কথা না শুনিয়া, মায়ের মুখের কাছে মুখ তুলিয়া, মায়ের মুখে হাত বুলাইয়া, সারদা হঠাৎ বলিল, "সব কথা তবু বল্‌তে পারিনি; গলা যেন আট্‌কে আট্‌কে আস্‌ছিল;—আরো কথা আছে। ছুটি হবার একটু আগে, সেই রকম

বক্তিতা কোরে, গুরু-মা আজ আবার বলেছেন, "যে সকল পুতুল তোমরা গড়ো, নিজেই ভাঙ্‌তে পারো, নিজেই ভেঙে ফেলো, সে সকল পুতুল কি ঠাকুর হতে পারে?—হিন্দুদের দালানে যে সব প্রতিমা পূজা হয়, সেগুলাও মানুষের হাতের গড়া পুতুল, মানুষেরাই আবার সেই সকল পুতুলকে জলের ভিতর গোর দেয়। ভেবে দেখ দেখি, সেটা কি ছেলেখেলা নয়? তোমরা সে সকল ছেলেখেলায় ভুলো না, কোন প্রতিমাকে নমস্কার করো না; তাদের কোন ক্ষমতা নাই। ভূত পূজা আর ঠাকুর পূজা, একই কথা। মনে রেখো, কোন প্রতিমার কাছে মাথা নীচু কোরো না। সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের পুত্র প্রভু যিশু। একমাত্র তিনিই পৃথিবীর পাপীলোকের ত্রাণকর্ত্তা, মুক্তিদাতা, পরিত্রাতা, সর্ব্বময়; তোমরা ভক্তিভাবে তাঁর পাদ-পদ্মে শরণ লও।"

নিশ্বাস ফেলিয়া রাধারাণী বলিলেন, "ওদের সব কথাই ঐ রকম, ওরা কেবল ঐ মতলবেই স্কুল খোলে। আর আমি তোমাকে স্কুলে পাঠাব না।"

কি ভাবিয়া ম্লানবদনে সারদা বলিল, "কি হবে মা?—যা কিছু শিখেছি, সব আমি ভুলে যাব!"

আদরে মুখচুম্বন করিয়া রাধারাণী বলিলেন, "কেন মা? ভুল্‌বে কেন?—আমি পড়াবো, তোমার মামারা পড়াবে, তোমার মাসী-মা পড়াবে, ভাবনা কি?"

একটু হাসিয়া সারদা বলিল, "আমিও তাই মনে করিছি। তুমি পড়াবে, আর মাসী-মা পড়াবে। মাসী-মা বেশ পড়ান। মামারা পার্‌বেন না; তাঁরা ইংরিজী পড়েন।"

হাস্য করিয়া রাধারাণী বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার যা ভাল লাগে, তাই হবে। মামাদের কাছে তোমায় পড়্‌তে হবে না।"

জননীকে প্রণাম করিয়া সারদাসুন্দরী হাসিতে হাসিতে মাসীমার ঘরে চলিয়া গেল। জননীর কোলে বসিয়া যত কথা শুনিয়াছিল, সব কথাগুলি মাসীমাকে বলিল; গুরু-মার বক্তৃতার সার সার কথাগুলিও শুনাইয়া দিল। সস্নেহে সারদার মুখচুম্বন করিয়া নন্দরাণী তাহাকে দুখানি সরভাজা খাইতে দিল।

সারদাসুন্দরী বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিল; ধর্ম্ম কর্ম্মে ভক্তি বাড়িল। সময় অনেক। সকালবেলা পড়া হয় না, সারদা একটি তামার ঘটীতে গঙ্গাজল লইয়া অশ্বত্থবৃক্ষে, বটবৃক্ষে, তুলসীবৃক্ষে, বিল্ববৃক্ষে, গ্রাম্য পঞ্চানন্দের স্থানে ও ঠাকুরঘরের চৌকাটে জল দিয়া দিয়া বেড়ায়, শিব-মন্দিরে ও হরিমন্দিরে ঢিপ ঢিপ করিয়া প্রণাম করে, হরিনাম করিয়া, দুর্গানাম করিয়া, ঘরে ঘরে সকলের সঙ্গে দেখা করিয়া হরিনামের মহিমা শুনায়, ঠাকুর-ঘর মার্জ্জনা করে, সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যা দেয়, আরতির সময় শাঁক বাজায়। সন্ধ্যার পর কোন দিন মায়ের কাছে, কোন দিন মাসীমার কাছে পাঠ্য পুস্তকের পাঠ শিক্ষা করে, পাঠের পর ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করে;—কোন দিন রামায়ণ, কোন দিন মহাভারত, কোন দিন কালীবিলাস, গঙ্গাভক্তি, রাধাকৃষ্ণ-বিলাস এবং কোন কোন দিন কবিকঙ্কণ চণ্ডী পাঠ হয়। সকলেই তাহার পাঠ শুনিয়া সন্তুষ্ট হন।

ক্রমশঃ বয়স বাড়িতে লাগিল। সারদার বয়ঃক্রম দশবৎসর। যোগেশ্বরবাবু পাত্র অন্বেষণে নানাস্থানে লোক পাঠাইলেন; ঘটক নিযুক্ত হইল। পল্লীগ্রামের সকল স্থলে ঘটকীর আমদানী

হয় নাই, ঘটকী আসিল না। দুইক্রোশ দূরস্থ একখানি গ্রামে একটি সুপাত্র পাওয়া গেল। পাত্রটি পিতৃহীন, লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছে, চাক্‌রী হয় নাই; দেখিতে সুশ্রী, বয়স উন-বিংশতি বর্ষ; নাম শচীন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়।

একাদশ বর্ষে সারদাসুন্দরীর বিবাহ হইল। একটীমাত্র কন্যা, রাধারাণী সেটিকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না, সারদা তাঁহার চক্ষের অন্তর হইলে সর্ব্বদা মনের অসুখে থাকিবেন, অনুমানে ইহা বুঝিতে পারিয়া যোগেশ্বরবাবু সেই নূতন জামাইটিকে ঘরজামাই করিয়া রাখিলেন। বিবাহের এক বৎসর পরে কৃষ্ণনগরে জজকোর্টে শচীন্দ্রের একটী চাক্‌রী হইল; মাসিক বেতন—পঁচিশ টাকা।

যোগেশ্বরবাবুর বাড়ীখানি দোতলা। তিন মহল। সদর মহল, মাঝের মহল, রান্নামহল। তদ্ব্যতীত অন্দরের পূর্ব্বদিকের প্রাচীর-সংলগ্ন ক্ষুদ্র একটী স্বতন্ত্র মহল;—একদিকে অন্দরের প্রাচীর, অন্য তিনদিকে উচ্চ উচ্চ ইষ্টক-প্রাচীর। সে মহলে মানুষ থাকে না; উত্তর দিকের কোণে একখানা চালাঘর, সেই ঘরে কেবল একজন মালী থাকে। মহলের মধ্যস্থলে একটী পুষ্করিণী, অন্দরের দিকে ছোট একটী বাঁধাঘাট, অপর তিন দিকে ফুল-বাগান।

সদর বাড়ীর ফটকের সম্মুখে সুদীর্ঘ সরোবর; চারিদিকে চারিটী বাঁধাঘাট। পূর্ব্বদিকের ঘাটটী সদর ঘাট;—ঘাটের উভয় পার্শ্বে দুটী চম্পকবৃক্ষ; উত্তরের ঘাটের উভয় পার্শ্বে দুটী বকুলবৃক্ষ; পশ্চিমের ঘাটের দুই দিকে দুটী কামিনী-ফুলের ঝাড়, দক্ষিণের ঘাটের দুইদিকে দুটী জুঁই-ফুলের ঝাড়। সরো-

ঘরের চারিকোণে চারিটী শিবমন্দির। সেগুলি যোগেশ্বরবাবুর পিতার প্রতিষ্ঠিত।

বিবাহের পর সারদাসুন্দরী সর্ব্বদা সদর বাড়ীতে যায় না, কিন্তু সকালে ও সন্ধ্যাকালে শিবমন্দিরে জল দিতে যায়, ফুল দিতে যায়, সন্ধ্যা দিতে যায়, প্রণাম করিয়া আইসে।

প্রতিদিন বৈকালে সারদার কার্য্য ফুল তোলা। অন্দরের ফুলবাগানে নানাজাতি ফুল ফুটে, একটী সাজী লইয়া সন্তর্পণে সারদা অনেক ফুল তুলিয়া আনে, যে যে ফুলে মালা হয়, সারদা সেই ফুলগুলি বাছিয়া বাছিয়া মালা গাঁথে; কলাপাতা জড়াইয়া, গঙ্গাজল ছড়াইয়া, সেই মালাগুলি একটি তাকের উপর তুলিয়া রাখে; প্রভাতে স্নান করিয়া সেই মালাগুলি লইয়া বাহিরের শিবমন্দিরে আর সদর-বাড়ীর ঠাকুর-ঘরে রাখিয়া আইসে। পূজার দালানের পূর্ব্বদিকে স্বতন্ত্র একটি ঠাকুর ঘর; পাঁচখানি সিংহাসন। শালগ্রাম আছেন, রাধাকৃষ্ণ আছেন, কমলা আছেন, মঙ্গলচণ্ডী আছেন, আর সিদ্ধিদাতা গণেশ আছেন। পূর্ব্বের অভ্যাসমত সারদাসুন্দরী সব ঠাকুরগুলিকে দুইবেলা প্রণাম করে। কেবল প্রণাম করিয়াই চুপ করিয়া থাকে না, স্নানের পর স্বহস্তে মাটির শিব গড়িয়া ফুলবিল্বদলে শিবপূজা করে। শিবপূজার সময় পট্টবস্ত্রপরিহিতা সারদাকে দেখায় যেন অলঙ্কার-ভূষিতা মূর্ত্তিমতী পার্ব্বতী।

মোহনপুর হইতে কৃষ্ণনগরের জজকাছারী প্রায় আটক্রোশ দূর; শচীন্দ্রশেখর নিত্য নিত্য শ্বশুরালয় হইতে আসা যাওয়া করিতে পারে না, গোয়াড়িতে বাসা করিয়া থাকে, হপ্তায় হপ্তায় ফি শনিবার বাড়ী আইসে।

শচীন্দ্রশেখরের পিতা নাই, গুরুবংশও নির্ব্বংশ, অতএব শ্বশুরের গুরুর নিকটেই শচীন্দ্রের দীক্ষাগ্রহণ। বিবাহের দুই বৎসর পরে মন্ত্রদীক্ষা ;—যুগলে একসঙ্গে মন্ত্রগ্রহণ করিলে দীক্ষার কিছু মহিমা বাড়ে ; ত্রয়োদশবর্ষিয়া সারদাও স্বামীর সঙ্গে ইষ্ট-মন্ত্র প্রাপ্ত হইল।

দীক্ষাগ্রহণের পর সারদার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি আরো অধিক তেজস্বিনী হইয়া উঠিল। ভক্তি-প্রবাহে সারদার কোমল হৃদয় পরিপ্লাবিত হইল। প্রভাতে অন্দরের সরোবরে স্নান করিয়া ভাল ভাল ফুল বিল্বপত্র তুলিয়া, নৈবেদ্য সাজাইয়া, পবিত্র মনে, পবিত্র হৃদয়ে, পবিত্রা বালিকা ইষ্টদেবীর পূজা করে। পূজা অবসানে গলবস্ত্রে করজোড়ে ইষ্টদেবীর স্তব পাঠ করে। একটি স্তব এই স্থলে গ্রহণ করা হইল ;—

স্তোত্র।

ও মা, ত্রিলোক-তারিণী, ত্রিতাপ-হারিণী,
ত্রিগুণ-ধারিণী, শুভঙ্করি।
ও মা, নগেন্দ্র-নন্দিনী, সুরেন্দ্র-বন্দিনী,
মহিষ-মর্দ্দিনী, ক্ষেমঙ্করি।
ও মা, দানব-দলিনী, নৃমুণ্ড-মালিনী,
কৃতান্ত-দলিনী ভয়ঙ্করি।
ও মা, কৈলাস-বাসিনী, সুচারু-হাসিনী,
অশিব-নাশিনী, সুরেশ্বরি ॥

বৎসর অগ্রসর হইতে লাগিল,—সারদাসুন্দরী পঞ্চদশী। এই সময় হইতে সারদার মাতৃভক্তি অধিক প্রবলা হইল। প্রতিদিন প্রভাতে উঠিয়া, দুর্গানাম করিয়া, সারদা সর্ব্বাগ্রে জননীর চরণ-

বন্দনা করে, তাহার পর ইষ্টপূজা। তাহার পর মাতামহ, মাতুল, মাতুলানী ও মাসীমার চরণে প্রণিপাত করে, তাহার পর অন্যান্য কার্য্যে রত হয়; ব্রাহ্মণভোজন হইয়া গেলে অনেক বেলায় আহার করে; সন্ধ্যাকালেও মাতাকে প্রণাম করিয়া অন্যান্য গুরুলোকগুলির পদধূলি লয়; প্রাতে ও সায়াহ্নে ঠাকুর-প্রণামের যেরূপ রীতি নীতি, সেই রীতি পালন করিয়া বাটীর গুরুজনগণের চরণে প্রণাম করিবার রীতিটীও নিত্য নিত্য সমভাবে রক্ষা করে। প্রতি রজনীতে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ হয়।

শনিবার রবিবার শচীন্দ্র গৃহে থাকে, সারদাসুন্দরী ভক্তি-ভাবে পতিসেবা করে, তথাপি রাত্রি একপ্রহর পর্য্যন্ত রামায়ণ মহাভারতের সঙ্গে সদালাপ করা বন্ধ থাকে না। পাঠের সময় শচীন্দ্রও উপস্থিত থাকেন।

শাস্ত্রে পতিব্রতা রমণীর যেরূপ ধর্ম্মাচরণের উপদেশ আছে, সারদা সেইগুলি মুখস্থ করিয়া সাধ্যমতে সেইরূপ উপদেশমতেই পতিসেবা করিয়া থাকে; কোন অংশে ত্রুটি হয় না, কোন অংশ অঙ্গহীন থাকে না।

সারদার দেবদেবীভক্তি, মাতৃভক্তি, পতিভক্তি ও গুরুজনভক্তি দেখিয়া পাড়ার অনেকগুলি স্ত্রীলোক কত কথাই কাণাকাণি করে, কেহ কেহ বিদ্রূপ করিয়া সারদার প্রাণে ব্যথা দেয়। একদিন ঠান্‌দিদি-সম্পর্কের একটি আধবয়িসী ব্রাহ্মণী আসিয়া, রমণীমণ্ডলী মধ্যে বসিয়া, সারদাকে লক্ষ্য করিয়া, ভারি একহাত ঠাট্টা লইয়াছিলেন। সারদাও সেইখানে উপস্থিত ছিল। যে ঠাকুরাণী পরিহাস-নাটকের অভিনয় করিতে আসিয়াছিলেন,

তিনি কথঞ্চিৎ বিদ্যাবতী। সারদাকে নিকটে টানিয়া লইয়া, হাসিয়া হাসিয়া তিনি বলিলেন, "আচ্ছা সারু। শুন্‌তে পাই, এক একদিন দেখ্‌তেও পাই, বাড়ীর আরাধ্য গুরুলোকগুলিকে তুমি রোজ রোজ চিপ্‌ চিপ্‌ কোরে গড় কর ;—কিন্তু আচ্ছা, পৃথিবীতে স্ত্রীজাতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান গুরু যিনি, সেই পরম-গুরু পতিকে তুমি ত ভাই একদিনও একটাও গড় কর না; কেন কর না দিদি?—নাতজামাই কি তোমার কাছে এতই অপরাধী?"

মৃদু হাসিয়া, ঠান্‌দিদির হাত ছাড়াইয়া সারদাসুন্দরী নত-বদনে তথা হইতে ছুটিয়া পলাইল।—পলাইল বটে, কিন্তু মনে মনে অভিমান আসিল না,—অনুতাপও আসিল না। কেন না, শনিবার রজনীতে, রবিবার প্রাতে, রবিবার রজনীতে ও সোম-বার প্রাতে সারদাসুন্দরী সঙ্গোপনে পতিদেবতার চরণে প্রণাম করিয়া থাকে ;—রবিবার ও সোমবার প্রাতঃকালে মাতৃবন্দনার পূর্ব্বেই পতিপাদপদ্মে প্রণিপাত করিয়া, ভক্তিভাবে পদরেণু লেহন করিয়া, তাহার পর গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করে; দশ-জনের সম্মুখে পতিপদে প্রণাম করিতে লজ্জা হয়, সেইজন্য প্রকাশ্যরূপে পারে না। স্ত্রীজাতির লজ্জা আমাদের দেশে বিস্তর উপকারে আইসে, কিন্তু এই বিষয়ে একটু দোষ ঘটায়। মন্ত্র-দাতা গুরু আর স্বামী যদি একস্থানে বসিয়া থাকেন, স্ত্রী সেখানে গুরু প্রণাম করিতে পারে না; সুতরাং স্বামীকে সে স্থান হইতে সরাইয়া দিতে হয়। লজ্জার এই একটা লাঞ্ছনা।

পতিপ্রাণা, সরলহৃদয়া, ধর্ম্মশীলা, স্নেহবতী সারদার কোমল হৃদয়ে দয়ামায়া মূর্ত্তিমতী।—গরিবের প্রতি তাহার অসীম দয়া।

তত অল্প বয়সে গরিবের দুঃখ দেখিলে তাহার চক্ষে জল আইসে; বাড়ীতে গরিব লোক বেড়াইতে আসিলে, তাহাদের মুখে কষ্টের কথা শুনিয়া সারদার ক্ষুদ্র হৃদয়ে অত্যন্ত বেদনা লাগে; যে রকমে পারে, জননীর কাছে ভিক্ষা করিয়া, মাতামহীর কাছে ভিক্ষা করিয়া, মাসীদের কাছে ভিক্ষা করিয়া, কাহাকেও একখানি বস্ত্র, কাহাকেও কিছু তণ্ডুল, কাহাকেও একটি বাটী এবং কাহাকেও কিছু পয়সা দান করে; নিজের কাছে পয়সা থাকিলে তাহাও গোপনে গোপনে গরিবের উপকারে দান করিয়া ফেলে; কোন ভিখারিণীর অঙ্গে বস্ত্র না থাকিলে তাহাকে গোপনে ডাকিয়া নিজের বস্ত্র প্রদান করে; কেহই কিছু জানিতে পারে না। লোকমুখে সুখ্যাতি শুনিয়া গ্রামের কোন গরিব স্ত্রীলোক আসিয়া কিছু সাহায্য চাহিলে, সারদা তাহাকে বঞ্চিত করে না, অম্লানবদনে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া সারদা তাহাকে আট আনা, এক টাকা দান করিয়া থাকে। অকপটে সৎকার্য্যে মতি থাকিলে, ভগবান তাহার প্রতি প্রসন্ন হন; সৎকার্য্যে অনুরাগিণী সারদার প্রতি ভগবান সদয় হইয়াছিলেন।

সারদা একদিন বৈকালে অন্দরের ফুলবাগানে একটি নূতন ফুলগাছ বসাইবার জন্য, একখানা খন্তা লইয়া গর্ত্ত খুঁড়িতেছিল;—ফুলগাছটী কিছু বড়,—মস্ত মস্ত শিকড়,—অনেক নীচে পর্য্যন্ত মাটি খুঁড়িতে হইল;—খুঁড়িতে খুঁড়িতে খন্তার মুখে ঠক্ করিয়া কি একটা শব্দ হইল;—খন্তাখানা তুলিয়া লইয়া সারদা সেই গর্ত্তের কাছে হেঁট হইয়া দেখিল, সারি গাঁথা গোটাকতক ছোট ছোট কড়ি;—গর্ত্তের ভিতর হাত বাড়াইয়া সারদা সেই

কড়িগুলি ধরিল, একটা পদার্থ উঠিয়া আসিল। পদার্থ টা কি? সিঁদুর চুবড়ি। মাজিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া লইলে বেশ হইবে, এই ভাবিয়া সারদা সেইটী কোলের কাছে রাখিল। চুবড়িটা কিছু ভারি, মুখে একটা ঢাকন। সারদা একবার এদিক ওদিক চারিদিক চাহিল; কোনদিকে কেহই তখন ছিল না, আস্তে আস্তে ঢাকনটা খুলিয়া ফেলিল; দেখিতে পাইল, এক চুবড়ি মোহর।

সারদার পরমানন্দ। ফুলগাছটি রোপণ করিয়া, গোড়ার খানিকদুর পর্য্যন্ত মাটি ঢাকা দিয়া, সারদা আবার সেই চুবড়িটী হাতে করিয়া লইল, ঢাকনটা পূর্ব্ববৎ ঢাকা দিল, আঁচল ঢাকা দিয়া কক্ষদেশে রাখিল; একহস্তে খন্তাখানা লইয়া বাগান হইতে বাড়ীর ভিতর চলিল;—ভাবিতে ভাবিতে গেল, একে একে এই মোহরগুলি ভাঙাইব, গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রাখিব, যখন যেমন বুঝিব, তখন সেইরূপ দরিদ্র লোকের উপকারে দান করিব; অন্যকার্য্যে খরচ করিব না, কাহাকেও জানিতে দিব না; মহালক্ষ্মী দিয়াছেন, কেবল মহালক্ষ্মীই জানিবেন।

সারদার আশা পূর্ণ হইল। সেদিন মঙ্গলবার। শনিবার রাত্রে শচীন্দ্র আসিলেন; তাঁহার সেবায় যতটুকু সময় যায়, ভক্তিভাবে ততটুকু সময় ব্যয় করিয়া সারদাসুন্দরী মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব পড়িল; শান্তিপর্ব্বে পুণ্যকর্ম্ম, দানধর্ম্ম, ব্রত-নিয়ম ও নানাবিধ ধর্ম্মোৎসবের বেশী কথা; সারদাসুন্দরী অন্যদিন অপেক্ষা অধিক মনোযোগে সে সকল ধর্ম্মকথা পাঠ করিতে লাগিল। মা আসিলেন, মাসী-মা আসিলেন, মামীছুটী আসিলেন, ছোট মামাও আসিল। ছোট মামার নাম রত্নেশ্বর।

সকলে সারদাকে ঘেরিয়া বসিলেন, অদূরে একখানি স্বতন্ত্র আসনে শচীন্দ্রশেখর।

পাঠ সমাপ্ত হইল, আহারাদি হইল, সকলে স্ব স্ব স্থানে শয়ন করিলেন, রাত্রি একপ্রহর অতীত। শচীন্দ্রশেখর শয্যায় শয়ন করিলেন, মশারিটী ফেলিয়া দিয়া, পদতলে বসিয়া সারদাসুন্দরী সানন্দে পতির পদসেবা করিতে লাগিল। দুইচারি কথার পর সারদা বলিল, "আজ তুমি ক্লান্ত হয়ে এসেছ, বেশীক্ষণ জাগা হবে না, তবু একটি কথা ব'লে রাখি। ঘুমিও না যেন এখুনি, আবার আমি পান দিব, তামাক দিব, আদর কোর্‌বো, কথাটি আমার ভাল কোরে শুনে রাখো।"

হাসিয়া শচীন্দ্র বলিলেন, "অত ভূমিকা হচ্ছে কেন, যা বল্‌তে হয়, একেবারে বলে ফেল। আমি তোমার কোন কথায় অবাধ্য নই।"

সারদা বলিল, "বাধ্য অবাধ্যের কথা হচ্ছে না, খুব ভাল কথা। পরমেশ্বর আমার প্রতি মুখ তুলে চেয়েছেন। হঠাৎ আমি একটা গুপ্তধন পেয়েছি।"

সচকিতে শচীন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "গুপ্তধন!—কি রকম গুপ্তধন?"

মঙ্গলবার বৈকালে পুষ্পোদ্যানে নূতন পুষ্পতরু রোপণ করিতে গিয়া যাহা যাহা হইয়াছিল, সারদা একে একে সেই সকল কথা ব্যক্ত করিল। শচীন্দ্রশেখর বিস্মিত হইলেন, আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "সত্যই পরমেশ্বর মুখ তুলে চেয়েছেন। সেগুলি তুমি রেখেছ কোথা?"

সারদা উত্তর করিল, "ঠিক জায়গায় রেখেছি। কেহই

কিছু জান্‌তে পার্‌বে না। সোমবার সকালে দুটী মোহর তোমাকে আমি দিব, চুপি চুপি কেষ্টনগর থেকে ভাঙিয়ে এনে চুপি চুপি আমায় তুমি টাকাগুলি দিও।"

শচীন্দ্র বলিলেন, "এখনি ভাঙাবে কেন?—চুপি চুপি আন্‌তে হবে, চুপি চুপি তোমায় দিতে হবে, এ কথাই বা বোল্‌ছো কেন?"

সারদা বলিল, "আমার দরকার আছে। চুপি চুপি টাকা এনে আমায় দিও।"

শচীন্দ্রশেখর আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, "তাহাই হইবে" বলিয়া সম্মত হইলেন।

অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া সারদাসুন্দরী খট্টার উপর হইতে একবার নামিয়া আসিল, মুখ টিপিয়া হাসিয়া তাম্বুল প্রদান করিল, আর একছিলিম তামাক সাজিয়া দিয়া, সট্‌কার সুদীর্ঘ নলটি পতির করকমলে সমর্পণ করিল। তাহার পর শয়ন।

প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া, পতির পদরেণু মস্তকে ধারণ করিয়া সারদাসুন্দরী গৃহ হইতে বাহির হইল, জননীর চরণ বন্দনা করিয়া, নিত্য যেমন করিয়া থাকে, সেইরূপ অপরাপর গুরুজনকে প্রণাম করিল। নিয়মিত নিত্যকর্ম্মে যতটুকু সময় যায়, ততটুকু সময় যাপন করিয়া, সাবধানে-সযত্নে পতির পরিচর্য্যা করিল। আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর সমবয়স্কা সঙ্গিনীদের সঙ্গে খানিকক্ষণ খোসগল্প করিল; রবিবার জামাই বাবু বাড়ীতে থাকেন, যে সকল প্রতিবেশিনী-কন্যার সহিত পরিহাসের সম্পর্ক, বৈকালে তাহারা আসিয়া জামাইবাবুর সহিত প্রাণ খুলিয়া রসালাপ করিল। দিনমান কাটিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর নিত্য যেমন যেমন হয়, শচীন্দ্র বাড়ীতে থাকিলে যেমন যেমন হয়, ঠিক ঠিক সেই সেই অনুষ্ঠান হইল; কিঞ্চিৎ অধিক রাত্রে নিদ্রা।

সোমবার ভোরে রন্ধন হইল, শচীন্দ্রশেখর প্রভাতে আহার করিয়া কর্ম্মস্থলে রওনা হইলেন, সারদার দুটী গুপ্ত মোহর গুপ্তভাবে তাঁহার সঙ্গে রহিল। সেইদিন বৈকালে সারদাসুন্দরী পাড়ার একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া আনিল, ছোট মামা রত্নেশ্বর তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া দিল। ব্রাহ্মণের নাম গদাধর ভট্টাচার্য্য। বাড়ীর কর্ত্তা তাহাকে গদাই দাদা বলিয়া ডাকেন, সারদা গদাই দাদাকে ঠাকুরদাদা বলে। গদাই যখন আসিলেন, তখন সেই পূর্ব্ববঙ্গের ঠানদিদিটী রাধারাণীর ঘরে বসিয়া সারদার সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন, গদাইকে দেখিয়া সারদা উঠিয়া তাঁহাকে নিজের শয়নকক্ষে লইয়া চলিল। রঙ্গ দেখিয়া রসিকা ঠাকুরাণী বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "ঈ—ঈ—ঈস্!—দাদার সঙ্গে সারদার যে ভারি পিরীত!"

গদাইকে লইয়া সারদা আপনার শয়নঘরে প্রবেশ করিল, দাদাকে একখানি আসনে বসাইয়া বাঁধাহুঁকায় একছিলিম তামাক সাজিয়া দিয়া, আপনি নিরাসনে বসিল; ঘরের দরজার দিকে মুখ ফিরাইয়া একবার চাহিয়া, তখনি আবার দাদার দিকে ফিরিয়া চুপি চুপি বলিল, "ঠাকুরদ্দা! আমার জন্য আপনাকে একটু পরিশ্রম কোত্তে হবে।"

হাসিয়া ঠাকুরদাদা বলিলেন, "কি পরিশ্রম দিদি?"

সারদা চুপি চুপি বলিল, "ব্রাহ্মণ শূদ্রের মধ্যে এই গ্রামে কত ঘর খুব গরিব আছে, কি রকমে তাদের চলে, আর কেহ তাদের

সাহায্য করে কি না,আপনি দয়া কোরে সেই খবর জেনে আমায় বোল্‌বেন। না না,—বোল্‌লে আমার মনে থাক্‌বে না, আপনি একখানি ফর্দ্দ লিখে আন্‌বেন। নামগুলি যেন স্পষ্ট স্পষ্ট লেখা থাকে। কথাটা কিন্তু কাহারো কাছে এখন ভাঙবেন না। মা যদি জিজ্ঞাসা করেন, আপনি বোল্‌বেন, দরকার ছিল; এইটুকু ছাড়া একটিও বেশী কথা বোল্‌বেন না।"

মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়াও, গদাই দাদা দ্বিতীয় কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, সন্ধ্যা হইতেছে বলিয়া, তাড়াতাড়ি উঠিয়া, গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, রাধারাণীর সঙ্গে একবার দেখা করিয়া শীঘ্র শীঘ্র বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সারদা দরিদ্রলোকের ফর্দ্দ চাহিল কেন, ন্যায়শাস্ত্রমতে মনে মনে তর্ক তুলিয়া গদাই দাদা মনে মনেই সিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন, হয় তো নিমন্ত্রণ কোরে খাওয়াবে। পাঁচদিন পরে গদাধর ভট্টাচার্য্য একখানি ফর্দ্দ আনিয়া গোপনে সারদার হাতে দিয়া গেলেন; পাঁচদিন পরে শচীন্দ্রশেখর শনিবার পাইয়া গৃহে আসিলেন; কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ।—গদাই আসিয়াছিলেন বৈকালে, শচীন্দ্র আসিলেন সন্ধ্যার পর।

নিয়মিত কার্য্য অবসানে সারদা যখন মহাভারত পড়িতে বসিল,শচীন্দ্র তখন তাহার গা ঘেঁষিয়া বসিয়া একদৃষ্টে সেই সুন্দর মুখখানি দেখিতে লাগিলেন। নন্দরাণী তখন আইসেন নাই, রাধারাণীও আইসেন নাই, খানিকক্ষণের জন্য নিবা কাঁকের ঘর। কপাট দুখানি ভেজান আছে, আলোটি খুব নিকটে আছে, মুখখানি দেখিবার বেশ সুবিধা। শচীন্দ্রশেখর প্রাণ ভরিয়া সারদার সুন্দর বদনখানি সন্দর্শন করিতেছেন। রাঙা রাঙা

ঠোঁট দুখানি কাঁপিতেছে, নাকের-নোলকের মুক্তটি অল্প অল্প দুলিতেছে, উভয় কর্ণের নীলমণি দুল দুটি একটু একটু নাচিতেছে, কপালের সুকুঞ্চিত কেশগুলি ফুর্ ফুর্ করিয়া উড়িতেছে, সুবক্র ভ্রূ-যুগলের নিম্নদেশে বড় বড় উজ্জ্বল চক্ষু দুটি শান্তিপর্ব্বের অক্ষরের উপর স্থির হইয়া রহিয়াছে, শচীন্দ্র অনিমেষনেত্রে সেই অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিতেছেন; হৃদয়ে আনন্দসিন্ধু উথলিতেছে; জগতে যত প্রকার আনন্দ আছে, তৎসর্ব্বাপেক্ষা মধুর আনন্দ, বিশুদ্ধ প্রেমানন্দ;—শচীন্দ্রশেখর সেই প্রেমানন্দ-সাগরে অবগাহন করিতেছেন, প্রেমানন্দ-হিল্লোলে তাঁহার প্রাণ মন সুশীতল হইতেছে, চক্ষুরূপ রসনা দ্বারা তিনি সেই প্রেমানন্দ সুধা পান করিতেছেন। চমৎকার মধুর আস্বাদন। ভাগ্যক্রমে যাঁহারা এই সুধা প্রাপ্ত হন, মরণশীল সংসারে মরিতে আসিয়াও তাঁহারা অমর।

নন্দরাণী দর্শন দিলেন। একটু যেন অপ্রস্তুত হইয়া শচীন্দ্রশেখর স্বতন্ত্র আসনে গিয়া বসিলেন। স্নেহময়ী ছোট মাসী নন্দরাণী প্রফুল্ল আননে পাঠিকার বামদিকে একটু সম্মুখে হেলিয়া বসিলেন; পুস্তকের দিকে চক্ষুদুটী সমাকৃষ্ট রহিল। হঠাৎ একবার মুখ তুলিয়া শচীন্দ্রের দিকে চাহিয়া সকৌতুকে নন্দরাণী বলিলেন, "জামাইটি আমার এইবার ভগবৎপ্রেমে মগ্ন হয়ে পড়েছেন। তাই ত আমি চাই। যারা ইংরাজী পড়ে, তারা প্রায় আমাদের ধর্ম্মকথা শুন্‌তে চায় না। শচী আমার সে দরের ছেলে নয়। বেঁচে থাক বাবা। কৃষ্ণপ্রেমে মতিমান্ হও।"—মুখ ফিরাইয়া সারদার দিকে চাহিয়া মাসী-মা বলিলেন, "পড়ো মা—পড়ো।

সারদাসুন্দরী পাঠ করিতে লাগিল। হরিমন্দির মার্জ্জনার ফল, শিবমন্দির মর্জ্জনার ফল, শিবরাত্রি ব্রতের ফল, অতিথি-সেবার ফল, এই সকল পড়িতে পড়িতে একটি স্থান দেখিয়া সারদা একবার চকিতনেত্রে মাসীমার মুখের দিকে চাহিল।

মাসীমার চক্ষু পুস্তকের দিকেই ছিল, সারদার চমকিত ভাব দেখিয়া, পড়িতে পড়িতে থামিতে দেখিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "পড়ো না, থাম্‌লে কেন?—হয়েছে কি?—পড়ো না, বেশ কথা;—একাদশীব্রত কথা;—বেশ কোরে পড়।"

শচীন্দ্রের মুখের দিকে আড়নয়নে একবার কটাক্ষপাত করিয়া, কিয়ৎক্ষণ একটু ইতস্ততঃ করিয়া, মৃদুস্বরে সারদা বলিল, "অনেকবার পড়েছি, শ্রীহরিকে প্রণাম করি, তিনি যেন আমার অপরাধ গ্রহণ না করেন,—আমি অবলা,—আমি ছেলে-মানুষ, ঠাকুরেরা ছেলে-মানুষের অপরাধ লন না;—অনেকবার আমি পড়েছি, কিন্তু ভাল ক'রে মর্ম্মার্থ বুঝ্‌তে পারি না।—এই বলিয়া দুই হাত কপালে তুলিয়া শ্রীহরির উদ্দেশে প্রণিপাত করিল।

ভাব দেখিয়া, কথাগুলি শুনিয়া একটু সন্দেহে সন্দেহে নন্দরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মর্ম্মার্থ বুঝ্‌তে পার না—কেন? কি এত জটিল? ঋষিবাক্য, ঋষিরা যা বলেছেন, সেইটিই ত মর্ম্মার্থ।"

ম্লানমুখে সারদা বলিল, "ঋষিবাক্য, সেটা বুঝি, কিন্তু উপবাসে কিরূপ ধর্ম্ম হয়, কেবল সেইটুকু বুঝ্‌তে পারি না।"

প্রতিধ্বনি করিয়া শচীন্দ্র বলিলেন, "আমিও কেবল সেইটুকু বুঝ্‌তে পারি না। উপবাসে কিরূপ ধর্ম্ম? দেবদেবীর নামে

উৎসবে উৎসবে বরং উত্তমরূপে আহার কোরে পরিতৃপ্তচিত্তে ভক্তিভাবে তাঁদের ডাক্‌লে হৃদয়ে শান্তি আসে, উপবাসের কষ্টে সে শান্তি আসে না।"

রাধারাণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনজনের মুখপানে এক একবার চাহিয়া, চকিতস্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? পড়াটি বন্ধ রয়েছে কেন?"

কারণ বুঝাইয়া দিয়া নন্দরাণী বলিলেন, "বন্ধ রয় নাই, একটা তর্ক উঠেছে। তুমি এসেছ, মীমাংসা কোরে তোমার মেয়েকে আর তোমার জামাইটিকে বুঝিয়ে দাও।"

রাধারাণী বসিলেন; একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, "এর নাম বুঝি তর্ক?—ছিঃ! দেবতাদের কথায় কি তর্ক কোত্তে আছে? মুনিঋষির বাক্যে কি তর্ক কোত্তে আছে? ওসব তর্ক তুলো না। যা যা তাঁরা বলে গেছেন, সব ঠিক। কেবল তাই বা কেন, কাজেও তো মিল্‌ছে। ধর্ম্মের নামে যাঁরা উপবাস করে, উপবাস তাঁদের লাগে না। উপবাস কোরে থাক্‌লে ভক্তি বরং বেশী হয়।"

মীমাংসা হইল, তথাপি মৃদুস্বরে সারদা জিজ্ঞাসা করিল, "আহারে কি ভক্তি কম হয়ে যায়?"

রাধারাণী বলিলেন, "কম হয়ে যায় না, কিন্তু কতক লোকের ভক্তি একেবারে উড়ে যায়। আমাদের দেশে ব্যবহার আছে, পূজা আহ্নিক না কোরে জলগ্রহণ কোত্তে নাই। সেই শাসনটা আছে বোলেই পূজা আহ্নিকে লোকের মতি থাকে; পূজা আহ্নিক না কোল্লে খেতে পাবে না, সেই একটা ভয় থাকে; সেইজন্যই ষোলআনা হোক্, আর আধখানা হোক্, সিকিখানা

হোক্, কতকগুলি মন্ত্রপাঠ কোত্তেই হয়। খেয়ে দেয়ে আরাম কোরে, সে রকম বাঁধাবাঁধি রাখা যায় না। ডাকি ডাকি, না ডাকি না ডাকি, খানিক পরে ডাক্‌বো, একবারে সন্ধ্যাকালে ডাক্‌বো, এই রকমে হেলায় হেলায় রাত দিন কেটে যায়, আসলেই ডাকা হয় না। বাঁধাবাঁধি আছে বোলেই অনেকটা রক্ষে হয়ে আস্‌ছে। তবে যদি বল, এক একদিন পূর্ণ উপবাস কোত্তে হয় কেন?—তার উত্তর এই যে, পরমেশ্বরকে ডাক্‌বার অনেকটা সময় পাওয়া যায়। আরো বিজ্ঞ বিজ্ঞ কবিরাজেরা বলেন, মধ্যে মধ্যে উপবাসে শরীর ভাল থাকে। সেই জন্যই ধর্ম্মশাস্ত্রমতে আর বৈদ্যশাস্ত্রমতে পর্ব্বে পর্ব্বে উপবাসের সৃষ্টি।”

কি যেন চিন্তা করিয়া সারদা বলিল, “বাঁধাবাঁধি আছে, না খেয়ে দেবপূজা কোত্তে হয় মানি, কিন্তু এখন অনেককেই দেখি, গলায় পৈতে ধপ্‌ ধপ্‌ করে, ওদিকে কিন্তু প্রাতঃকালে উঠে হাত-মুখ না ধুয়ে, বাসীকাপড় না ছেড়েই অম্লানমুখে জলযোগে বসে যায়।”

রাধারাণী বলিলেন, “তারা কদাচারী, তারা গোঁয়ার, তারা নাস্তিক। তাদের কথা ধরি না; তারাই আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম পয়মাল কর্‌বার জোগাড় কচ্ছে। বাঁধাবাঁধিটা আরো শক্ত কর্‌লে ভাল হয়। একটা দৃষ্টান্ত বলি শোনো। এদেশে একটা চলিত কথা হয়ে আছে, হরি ঘোষের বেগার। এক গ্রামে হরিঘোষ নামে এক জমীদার ছিলেন, ধর্ম্ম কর্ম্মে তাঁর বড় মন; তিনি আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন, তাঁর অধিকারের মধ্যে যে সকল ব্রাহ্মণ আহারের পূর্ব্বে সন্ধ্যাহ্নিক না কর্‌বে, তিনি তাদের ব্রহ্মোত্তর জমী কেড়ে নিয়ে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিবেন। গ্রামের

সকলেই তাঁকে ভয় কর্‌তো, ভিটে ছাড়া হবার ভয়ে সকলেই যথাসময়ে সন্ধ্যাহ্নিক কর্‌তো,—কর্‌তো কিন্তু লোকের কাছে বল্‌তো, হরিঘোষের বেগার। একদিন একজন ব্রাহ্মণ বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত অনাহারে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ফিরে, অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে ঘরে আসেন; ব্রাহ্মণী বলেন, বেলাটা একেবারে গিয়েছে, আজ আর চ্যান ধ্যান কোরে কাজ নেই, কাপড় ছেড়ে ভাত খাও। ব্রাহ্মণ বলেন, তা কি হয়? রোসো রোসো, আগে হরিঘোষের বেগার দি, তারপর যা হয় হবে। এই বলিয়া তাড়াতাড়ি তেল মাখিয়া, তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া, তাড়াতাড়ি মূলকাটি সন্ধ্যা গায়ত্রী জপিয়া, হরিঘোষের বেগার শেষ করিয়া, তাহার পর আহারে বসিয়াছিলেন। সেই রকম বাঁধাবাঁধি যদি সব জায়গায় চলে, বেগার দেওয়া হলেও সকলে যদি পরমেশ্বরকে ভুলে যেতে না পারে, তা হলেও দেশের অনেক মঙ্গল হয়।"

শচীন্দ্র, নন্দরাণী ও সারদা, তিনজনেই মাথা হেঁট করিয়া মৃদু মৃদু হাসিলেন। সারদার গায়ে হাত বুলাইয়া রাধারাণী বলিলেন, "পড় মা, একাদশী ব্রতের ফল খুব ভাল, তুমি পড়।"

সারদাসুন্দরী একাদশীর ব্রত কথা সুর করিয়া পাঠ করিল। সে রাত্রে সেই পর্য্যন্তই মহাভারত সমাপ্ত। অতঃপর আহারাদির আয়োজন। রাধারাণী ও নন্দরাণী গৃহ হইতে বাহির হইলেন। অনেকক্ষণ শচীন্দ্রের তামাক সেবা হয় নাই, সারদাসুন্দরী হাসিতে হাসিতে একছিলিম তামাক সাজিয়া দিয়া, বাটা খুলিয়া, পান সাজিতে বসিল।

শচীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তামাক সাজ্‌তে সাজ্‌তে হাস্‌লে কেন?"

সারদা বলিল, "ধোঁয়ার সঙ্গে আলাপ না কোরে অনেকক্ষণ তুমি বেশ থাক্‌তে পার,—তাই।"

আহারাদি হইয়া গেল, ভোজনপাত্রগুলি বাহিরে লইয়া গিয়া, সারদাসুন্দরী প্রসাদ পাইল; শচীন্দ্রশেখর শয়ন করিলেন। গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া সারদাসুন্দরী পতির পদসেবা করিতে বসিল।

মোহর ভাঙ্গাইয়া টাকাগুলি আনা হইয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করিলে যদি কোন দোষ হয়, তাহাই ভাবিয়া সারদা সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না;—জিজ্ঞাসা করিতেও হইল না। দুটী চারিটী অন্য কথার পর শচীন্দ্রশেখর আপনা হইতেই বলিলেন, "সারু! তোমার টাকা এসেছে, সেগুলি নিয়ে এখন তুমি কি করবে, জিজ্ঞাসা কোত্তে পারি কি?"

সারদা বলিল, "সেই দিন তো বলেছি, আমার দরকার আছে। তোমার কাছে কিছুই আমার গোপন থাক্‌বে না, যখন সময় আস্‌বে, সব কথাই তুমি জানতে পার্‌বে। রাত্রে আর নয়, কাল একখানা কাগজ তোমায় দেখাব।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া শচীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেখানা কি কাগজ?"

সারদা বলিল, "দেখ্‌লেই বুঝতে পার্‌বে। আমি এখন তার কি পরিচয় দিব?"

সে প্রসঙ্গে তখন আর অন্য কথা হইল না, অপরাপর পাঁচ কথার আলোচনার পর, পতিকে নিয়মমত পান তামাক দিয়া সারদাসুন্দরী শয়ন করিল।

রজনী প্রভাতে সারদা নিত্য নিত্য যাহা করে, সে কার্য্য-

গুলি সমাধা করিয়া যথারীতি পতির পরিচর্য্যা করিল ; সংসারের যে যে কার্য্যের ভার তাহার উপর, হাসিয়া হাসিয়া সেগুলি অতি পরিপাটিরূপে নির্ব্বাহ করিল ; আহারান্তে শচীন্দ্র কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলেন ; ক্ষণকালের জন্য সারদা একটু নিশ্চিন্ত।

বৈকাল।—গৃহের দ্বার ভেজাইয়া দিয়া, শচীন্দ্রকে কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইয়া, পান তামাক দিয়া, সারদাসুন্দরী তাঁহার নিকটে গিয়া বসিল ; তখনি শীঘ্র শীঘ্র উঠিয়া, একটি বাক্স খুলিয়া, একখানি কাগজ বাহির করিয়া আনিয়া, শচীন্দ্রের হস্তে দিল ; নিকটে বসিয়া, মুখপানে চাহিয়া, মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দেখ দেখি, ওখানা কি ?"

কাগজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া শচীন্দ্র বলিলেন, "গোটা-কতক নাম।—এ সব কাহাদের নাম ? নামের পাশে পাশে কতকগুলি বিবরণ লেখা—এ কাগজ তোমার কাছে কেন ?"

পাঠক মহাশয় স্মরণ করিবেন, কল্য বৈকালে গদাই দাদা যে ফর্দ্দখানি দিয়া গিয়াছিলেন, এখানি সেই ফর্দ্দ।

পতির মুখপানে চাহিয়া সারদা বলিল, "কেন আমি তোমাকে মোহর ভাঙাতে দিয়েছিলেম, সেই কথা এখন বলি। ফর্দ্দে যাদের যাদের নাম দেখ্‌তে পাচ্চো, তারা বড় গরিব ; তাদের কিছু কিছু সাহায্য করি, এই আমার বাসনা।"

একটু হাসিয়া শচীন্দ্র বলিলেন, "আমিও তো ভারি গরিব, এই সঙ্গে আমাকেও কিছু সাহায্য কোল্লে ভাল হয় না ?"

সারদা। আমি ত তোমারি, তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। এখন আমি যে কথাটি বল্লেম, তাতে তোমার মত কি ?

শচী। অতি উত্তম বাসনা ; কিন্তু কি রকমে সাহায্য

পাঠাবে? নিজেই গরিবের বাড়ী বাড়ী গিয়ে দিয়ে আস্‌বে কি?

সারু। সেইটিই আমি ভাব্‌ছি। গোপনে গোপনে পাঠিয়ে দেওয়া আমার ইচ্ছা;—কে দিলে, কি কোল্লে, যারা পাবে, তারাও যেন সেটা জান্‌তে না পারে, সেইটী হলেই ভাল হয়। আমার মনের কথা আমিই জানি, আর—তুমি আমার প্রাণধন, তুমিই জান্‌তে পাল্লে, তা ছাড়া আর কেহ কিছুই জান্‌তে পার্‌বে না। মাকেও বলিনি, মাসীমাকেও বলিনি, কাউকে কিছু বলিনি;—মনে মনে আছে, তাঁরা যদি অন্য কোন সূত্রে জান্‌তে না পারেন, সব কথা চাপা থাক্‌বে; আমি মুখ ফুটে এ বিষয়ে কোন কথাই তাঁদের কাছে বল্‌বো না।

শচী। ফর্দ্দখানা এনে দিলে কে?

সারদা। (একটু ভাবিয়া) আমার একটি ঠাকুরদাদা খুব বিশ্বাসী, খুব গম্ভীর, খুব চাপা। তিনি আমাকে খুব ভালবাসেন।

শচী। (হাস্য করিয়া) আমার ভয় হচ্ছে। তোমার সেই ঠাকুরদাদা যখন তোমাকে খুব ভালবাসেন, তখন আমার এই ভয়—পাছে তিনি আমার সতীন হন!

সারদা। (লজ্জায় মৃদু হাসিয়া) সে ভয় তোমাকে কোত্তে হবে না—সারদাসুন্দরী সংসারে তুমি ছাড়া আর কাহারো হবে না; সারদা যত দিন বাঁচ্‌বে, ততদিন একাদিমনে কেবল তোমারি ঐ পাদপদ্ম পূজা কোর্‌বে। তোমার সতীন কদাচ সারদার ত্রিসীমায় ঘেঁস্‌তে পার্‌বে না।

শচী। (সস্নেহে সারদার মুখ চুম্বন করিয়া) তাঃ আমি

জানি—তা আমি জানি, মাঝখান থেকে একটু রঙ্গ কোরে নিলুম। এখন কাজের কথা কও—কার হাতে দিয়ে গরিব লোকের সাহায্য পাঠাবে স্থির করেছ ?

সারদা। স্থির এখনো কিছু কোত্তে পারিনি, মনে মনে কর্ ছি, সেই ঠাকুরদাদাকেই মাঝখানে রাখ্ বো।

শচী। তাকে যদি তুমি সত্য সত্য খুব বিশ্বাসী বোলে জান্‌তে পেরে থাক, তবে সেই পরামর্শই ভাল। (পুনরায় চুম্বন করিয়া) দেখ সারু, আমি যেন বুঝ্ তে পাচ্ছি, পূর্ব্বজন্মে তুমি দেবকন্যা ছিলে। গোপনে দান কর্ বার ইচ্ছা যাদের যাদের হয়, তাদের হৃদয়ে দেবতার আবির্ভাব থাকেই থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ, তোমার দক্ষিণ হস্ত যে সৎকার্য্য কোর্ বে, তোমার বাম হস্ত যেন সে কার্য্য জান্‌তে না পারে। বাইবেল আমাদের ধর্ম্মপুস্তক নয়, কিন্তু মহাত্মা প্রভু যিশুখৃষ্টেরও ঐরূপ উপদেশ।

সারদা। অত শত আমি বুঝি না—আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, আমার ক্ষুদ্র প্রাণ, ভগবান সদয় হয়ে আমাকে গুপ্তধন দিয়াছেন, গুপ্তভাবেই আমি সেই ধনের সদ্‌ব্যবহার কোর্ বো, কেবল এইটুকু মাত্রই আমি বুঝি।

হঠাৎ গৃহদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। চঞ্চলহস্তে কাগজখানি সারদার হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া, শচীন্দ্রশেখর একটু দূরে সরিয়া গিয়া একখানি ভিন্ন আসনে উপবেশন করিলেন। হাসিতে হাসিতে দুটি প্রতিবেশিনী যুবতীর প্রবেশ। দুজনেই সারদার সমবয়স্কা; ভবভাবিনী আর যোগেন্দ্রবালা। ভাবিনীটি সারদার বকুলফুল, আর যোগেন্দ্রবালা সারদার দেখনহাসি। যখনকার

কথা, তখন পোমেটম, ল্যাভেণ্ডার, অডিকলম ইত্যাদি আদুরে সম্বন্ধের চলন ছিল না, যদিও হইয়া থাকে, সহরে হইয়াছিল, পল্লীগ্রামে ছিল না। বকুলফুল বসিল, দেখনহাসি বসিল, নূতন নূতন কথার তরঙ্গ উঠিল। শচীন্দ্রশেখর তাহাদের সঙ্গে অনেক রকম রসিকতা করিলেন, সারদা মধ্যে মধ্যে টিপ্পনী কাটিয়া তিন জনকেই হাসাইয়া দিল। তাহাদের রঙ্গরস দেখিয়া শুনিয়া সূর্য্যদেবের লজ্জা হইল, সূর্য্য আস্তে আস্তে মুখ ঢাকিয়া অস্তাচলে লুকাইতে চলিলেন। মজলিস্ ভঙ্গ হইল।

রবিবার রজনী। দুর্গাপূজার নবমীর রজনীতে ভক্তের মন যেরূপ বিচলিত হয়, আনন্দ থাকিলেও, রবিবার রজনীতে সারদার মন সেইরূপ বিচলিত। নিয়মত কার্য্য যেরূপ হইয়া থাকে, তৎসমস্তই ঠিক ঠিক হইল, কিন্তু শচীন্দ্রের ও সারদার নিদ্রসুখানুভব অতি অল্প। সোমবার প্রভাতে শচীন্দ্রশেখর আহারাদি করিয়া কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলেন, সারদা অন্যান্য কার্য্যে ব্যাপৃতা হইল।

সেদিন আর গদাইদাদাকে খবর দেওয়া হইল না। রাত্রিকালে নির্জ্জনে সারদাসুন্দরী গণিয়া দেখিল, পঞ্চাশ টাকা। এক একটি মোহরের দাম পঁচিশ টাকা। টাকাগুলি তুলিয়া রাখিয়া সারদা তখন ভাবিতে ভাবিতে হিসাব করিতে বসিল। ফর্দ্দে লেখা আছে, বাইশটি নাম; বাইশঘরে পঞ্চাশটাকা কি হিসাবে বণ্টন করা যায়?—সব ঘরে সমান দিলে হইবে না; পরিবারের মধ্যে কমী বেশী আছে; কোন পরিবারে পাঁচটি, কোন পরিবারে তিনটি, কোন পরিবারে দুটি লোক; কোন কোন পরিবারে কেবল এক একটি মাত্র অবীরা বিধবা। সে

কথাও ফর্দ্দে লেখা আছে। কোন কোন স্ত্রীলোক সামান্য বেতনে লোকের বাড়ী দাসীবৃত্তি করে, কেহ কেহ অন্য লোকের ধান ভানে, কেহ কেহ মাঠের গোবর কুড়াইয়া ঘুঁটে বিক্রয় করে, তাহাতেই অতিকষ্টে দিন চলে। যাহাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আছে, তাহাদেরি বেশী কষ্ট। সারদা ভাবিল, যে বাড়ীতে যত লোক, সেই হিসাবে হার-হারি-মতে টাকা ভাগ করিয়া দিতে হইবে। যে বাড়ীতে পাঁচজন, সে বাড়ীতে পাঁচ-টাকা, যে বাড়ীতে তিনজন, সে বাড়ীতে তিন টাকা, যে বাড়ীতে একজন, সে বাড়ীতে দুটাকা;—কাহাকেও একটি টাকা দেওয়া যাইতে পারে না, সেটা যেন কেমন এক রকম ছোট ছোট মনে হয়। দু-টাকার কমে সাহায্য করা ভাল হয় না। মাসে মাসে ঐ রকম হার-হারি বরাদ্দ করিয়া রাখা হইবে। এবারে ত পাইয়াছি পঞ্চাশ টাকা;—হার-হারি-মতে সকল ঘরে পঞ্চাশ টাকায় যদি না কুলায়, দুই-পাঁচ ঘর যদি বাকী থাকে, আগামী হপ্তায় আবার দু-খানি মোহর ভাঙাইব। সিঁদুর চুব্‌ড়িটি খুব বড়;—ঠাকুরের দেওয়া কি না,—ছোটই বা কেন হবে,—বেশ প্রশস্ত চুব্‌ড়িটি। সেই মঙ্গলবার রাত্রেই গণিয়া দেখিয়াছি, এক হাজার মোহর। মা মঙ্গলচণ্ডীকে নমস্কার, মা লক্ষ্মীকে নমস্কার, একহাজার মোহরে অনেক দিন আমি মনোবাসনা পূর্ণ করিতে পারিব।

মনোরাজ্যে সারদার শুভ বাসনার অধিষ্ঠান। হিসাব করিয়া উৎসাহ আসিল, আনন্দ আসিল, ভরসা আসিল। নিশ্চিন্তমনে সারদা তখন শয়ন করিতে গেল। একবারে নিশ্চিন্ত নয়;—মানুষ একেবারে চিন্তা ছাড়া থাকিতে পারে না,

একটা না একটা চিন্তা মনের ভিতর থাকেই থাকে ;—কাহারো সুচিন্তা, কাহারো দুশ্চিন্তা, কাহারো কাহারো কুচিন্তা। সাধু লোকের চিন্তার সঙ্গে বদমাস লোকের চিন্তার স্বর্গ নরক প্রভেদ। সারদাসুন্দরীর মনে সুচিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা স্থান পায় না। সারদাসুন্দরী শয়ন করিল।

সপ্তাহের মধ্যে পাঁচ রাত্রি সারদা একাকিনী শয়ন করে। দৈবাৎ ঘর জামাই মেসোমশাইটি যেদিন যেদিন কার্য্যগতিকে স্থানান্তরে যান, সেই সেই রাত্রে নন্দরাণী আসিয়া সারদার কাছে শয়ন করে।

মঙ্গলবার গুপ্তধন লাভ হইয়াছিল, আবার মঙ্গলবার আসিল। সেইদিন বৈকালে সারদাসুন্দরী রত্নেশ্বরকে দিয়া গদাইদাদাকে ডাকাইল। গদাইদাদা আসিলেন, সারদা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নিজের শয়নঘরে লইয়া গেল। সারদা যখন আপনার ঘরে ঠাকুরদাদার সঙ্গে কথা কয়, আড়ি পাতিয়া সে কথা শোনে, সে বাড়ীতে তেমন লোক কেহই ছিল না ;—সারদা সুতরাং ঘরের দরজা খুলিয়া রাখিয়াই, নির্ভয়ে নির্ভাবনায় গদাইদাদার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিল। একটু বিশেষ এই যে, কথাগুলি চুপি চুপি।

সারদা বলিল, "ঠাকুরদ্দা! বেশ ফর্দ্দ হয়েছে। তারা বাইশ-জন। মাসে মাসে যদি তাদের পঞ্চাশ টাকা সাহায্য করা যায়, তা হলে বোধ হয় কতকটা স্বচ্ছন্দে চল্‌তে পারে। কেমন, আপনি কি বলেন ?"

গদাই। বোল্‌বো কি দিদি—তোমার কথাটা আমি ভাল কোরে বুঝ্‌তেই পাল্লুম্ না। গরিবের মুখপানে চেয়ে, মাসে

মাসে পঞ্চাশ টাকা দান করে, এমন লোক এ গ্রামে আছে কে? দেখ্‌ছ না, আপনাদের মা-বাপকে ভাত দিতে অনেক বেটা বেটী মুখ বাঁকায়। তা থাক, ও কথাটা আমায় কেন তুমি জিজ্ঞাসা কোচ্ছো? হাঁ, ভাল কথা!—তুমি যে সেদিন আমার কাছে গরিবের নামের ফর্দ্দ লিখিয়ে নিলে, সেটার মানে কি? কাগুখানা কি?—তোমার মৎলবটা কি? যেদিন তুমি ফর্দ্দ লিখে আনতে বলেছিলে, সেদিনও ও কথাটা আমি জিজ্ঞাসা করি নাই, ফর্দ্দখানা যেদিন তোমাকে আমি দিয়ে যাই, সেদিনও সেটা জিজ্ঞাসা কোত্তে ভুল হয়েছিল;—আজ আবার যখন সেই ফর্দ্দের কথা তুলেছ, তখন কাজে কাজেই জিজ্ঞাসা কোত্তে হলো।—বল ত দিদি, কি মৎলব?

সারদা। (মৃদু হাসিয়া) মৎলব ঠাকুরদা খুব ছোট্টো। দয়াময়ী মঙ্গলচণ্ডী দয়া কোরে আমাকে কিঞ্চিৎ ধন দান কোরেছেন, বোলো না যেন কারু কাছে, মাথার দিব্বি, সব গোপন; বুঝ্‌তে পেরেছ? জনপ্রাণীকেও কিছু বোলো না। মা মঙ্গলচণ্ডী আমাকে কিছু ধন দিয়েছেন, ধন ত অনেকেই পায়; পেটে খায় ছেলে-মেয়েকে খাওয়ায়, কুটুম-কুটুম্বিতে করে, যাদের বেশী ধন, তারা দোল-দুর্গোৎসব করে, ঘটা করে ছেলে মেয়ের বিয়ে দেয়, তা ছাড়া আরো কত রকমে কত ধন কত রকম বাজে খরচে উড়িয়ে পুড়িয়ে দেয়; ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, দুই-ই থাকে। মঙ্গলচণ্ডীর টাকা আমি কিন্তু সে রকমে খরচ কোত্তে ইচ্ছা করি না।

গদাই। (চক্ষু তুলিয়া সটান চাহিয়া) কি করা তোমার ?

সারদা। (প্রফুল্লবদনে) এক একবার ইচ্ছা হয় দুর্গাপূজা

করি ; আবার ভাবি, কতই বা টাকা, দুর্গাপূজার খরচে থাই দিতে পারবো না ; এক একবার ইচ্ছা হয়, গ্রামের সমস্ত গরিব লোককে নিমন্ত্রণ কোরে খাওয়াই ; সেই ইচ্ছাটাও ঠিক দাঁড়ায় না ; মনে হয়, একদিন খাওয়ালে তাদের কি উপকার হবে ? আমার আশা, আনন্দ, একদিনেই ফুরিয়ে যাবে ; সেটা ঠিক নয়। (একটু চিন্তা করিয়া) দেখ ঠাকুরদ্দা, আমি মনে কোরেছি, যে বাইশজন গরিবের নাম তুমি লিখে এনেছো, মাসে মাসে তাদের সকলকে কিছু কিছু মাসহারা বরাদ্দ কোরে দিই। আপনার মত কি ?

গদাই। (সবিস্ময়ে চাহিয়া, সারদাকে বিস্তর আশীর্ব্বাদ করিয়া) ও দিদি! ও আমার সোনামণি! তোমার পেটে এত বুদ্ধি ?—এই বয়েসে এতদূর ধর্ম্মজ্ঞান তোমার ? রাণী হও, রাণী হও! তোমার শচীন্দ্র রাজরাজেশ্বর হোক। তোমার পবিত্র গর্ভে স্থন্দর স্থন্দর রাজপুত্র, রাজকন্যা জন্মগ্রহণ করুক! (দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলীতে যজ্ঞসূত্র জড়াইয়া, সারদার মাথার কাছে ধরিয়া) ব্রহ্মণ্যদেবের নামে প্রাণ খুলে আমি আশীর্ব্বাদ কোচ্ছি, এই পুণ্যকর্ম্মে তোমার অক্ষয়স্বর্গ হবে।

সারদা। (ভট্টাচার্য্যের চরণে প্রণাম করিয়া) ঠাকুরদ্দা! তোমার আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য। কিন্তু তুমি যে আশীর্ব্বাদ কোচ্ছো—স্থন্দর স্থন্দর রাজপুত্র জন্মাবে, সেই কথাটার উপর আমার একটু টীকা আছে। রাজপুত্র হলেই পরমস্থন্দর হবে, রাজকন্যা হলে পরমস্থন্দরী হতেই হবে, সকল দেশেই এটা একরকম ধরা কথা ;—বাঁদরের মত রাজপুত্র, প্যাঁচার মত রাজ-কন্যা হলেও দেশের শাস্ত্রানুসারে তাদের পরমস্থন্দর পরমা-

সুন্দরী বোলে অনুমান কোরে নিতে হবে। বুঝ্‌লে দাদা, আমার গর্ভে যদি বাঁদর প্যাঁচা জন্মে, আর তোমার নাতজামাই যদি সত্য সত্য রাজরাজেশ্বর হয়, তবে তারা নিশ্চয়ই পরমসুন্দর বোলে গণ্য হবে। তা কিন্তু আমি চাই না; চাঁদই হোক্, কি প্যাঁচাই হোক্, কিছুতেই আমার দরকার নেই; এখনকার দিনে ভদ্রলোকের ঘরে ছেলে মেয়ে না হওয়াই ভাল। তা যাক্, ওসব কথা এখন থাক্, কাজের কথা ধর।

সারদাসুন্দরী উঠিয়া দাঁড়াইল; একটি বাক্স খুলিয়া পঞ্চাশটি টাকা আর সেই ফর্দ্দখানি বাহির করিয়া আনিয়া, আবার ঠাকুরদাদার কাছে বসিল; প্রথমে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরদ্দা! নামগুলি তোমার মনে আছে ত? না, এই ফর্দ্দখানি নিয়ে যাবে?"

গদাই বলিলেন, "কি কোত্তে হবে, আগে বলো, তারপর বিবেচনা। নাম আমার অনেক জানা আছে, যদিও দু একটা ভুল হয়, সকলের বাড়ী আমি চিনি।"

সারদাসুন্দরী টাকাগুলি গণনা করিয়া দুই থাক্ সাজাইল; একথাকে পঁয়তাল্লিশ টাকা, দ্বিতীয় থাকে পাঁচ টাকা। প্রথম থাক্‌টি ঠাকুরদাদার হাতে তুলিয়া ব্রতবতী বলিল, "ঠাকুরদ্দা! এই পঁয়তাল্লিশ টাকা ধর, চুপি চুপি নিয়ে যাও; যার বাড়ীতে যতগুলি পরিবার, বিবেচনামতে হিসেব কোরে, যাকে যেমন দিতে হয়, সেই রকমে বেঁটে দিও। উর্দ্ধসংখ্যা পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত আমার সীমা থাক্‌লো, তার বেশী আমি পেরে উঠ্‌বো না; সেই হিসাবে ভাগ কোরে কোরে দিও। পঁয়তাল্লিশ টাকায় সব ঘর যদি না কুলায়, ঘর কতক বাকী রেখে এসো;

আস্‌ছে হপ্তার শেষে দিব। যারা পাবে, তারা যদি জিজ্ঞাসা করে, কে দিয়েছে, আমার নাম কোরো না, নাম আমি চাই না। তাদের কোন কথায় তুমি কোন উত্তর দিও না, চুপি চুপি টাকা দিয়ে দিয়ে চোলে এসো।"

এই কথাগুলি বলিয়া সারদাসুন্দরী দ্বিতীয় থাকের উপর হস্তার্পণ করিল। পাঁচ টাকার থাক। সারদা সেই পাঁচটি টাকা ঠাকুরদাদার পায়ের কাছে রাখিয়া, গলায় কাপড় দিয়া প্রণাম করিয়া, মৃদুবচনে বলিল, "ঠাকুরদ্দা! এই তোমার যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী।"

গদাধর ভট্টাচার্য্যের মহা বিস্ময়। তিনি তখন সারদার মস্তকে করার্পণ করিয়া, পুনর্ব্বার আশীর্ব্বাদ করিয়া সগৌরবে বলিলেন, "সারদা! কি বোলে যে তোমায় আমি প্রশংসা কোর্‌বো, ভেবে পাচ্ছি না, বাসুকির মতন সহস্রমুখ পেলেও তোমার গুণ আমি বর্ণন কোত্তে পাত্তেম না। গরিবকে তুমি দান কোচ্ছো, খুব ভাল কর্ম্মই কোচ্ছো, কিন্তু তোমার নামটি প্রকাশ কোত্তে বারণ কোচ্ছো, দশের মুখে যশের আশা রাখ্‌ছো না, এমন নিঃস্বার্থ পুণ্যকার্য্য এখন আমি আর কুত্রাপি দেখ্‌তে পাই না,—শুন্‌তেও পাই না। স্ত্রীলোকের কথা দূরে থাক্‌, বড় বড় হোমরা চোমরা বাবুলোকেরাও কেবল নামের লোভে দান করেন। সাহেব লোকের খাতায় এক একজন হাজার, দশ হাজার পর্য্যন্ত চাঁদা দস্তখত করেন, দেশের এক একটা সৎকার্য্যেও কাহারো কাহারো কিছু কিছু দান করা আছে; সমস্তই কিন্তু নামের জন্য, ধর্ম্মের জন্য নয়। খবরের কাগজে নাম ছাপা হবে, বাহিরে বাহিরে খোস নাম বেরুবে, দশজনে বাহাদুর

বোল্‌বে সেই আকাঙ্ক্ষাতেই দান করা। সাহেবের খাতায় মোটা মোটা অঙ্কপাতের হেতু এই যে, রায়বাহাদুর হবেন, সি, এস, আই হবেন, রাজাবাহাদুর হবেন, মহারাজা উপাধি পাবেন, কেবল এই মৎলব। দান করা ত নয়, বড় বড় উপাধিপক্ষী শীকার কর্‌বার জাল পাতা। তুমি দিদি যা দেখালে, এমন দৃষ্টান্ত এ পর্য্যন্ত কেহই কোথায়ও দেখাতে পারেনি, বোধ হয় পার্‌বেও না। তুমি রাজ্যেশ্বরী হও, পাকাচুলে সিঁদুর পরো, পুত্রবতী হও। আবার আমি বল্‌ছি, অন্তে তোমার অক্ষয় স্বর্গলাভ হবেই হবে।”

বাহির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, ব্যগ্রভাবে ব্যগ্রস্বরে সারদা বলিল, “ও ঠাকুরদ্দা! সব বেলাটুকু চলে গিয়েছে! আর একটুও বেলা নেই! এই বেলা তুমি—”

বলিবার অপেক্ষা রহিল না, টাকাগুলি কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ফর্দ্দখানি লইলেন না; ব্যস্তপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া চলিলেন। পশ্চাতে পশ্চাতে ডাকিয়া সারদাসুন্দরী বলিল, “বোসো ঠাকুরদ্দা, আর একটুখানি বোসো;—ঠিক ভর্‌সন্ধ্যেবেলা যেও না, সন্ধ্যের পরেই যেও। একবারও তামাক খাওয়া হয় নাই, একছিলিম তামাক খাও। কাজের সময় এক একটা কাজ প্রায়ই আমি ভুলে ভুলে যাই; ওই কেমন একটা দোষ ধরেছে। বসো।”

গদাইদাদা বসিলেন। একছিলিম তামাক সাজিয়া দিয়া, ঘরে আলো জালিয়া সারদাসুন্দরী কপাটের কাছে দাঁড়াইয়া ধীর মৃদু মিষ্টবচনে বলিল, “বসো দাদা, তামাক খাও, আমি আস্‌ছি।”

এই কথা বলিয়াই সারদাসুন্দরী বাহির হইয়া গেল।—ঠাকুর প্রণাম করিয়া, জননীকে প্রণাম করিয়া, গুরুজনগণের পদধূলি লইয়া, ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে সেই গৃহ মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিল। জপ সমাপন করিয়া, দুর্গানাম স্মরিয়া, ভট্টাচার্য্যের পদধূলি গ্রহণ করিয়া সারদা সহাস্যবদনে বলিল, "ঠাকুরদ্দা! কাপড় ছাড়ো, এইখানেই সন্ধ্যা আহ্নিক করো, কিঞ্চিৎ মিষ্টিমুখ কোরে যাও।"

অনুরোধ এড়াইতে না পরিয়া, ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাপড় ছাড়িয়া, সন্ধ্যাহ্নিক করিয়া, পরিতোষরূপে জলযোগ করিলেন।

নিকটে দাঁড়াইয়া, হাস্য করিয়া সারদা বলিল, "ঠাকুরদ্দা, অঙ্গহীন থাক্‌লো। পান দিতে পাল্লেম না। তুমি ত চিবুতে পার্‌বে না, পান ছেঁচবার যন্ত্র আমার ঘরে নেই।"

উঠিয়া বাহির হইয়া যাইবার সময় গদাইদাদা হাস্য করিয়া বলিয়া গেলেন, "এইবার ত দিদি ঠোকেছ! দাঁতে করে চিবিয়ে দিয়েও ত আমাকে তুষ্টু কোর্‌তে পার্‌তে?"

সারদা হাস্য করিল, ভট্টাচার্য্য চলিয়া গেলেন। সংসারের কয়েকটী কার্য্য শেষ করিয়া সারদাসুন্দরী মহাভারত লইয়া বসিল। সে রাত্রে রাজা যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ। যাঁহারা শুনিতে বসিয়াছিলেন, দ্রৌপদীর পতনে, নকুল-সহদেবের পতনে, ভীমার্জ্জুনের পতনে, ধর্ম্মরাজ যেরূপ বিলাপ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া শ্রোতাদের চক্ষে জল পড়িল, পাঠিকাও অশ্রু সম্বরণ করিতে করিল না। তাহার পর কুকুরের কথা। কুকুর অগ্রে প্রবেশ না করিলে, যুধিষ্ঠির স্বর্গপুরে প্রবেশ করিবেন না, পূর্ব্বে পূর্ব্বে ইহা শুনা থাকিলেও, সেই অংশ শ্রবণে রাধারাণী কন্যার

মুখপানে চাহিয়া, প্রশান্তবদনে বলিলেন, "ধর্ম্মপুত্রের ধর্ম্মপালনের কথা শুনিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। পুণ্যকথা পুরাতন হয় না; যখনি শুনি, তখনি নূতন। তুমিও মা, ধর্ম্মপালনের সময় ধর্ম্মপুত্রকে স্মরণ কোত্তে ভুল না। প্রাতঃকালে যে চারিটি পুণ্য-শ্লোক মহাপুরুষের নাম কোত্তে হয়, তাঁদের মধ্যে একটি পুণ্যশ্লোক ঐ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির।"

সশরীরে রাজা যুধিষ্ঠিরের স্বর্গধামে প্রবেশ, কুকুরের মায়াভঙ্গ, যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শন, পরলোকগত আত্মীয়-স্বজনের দেবমূর্ত্তি সন্দর্শন ইত্যাদি ভক্তিভাবে পাঠ করিয়া, সারদাসুন্দরী মহাভারতখানি বন্ধ করিল, মহাভারতকে নমস্কার করিল, জননী ও মাসীমাকে প্রণাম করিল।

সেই দিন নন্দরাণীর স্বামী তাঁহার মনিবের সঙ্গে ভিন্নস্থানে গিয়াছিলেন, এক সপ্তাহ বিলম্ব হইবার কথা। আহারাদির পর নন্দরাণী আসিয়া সারদার ঘরে, সারদার কাছে শয়ন করিলেন।

কি স্ত্রী, কি পুরুষ, উভয়ে এক শয্যায় শয়ন করিলে, যতক্ষণ নিদ্রা না আইসে, ততক্ষণ নানারকম গল্প চলে। সারদার সহিত নন্দরাণীর গল্প চলিতে লাগিল। গল্প করিতে করিতে একটু থামিয়া, নন্দরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা সারু, গদাই দাদা তিন দিন তিনবার তোমার কাছে এলেন, তুমি তাঁরে নির্জ্জনে বসিয়ে কত কি পরামর্শ কোল্লে, সে সব কিসের পরামর্শ মা?"

চিন্তা করিয়া সারদা উত্তর করিল, "আমার একটি ব্রত হবে। ঠাকুরদাদা প্রাচীন মানুষ, অনেক শাস্ত্র জানেন, তাই তাঁকে ডাকিয়ে এনে পদ্ধতিগুলি জেনে জেনে নিচ্ছি। আবার উনি আস্‌বেন। ব্রত যখন শেষ হবে, তখন তোমরা—

শুনিতে শুনিতে বাধা দিয়া নন্দরাণী বলিলেন, "যখন শেষ হবে, তখন জান্‌তে পার্‌বো, যখন আরম্ভ হবে, তখন জান্‌তে পার্‌বো না?"

সারদা বলিল, "না,—এ ব্রতের সে নিয়ম নয়। তা যদি হতো, তা হলে ঠাকুরদাদাকে নিয়ে আমি নিজের ঘরে বস্‌তেম না; তোমাদের সকলের কাছেই কথাবার্ত্তা চল্‌তো। মা জান্‌তে পাত্তেন, তুমিও জান্‌তে পাত্তে। মা-মাসী সমান কথা।"

নন্দরাণী একটু হাসিয়া বলিলেন, "ব্রতটীও নূতন, তোমার কথাগুলিও নূতন। তা বেশ;—ব্রত করো, মা দুর্গার ইচ্ছায় ব্রত শেষ হোক্, ব্রতের ফল ফলুক, তুমি একটি নবকুমারের জননী হও।"

সারদাসুন্দরী মনে মনে হাসিল, মুখে কোন উত্তর দিল না। নিদ্রা আসিল, অল্পক্ষণ মধ্যে উভয়েই নিদ্রাভিভূতা।

শনিবার আসিল, শচীন্দ্র আসিলেন, শনিবারের রাত্রি পোহাইল, রবিবারের দিনমান সমভাবে কাটিয়া গেল, সেইদিন রাত্রিকালে সারদাসুন্দরী শচীন্দ্রকে বলিল, "কাল আবার তোমাকে দুটী মোহর দিব।—বুঝেছ?"

শচীন্দ্র বলিলেন, "বুঝেছি। কিন্তু এত শীঘ্র শীঘ্র কি জন্য?"

সারদা বলিল, "কুলালো না। বাইশ ঘর গরিব, তত অল্প টাকায় সামঞ্জস্য হয় না। জান্‌তে পারিনি এখনো, কিন্তু কুলাবে না, মনে মনে হিসাব কোরে সেটা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। কাল তুমি নিয়ে যেও, অবসরমত বদ্‌লাই কোরে শনিবার আমাকে এনে দিও।"

শচীন্দ্র বলিলেন, "আচ্ছা।"

রাত্রি কিছু অধিক হইয়াছিল, অন্য কথা হইল না, উভয়ে ঘুমাইলেন। প্রভাতে মোহর দুটী লইয়া শচীন্দ্রশেখর কৃষ্ণনগরে যাত্রা করিলেন, আগামী শনিবারে আবার পঞ্চাশটী টাকা আনিয়া দিলেন। রবি গেল, সোম গেল, আবার মঙ্গলবার। সারদাসুন্দরী মঙ্গলবারটিকে প্রকৃত মঙ্গলবার বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল, সেই মঙ্গলবার বৈকালে অবশিষ্ট কার্য্যের ব্যবস্থা করিবার আকিঞ্চন। সারদা সেদিন আর ঠাকুরদাদাকে ডাকিয়া পাঠাইল না, নিজেই একখানি রুমালে বাঁধিয়া পঞ্চাশটি টাকা লইয়া গদাই দাদার বাড়ীতে চলিল। খুব নিকটেই বাড়ী, পাড়ার ভিতর দিয়াই যাইতে হয়, জানিতে পারিয়াও রাধারাণী নিষেধ করিলেন না।

ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া সারদাসুন্দরী তাঁহার সহিত দেখা করিল, ভট্টাচার্য্যের ব্রাহ্মণী সারদাকে যথেষ্ট আদর করিলেন; তাহার পর সারদার ইঙ্গিতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাকে সঙ্গে করিয়া আপনার শয়নঘরে লইয়া গেলেন; ঘরের একধারে একটি মাদুর পাতিয়া দুজনে বসিলেন। সারদা বলিল, "ঠাকুরদ্দা! কত ঘর বাকী?"

ঠাকুরদাদা বলিলেন, "ষোল ঘরকে দেওয়া হয়েছে, বাকী আছে ছয় ঘর। হিসাব কোরে দেখেছি, আর কুড় টাকা হলেই ঠিক হবে।"

রুমাল খুলিয়া পঞ্চাশ টাকা বাহির করিয়া সারদা বলিল, "এই পঞ্চাশ টাকা আছে;—কুড়িটাকা তাদের দিও, বাকী ত্রিশ টাকা তোমার কাছেই রেখো; তারা ছাড়া যদি আর কাহারো কোন রকম কষ্ট জান্‌তে পার, কিম্বা যদি কোন সত্য

গরিব কোন প্রকার দায় জানায়,—কন্যাদায়, কি পিতৃদায়, মাতৃ-দায়, কিম্বা দেনার দায় তোমাকে জানায়, তা হ'লে সম্ভবমত কিছু কিছু দিয়ে দিও। বুঝ্‌লে আমার কথা? গরিবেরা ঐ রকম দায় জানালে তোমার নিজের বিবেচনা মতে তাদের উপকার করো; আমাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে হবে না।" এই কথাগুলি বলিয়া, হাসিয়া ঠাকুরদাদার মুখপানে চাহিয়া, সারদা আবার বলিল. "আমি ছেলেমানুষ, তুমি প্রবীণ, তবুও তোমাকে পুনরায় বারণ কোরে দিচ্ছি, ছন্দাংশেও আমার নামটা কাহারো কাছে প্রকাশ করো না।"

হাস্য করিয়া ঠাকুরদাদা বলিলেন, "তথাস্তু।"

ঠাকুরদাদাকে প্রণাম করিয়া সারদাসুন্দরী বিদায় হইল, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল; নিত্য সন্ধ্যাকালে যেমন যেমন কার্য্য, সে দিনেও ভক্তিপূর্ব্বক সেই সমস্ত কার্য্য যথানিয়মে সুসম্পন্ন করিল।

দুই বৎসর অতীত। সারদার সৎকার্য্যগুলি সমভাবে সাধিত হইতে লাগিল। বাইশঘর গরিব মাসে মাসে সাহায্য পাইতে থাকিল। মধ্যে মধ্যে কোন গরিব ব্রাহ্মণ সারদার মাতামহের কাছে পুত্রের উপনয়ন, কন্যার বিবাহ, মাতৃ-পিতৃ-শ্রাদ্ধ ইত্যাদি দায় জানাইয়া কিছু ভিক্ষা চাহিতে আসিলে যোগেশ্বরবাবু যাহা দান করেন, সারদা সেই রকম গরিব ব্রাহ্মণকে মাতামহের দানের অতিরিক্ত পাঁচ টাকা, দশ টাকা দান করিয়া থাকে। বাড়ীর লোকেরা কেহই কিছু জানিতে পারেন না।

নন্দরাণী গর্ভবতী। সেই বৎসর কোজাগর লক্ষ্মীপূজার রাত্রে নন্দরাণী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। পরিজনেরা

আনন্দোৎসবে মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিলেন। একমাস পরে প্রকাশ পাইল, সারদাসুন্দরী গর্ভবতী; আষাঢ় মাসে রথযাত্রার দিন সারদারও একটি নবকুমার ভূমিষ্ঠ হইল। সেই উৎসবে যোগেশ্বরবাবু ও রাধারাণী অনেকগুলি গরিবলোককে অন্নবস্ত্র দান করিলেন, নিজের দৌহিত্র ও রাধারাণীর দৌহিত্র, এই দুটি নবকুমারের মঙ্গলকামনায় যোগেশ্বরবাবুর ঐ প্রকার উৎসব। শিশুদুটি ক্রমশ হামাগুড়ি দিতে শিখিল, মধুর হাসি হাসিতে শিখিল, আধো আধো কথা কহিতে শিখিল; সকলের কাছেই তাহাদের যথেষ্ট আদর। একদিন একজন ডাক-হরকরা রাধারাণীর নামের একখানি চিঠি আনিয়া সদরবাড়ীতে ডাকাডাকি করিতেছিল, যোগেশ্বরবাবু তখন সদরের পুষ্করিণীতে স্নান করিতেছিলেন, তাঁহার পুত্রেরা কে কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিল, একজন দাসী সেই চিঠিখানি লইয়া সারদার হাতে দিল। কর্ত্তার নামে চিঠি নয়, জননীর নামে চিঠি। কোথা হইতে আসিল, কে লিখিয়াছে, তাহা জানিবার আগ্রহে সারদা নিজের ঘরে গিয়া, শীঘ্র শীঘ্র খাম খুলিয়া চিঠিখানি পাঠ করিল।—পাঠ করিতে করিতে তাহার মুখমণ্ডল সহসা ম্লান হইয়া গেল।

হলধরপুরের চিঠি,—সূর্য্যকান্তবাবু লিখিয়াছেন। সূর্য্যকান্ত বাবু সারদার বিমাতার জ্যেষ্ঠপুত্র। শৈশবে সারদা জননীর সঙ্গে মাতামহালয়ে আসিয়াছিল, হলধরপুরের সকল কথা মনে ছিল না, কিন্তু মাসে মাসে জননীর মাসহরার টাকা আসিত, সঙ্গে সঙ্গে পত্র আসিত, তাহাতেই সারদা জানিয়া রাখিয়াছিল, সূর্য্যকান্তবাবু তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা। ইতিপূর্ব্বে কয়েক মাস মাসহরার টাকা আইসে নাই, পত্রাদিও আইসে নাই, রাধারাণী

অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। টাকার জন্য যত না হউক, ছেলেদুটি কেমন আছে, তাহা জানিতে না পারিয়াই অধিক উদ্বেগ। পিতার মৃত্যুর পর বাবুরা ভাই ভাই পৃথক হইয়াছিলেন, রাধারাণী তাহা জানিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু এখন শরীরগতিকে কে কেমন আছে, সংসারের অবস্থা কিরূপ, মায়াবশে ও স্নেহবশে তাহাই জানিবার আগ্রহ। অনেক দিনের পর চিঠি আসিয়াছে, চিঠিখানি দেখিলে রাধারাণীর আহ্লাদ হইবে, তিনি অবশ্য শুভ সংবাদ জানিতে পারিবেন, তাঁহার অন্তরে এইরূপ আশা;—কিন্তু হায়! রাধারাণীর সে আশা দুরাশায় পরিণত হইল। এই পত্র অশুভবার্ত্তা আনয়ন করিয়াছে। সূর্য্যকান্তবাবু লিখিয়াছেন ঃ—

"মা! আমাদের মা নাই, আপনাকেই আমরা গর্ভধারিণী জননী বলিয়া জ্ঞান করি, সেই জ্ঞানেই এখানে আমরা আপনার চরণপূজা করিতাম। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের ভাই ভাই বিচ্ছেদের সময় আপনি দুঃখিত অন্তকরণে পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছেন; ইষ্টদেব জানেন, তাহাতে আমি এক লহমার জন্যও সুখী ছিলাম না, এখনও অসুখে অসুখে আমার দিন যাইতেছে। চন্দ্রকান্ত আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। হলধরপুরের বাড়ীখানি এওয়াজ-দরাজ-সূত্রে আমাকে দিয়া আমাদের কলিকাতার বাড়ীখানি তিনি দখল করিতেছেন। ছোট বৌমা তাঁহার সঙ্গেই আছেন। সন্তান হয় নাই। আমার দুটি ছোট ছোট পুত্র, একটী আটমাসের কন্যা।

"সংসারের চক্র কখন কোন্ দিকে ঘোরে, বিধাতা কাহার ভাগ্যে কখন কি ঘটান, বিধাতার কখন কিরূপ লীলা, কেহই

তাহা বলিতে পারে না। দুরদৃষ্টবশে আমি সম্প্রতি মহাবিপদে পতিত হইয়াছি ;—ভয়ঙ্কর বিপদ !—মহা দুর্দ্দিন উপস্থিত ! কি বিপদ, সাক্ষাৎ না হইলে পত্রদ্বারা তাহা লিখিয়া জানাইতে পারিব না। বিপদ ঘটিয়াছে বলিয়া কয়েক মাস আপনার টাকা পাঠাইতে পারি নাই। ভগবানের কৃপায় আপনার আশী-র্ব্বাদে এই দুর্দ্দিন বিগত হইলে সমস্ত টাকা প্রেরণ করিতে যত্ন করিব। দুঃসময়ে মানুষে মানুষের সাহায্য করিতে পারে না,—সাধ্য থাকিলেও অনেকে করে না, বন্ধু-বান্ধবেরাও বিমুখ হয়, ইহা আমি উত্তমরূপে জানি ;—কেবল আমি কেন, সংসারের সকল লোকেই তাহা জানেন ; আমার মত অবস্থাপন্ন লোকেরা ভুক্তভোগী হইয়া আরো ভালরকমে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। নীতিশাস্ত্রের লেখাও সেইরূপ। অতএব মহাবিপদে পতিত হইয়াও আমি নিতান্ত অবসন্ন হই নাই ; যাহাতে এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারি, তজ্জন্য দিবানিশি কায়মনোবাক্যে সেই বিপদবারণ করুণাময় ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, বিপদ যেন আমাকে অভিভূত করিতে না পারে।

"মনে অসুখ, কিন্তু শরীর একরকম সুস্থ আছে, পরিবারেরাও একপ্রকার ভাল আছে। আপনি কেমন আছেন, সারদা কেমন আছে, দাদামহাশয় কেমন আছেন, বাটীর আর আর সকলে কে কেমন আছেন, বিশেষ করিয়া লিখিয়া চিন্তা দুর করিবেন। ইহা শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম ইতি—"

"চরণাশ্রিত,

শ্রীসূর্য্যকান্ত দেব শর্ম্মণঃ।"

আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া, বিষণ্ণবদনে সারদাসুন্দরী সেই পত্রখানি পূর্ব্ববৎ মোড়ক করিল, খামের মধ্যে রাখিল, খামখানি হাতে করিয়া, মন্থরগতিতে চলিয়া, নিকটে গিয়া, ছলছলচক্ষে মুখপানে চাহিয়া জননীর হস্তে সেইখানি অর্পণ করিল। সেখানে আর দাঁড়াইল না, ফুল্লমুখী ম্লানমুখে ধীরে ধীরে ঘরে আসিয়া ম্লানবদনে ভাবিতে বসিল।

সারদা ভাবিল বিপদ!—কি রকম বিপদ? লিখিয়াছেন, ভয়ঙ্কর বিপদ! ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিন! কি রকম ভয়ঙ্কর? কি রকম দুর্দ্দিন? বোধ হয় টাকার অভাব। তাহা যদি হয়, আর যদি সে অভাবটা অল্প হয়, তাহা হইলে সাধ্যমতে চেষ্টা করিয়া দেখিব। কিন্তু ঠিক তত্ত্ব জানিতে না পারিলে উপায় করা যাইতে পারে না। ইচ্ছা হইতেছে, আমি একবার সেই-খানে যাই। মা কি অনুমতি দিবেন?

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সারদার সঙ্কল্প দৃঢ় হইল। দয়াবতী ভাবিল, আচ্ছা, সেই ভাল। শনিবার আসুক, তিনি আসুন, পরামর্শ করিয়া, তাঁহাকেই সঙ্গে লইয়া একবার আমি হলধরপুরে যাইব,—যাইবই যাইব। দিন কতকের জন্য তাঁহাকে আপিসে ছুটি লইতে বলিব। হাঁ, সেই সঙ্কল্পই-স্থির।

পঞ্চম কল্প।

সংসার ছারখার।

চন্দ্রকান্তবাবু তখনো কলিকাতায় বাবুগিরী করিতেছিলেন। তখনকার ভরসা কেবল কাপ্তেনী ধরণের হ্যাণ্ডনোট। ৫০০৲ টাকা লইয়া হাজার টাকার নোট লিখিয়া দেওয়া, হাজার টাকা লইয়া তিনহাজারের নোট লিখিয়া দেওয়া, পঞ্চাশ টাকা লইয়া বেশী গরজে ৫০০৲ টাকার নোট লিখিয়া দেওয়া, এই রকমেই বাবুগিরী;—এই রকমেই বাবুগিরীর উপকরণ সংগ্রহ করা হইতেছিল! জোগাড়ে ছিল ঘুঘু পাখীরা। বাবু যখন পল্লী-গ্রাম হইতে কলিকাতায় আইসেন, গোটাকতক পাড়াগেঁয়ে ঘুঘু তখন তাঁহার সঙ্গে ছিল। কেবল পাড়াগেঁয়ে ঘুঘুতে কলিকাতার ভিতর একটা বড়লোককে সহজে নষ্ট করিতে পারে না; দিনে দিনে গন্ধ পাইয়া প্রায় এক ডজন সহুরে ঘুঘু আসিয়া জুটিয়াছিল। পাড়াগেঁয়ে ঘুঘুরাই সহুরে ঘুঘু জুটাইয়াছিল। সকলেই এক পরামর্শী।

বাবুর বর্ত্তমান অবস্থা বেশী দিন চাপা থাকিল না। যাহারা গোড়াগুড়ি জানিত, তাহারা নূতন ঘুঘুর দলকে গোপনে গোপনে প্রকৃত অবস্থা সমঝাইয়া দিল। সহুরে ঘুঘুরাই ছিল হাণ্ডনোটের দালাল। তাহারা সাবধান হইল। বাবুর আর হাণ্ডনোট কাটা হয় না। ক্রমশই রস কমিয়া আসিতে লাগিল। বাইমহলে গতিবিধি চলে না, আরমানী—য়িহুদি—বিলাসিনীদের জবাব না দিলে চলে না, হোটেলের খাতা বন্ধ না করিলে চলে না,

কাজে কাজে কাপ্তেনবাবু মনের কষ্টে, নিতান্ত অনিচ্ছায় বাবু-গিরীর সেই অঙ্গগুলি ছেদন করিতে বাধ্য হইলেন। সেগুলি ছেদন হইয়া গেল, কিন্তু ডাইমনকুমারীর কাছে যাওয়া আসা চলিতে লাগিল।

ফুলে যখন মধু থাকে, মধুমক্ষিকারা তখন সুমধুর গুঞ্জনে সেই সকল ফুলের আদর করে; মধু ফুরাইলে অনাদর আরম্ভ হয়। চন্দ্রকান্তবাবুর পালিত ঘুঘুরা একে একে উড়িতে লাগিল; দৈবাৎ দুই একদিন কোন প্রকার গুপ্ত অভিসন্ধিতে দুই একজন দেখা দেয়. তাহারা কিন্তু অধিকক্ষণ থাকে না, আগেকার মত খোষামদের তুফান বহায় না, হাই তুলিলে তুড়ি দেয় না, হাঁচিলে 'জীব জীব' বলে না, কেমন একপ্রকার উদাস উদাস ভাব। উদাস ভাব বটে, কিন্তু দেখিলে ভয় হয়, কেমন একপ্রকার বিকট ভঙ্গীতে এক একবার একটু একটু হাসে।

পাঠক মহাশয়, স্মরণ থাকিতে পারে, চন্দ্রকান্তবাবুর পাড়া-গেঁয়ে ঘুঘুর দলের একটা প্রধান দলপতি জটাধারী বিশ্বাস। জটাধারীর বিবাহ হয় নাই, কিন্তু একটি পুত্র আছে। পুত্রের নাম প্রাণনাথ বিশ্বাস। সেই পুত্র এখন প্রায় বিংশতিবর্ষ বয়ঃ-প্রাপ্ত। জটাধারী তাহাকে কলিকাতায় আনিয়া বাবুর কাছে সুপারিস করিয়া দিয়াছিল। জটাধারীর বিবাহ হয় নাই, বাবু তাহা জানিতেন না; সুতরাং প্রাণনাথকে তাহার পুত্র জানিয়া সৌভাগ্যের সময়ে নিজের মুহুরীপদে নিযুক্ত করিয়া, বাড়ীতে রাখিয়া দিয়াছিলেন। জটাধারী দিন দিন তফাৎ হইতেছে, কিন্তু প্রাণনাথটি এখনো বাহাল আছে।

গঙ্গাভক্তি যাত্রায় এই ভাবের একটি গীত আছে:—

গীতাংশ।

"খুসী হলেম রাজমহিষি, শুনে তোমার সুখের কথা।
পতি বিনে পুত্র পাবে, লোকে বল্‌বে পতিব্রতা॥"

এই এক রকম নূতন ভাব ;—

"নারী বিনে পুত্র পাবে, লোকে বল্‌বে আসল পিতা।"

এটি আর এক প্রকার নূতন ভাব। জটাধারীর পুত্রোৎপাদনের ইতিহাসে সেই ভাবটির পরিচয় হইবে।

জটাধারী যখন কলিকাতায় ডফের স্কুলে পড়িত, যখন তাহার উনিশ বৎসর বয়স, সেই সময় সে খৃষ্টান হইবার ইচ্ছা করে ; এক সোমবার একটা মিশনহাউসে গিয়া একজন পাদরীসাহেবের আশ্রয় লয়। রবিবার না হইলে ব্যাপ্তাইজ্‌ করা হইবে না, অতএব পাদরীসাহেব তাহাকে কায়দার মধ্যে আটকাইয়া রাখেন। গির্জ্জার সংলগ্ন একখানা স্বতন্ত্র একতালা বাড়ীতে একদল কালো কালো দেশী খৃষ্টান বাস করে ; দলের মধ্যে বেশীর ভাগ মেয়েমানুষ। বালিকা আছে, যুবতী আছে, প্রৌঢ়া আছে, বৃদ্ধাও আছে। সবগুলি কুচকুচে কালো। কেহ কেহ বিলাতী ধরণের ঘাগ্‌রা পরিয়া বিবি সাজে, কেহ কেহ আমাদের মতন জামার উপর শাড়ী পরিয়া দেশী বিলাতী উভয় ঢং বজায় রাখে। কেহ কেহ স্কুলে পড়ে, কেহ কেহ ফিমেলস্কুলে অথবা গৃহস্থলোকের বাড়ীতে বাড়ীতে মেয়ে পড়াইতে যায়। জটাধারী বিশ্বাস সাত দিনের জন্য সেই বাড়ীতে আশ্রয় পাইয়াছিল। তিন দিনের আলাপে জটাধারী একটি কৃষ্ণবর্ণা যুবতীকে বিবাহ করিবার অঙ্গীকার করে, শুক্রবার শেষরাত্রে সেই যুবতীকে লইয়া পালায়। রবিবারের পূর্ব্বেই পলায়ন, সুতরাং ব্যাপ্তাইজ হয় নাই।

কৃষ্ণাবিবিকে লইয়া জটাধারী কলিকাতায় ছিল না, নিজ-গ্রামেও যায় নাই, একেবারে আসাম অঞ্চলের গৌহাটীতে গিয়া ডেরাদাণ্ডা গাড়িয়াছিল। বিবিটীর নাম মিশ্‌ ক্যাথারিন কুড়ুনীমণি দাসী। জটাধারী নিশ্চয়ই কুড়ুনীকে বিবাহ করে নাই, গুপ্তরঙ্গিনী করিয়া রাখিয়াছিল; সেখানকার কতক লোকে হয় ত জানিত, বিবাহ করা বিবি। সেই কুড়ুনীর গর্ভে প্রাণনাথের জন্ম। কুড়ুনী আর প্রাণনাথ গৌহাটীতেই ছিল, জটাধারী দেশে আসিয়া কলিকাতায় দালালী করিয়া মাসে মাসে রেজেষ্টারী চিঠিতে দশটাকা করিয়া খোরাকী পাঠাইত। কুড়ুনী আর একটা নায়ক জুটাইয়া লইয়াছিল; প্রাণনাথ তাহাদের কাছেই থাকিত। সেই প্রাণনাথ এখন জানবাজারে চন্দ্রকান্তবাবুর খাস মুহুরী।

কলিকাতায় আসিয়া চন্দ্রকান্তবাবু সভ্য হইয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছেন, স্ত্রীশিক্ষার বন্ধু হইয়াছেন, মনে আর কোন প্রকার দ্বিধাই নাই। বউ-মা লেখা-পড়া জানেন না, বাবুর সেইটি বড় আক্ষেপ। গৌহাটী স্কুলে প্রাণনাথ কিছু কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছিল, সেই সুপারিসে চন্দ্রকান্তবাবু তাহাকে বউমার শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বাবুর যখন খুব কাপ্তেনী বোল্‌-বোলা, সেই সময় বাবু প্রায়ই গৃহবাসী হইতেন না; আরমানি মহলে, য়িহুদি মহলে, ফরাসী-মহলে, কাশ্মীরী-মহলে ও অপরাপর বাইজী-মহলে নিশাযাপন হইত। প্রাণনাথ সে সময় দিবা-রজনীর মধ্যে বউমাকে শিক্ষা দিবার অনেক অবসর পাইত; এখনও অবসর অল্প নয়। প্রাণনাথের উপর বাবুর অখণ্ড বিশ্বাস ছিল, সেই বিশ্বাসেই অন্দরে বউমার ঘরে তাহার

প্রবেশাধিকার। দুরবস্থায় পতিত হইয়া বাবু এখন লোকের উপর সন্দেহ করিতে শিখিয়াছেন। এক একদিন তাঁহার মনে সন্দেহ হয়, প্রাণনাথ হয় তো তাঁহার প্রাণপ্রেয়সীর "প্রাণনাথ" হইয়া বসিয়াছে। সন্দেহ হইলে কি হইবে, প্রাণনাথের প্রতি বাবুর সর্ব্বদা ষোলআনা টান, ভ্রাতৃবৎ স্নেহ, প্রাণ দিয়া বিশ্বাস; প্রাণনাথকে তিনি রুক্ষভাবে কোন কথাই বলিতে পারেন না। ভাবনাটা যখন কিছু বেশী প্রবল হয়, তখন হয় তো তিনি নির্জ্জনে বসিয়া মনে মনে ভাবেন, "এখন তারে কেমন কোরে প্রাণের বাহির করা যায়!"

যিনি যে ভাবে আছেন, তিনি সেই ভাবেই থাকুন, চক্রী-লোকেরা এখন কোন্‌দিকে কোন্ চক্র ঘুরাইতেছে তাহাই দেখিতে হইবে।

জালখত প্রস্তুত হইয়াছিল। সেই জালে দুটি বৃহৎ মৎস্য গ্রেপ্তার করা চক্রী-ধীবরগণের প্রধান কার্য্য। তামাদী হইতে না পায়, সেই বিষয়ে তাহারা বিশেষ সাবধান। প্রত্যেক তিন বৎসর পূর্ণ হইবার দুই একমাস বাকী থাকিতে থাকিতে প্রত্যেক খতের পৃষ্ঠে কিছু কিছু টাকা ওয়াশীল লিখিয়া রাখে; কোন কোন খতের ওয়াশীলের নীচে সূর্য্যকান্তবাবুর দস্তখত, এক একটা ওয়াশীলের নীচে চন্দ্রকান্তবাবুর দস্তখত। সমস্তই জালীয়াতের হাতের লেখা, এ কথা বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না।

একখানা তাজা খত প্রস্তুত হইয়াছে। দুইবৎসর পূর্ব্বে একবার চন্দ্রকান্তবাবুর জ্বর হইয়াছিল, একজন হিতাকাঙ্ক্ষী মোসাহেব হলধরপুরে পত্র লিখিয়া সূর্য্যকান্তবাবুকে কলিকাতায় আনাইয়াছিল। সে যাত্রায় তিনি আটদিন জানবাজারের

বাড়ীতে ছিলেন। সেই আটদিনের মধ্যে একদিনের তারিখ দিয়া একখানা জালখত লেখা হয়, সূর্য্যকান্ত অথবা চন্দ্রকান্ত কেহই কিছু জানিতে পারেন না; জালীয়াতের যোগে বাহিরে বাহিরেই কার্য্য শেষ। সেই খতের খাতক সূর্য্যকান্ত রায়, মহাজন একজন গদীয়ান। সাক্ষী সেই ঘুনুর দলের তিনজন পেটাও লোক। নূতন পুরাতন যতগুলি খত জাল করা হইয়াছে, সকলগুলিরই মহাজন ভিন্ন ভিন্ন, সাক্ষীও ভিন্ন ভিন্ন। মহাজনের সংখ্যা কিন্তু অধিক নহে। মহাজনেরাও কুচক্রীদলের সাহায্যকারী মুরুব্বি লোক।

পুরাতন খতগুলি রেজেষ্টারী করা হয় নাই; উপায় ছিল না বলিয়াই ব্যাঘাত হইয়াছিল। নূতন খতখানা রেজেষ্টারী হইয়াছে। কলিকাতায় লেখা-পড়া, কলিকাতায় লেন-দেন, অতএব কলিকাতার রেজেষ্টারী আফিসে রেজেষ্টারী হইয়াছিল। একটা অপর লোককে সূর্য্যকান্ত সাজাইয়া, উকিলকে দশ টাকা ঘুষ দিয়া সনাক্ত করাইয়া, ফন্দীবাজ জালীয়াতেরা আপনাদের কাজ বাজাইয়া লইয়াছিল। রেজিষ্ট্রার অথবা আফিসের আম্‌লারা কেহ কখনও আসল সূর্য্যকান্তকে দেখেন নাই, সুতরাং জাল সূর্য্যকান্ত বাজী মাত করিয়া, বগল বাজাইয়া বাহির হইয়াছিল।

নালিশ হইল। কর্ত্তার নামের যতগুলা খত, সবগুলা হলধরপুরের ঠিকানায় লেখা;—যে জেলায় হলধরপুর, সেই জেলার সদর ষ্টেশনে সেই সকল খতের নালিশ; যে খতে সূর্য্যকান্ত খাতক, সেই খতের নালিশ হইল কলিকাতায়। দশহাজার টাকার খত, ছোট আদালতের এলাকাবহির্ভূত, হাইকোর্টে মোকদ্দমা।

বলা অনাবশ্যক, শমন গোপন করা হইয়াছিল, মোকর্দ্দমার কথা দেনদারেরা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ;—এত তরফা ডিক্রী, একেবারে ডিক্রীজারীর পরওনা বাহির হইল। কলিকাতার বাড়ী, হলধপুরের বাড়ী, নিজ গ্রাম ও পার্শ্ব-গ্রামের জমী-জমা, বাগান-পুষ্করিণী সমস্তই ক্রোক। হরকান্তবাবু একটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সেবা ও অতিথিসেবার নিমিত্ত একখানি তালুক দেবোত্তর করিয়া গিয়াছিলেন, কেবল সেই দেবোত্তর সম্পত্তি ক্রোক হইল না। ইস্তাহারের মেয়াদ অতীত হইয়া গেলে নীলামের হুকুম। সূর্য্যকান্তবাবু কোনক্রমে ভদ্রাসন বাড়ীখানি আর নিজ অংশের কতক কতক জমী-জমা বেনামী করিয়া কিনিয়া রাখিলেন, বাকী জমী-জমা ও চন্দ্রকান্তের অংশ সমস্ত সম্পত্তি নিলাম হইয়া গেল। কলিকাতার বাড়ীখানিও রক্ষা পাইল না।

সংসার ছারখার!—চন্দ্রকান্ত ছোট একখানি খোলার বাড়ী ভাড়া করিয়া, পরিবার লইয়া, অতি কষ্টে সেইখানে বাস করিতে লাগিলেন; তত কষ্টেও প্রাণনাথ বিশ্বাসের বিশ্বাস ভুলিতে পারিলেন না; অত্যন্ত মায়া বসিয়াছিল, সুতরাং প্রাণনাথ সেই বাড়ীতেই রহিল।

সব গেল, তথাপি সখের প্রাণে একটু একটু সখ অবশিষ্ট রহিল। চন্দ্রকান্তবাবু মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যার পর ভজহরি ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে ডাইমনকুমারীকে দেখিতে যান। নিত্য যাওয়া অভ্যাস ছিল, অবস্থাগতিকে সেটা আর ঘটিয়া উঠে না, নিকট-ঘনিষ্টতা দূর হইয়া পড়িয়াছে। চন্দ্রকান্তের বাড়ীখানি নীলাম হইয়াছে, ভজহরির বাড়ীর নিকটেই সেই বাড়ী, নীলামের দিনেই ডাইমন-

কুমারী তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন; বাবু এখন কোথায় আছেন, সেই তত্ত্বটি জানিতে পারেন নাই। সহরের বাড়ী গিয়াছে, দেশের বাড়ী আছে, জমীদারী আছে, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল, অতএব তাঁহার বৈঠকখানায় খাতির-যত্নের ত্রুটি হয় না। চন্দ্রকান্ত পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেমন ভাব দেখাইতেন, এখনও সেরূপ ভান। রসালাপ চলে, সুধাপান চলে, হাস্য-পরিহাস চলে, অন্তরে বেগ চাপা থাকে, বাহিরের বেগ কমে না। চন্দ্রকান্ত ডাইমনকে বিবাহ করিবার সাধ করিয়াছিলেন, সে প্রসঙ্গ লইয়াও হাস্য-কৌতুক হয়।

খোলার বাড়ীতে বাস করিয়া চন্দ্রকান্তের লজ্জা আসিয়াছে। কোথাও তিনি বাহির হন না, কাহারো সহিত বেশী কথা কন না, কাহাকেও বাড়ীতে আসিতে বলেন না। কোন্ বাড়ীতে তিনি আছেন, নিতান্ত ঘনিষ্ট লোকেরা ভিন্ন আর কেহ তাহা জানেও না। বাহির হওয়া বন্ধ, কেবল মধ্যে মধ্যে এক একদিন সন্ধ্যার পর ডাইমনকুমারীকে দেখিতে যান, রাত্রি দশটার পূর্ব্বেই ফিরিয়া আইসেন।

দাস দাসী সকলেরই জবাব হইয়া গিয়াছে, নূতন একজন চাকরাণী ভর্ত্তি হইয়াছে, তাহাও ঠিকা। সে চাকরাণী আবার খোট্টা; উচ্ছিষ্ট বাসন স্পর্শ করে না; হাস্য করিয়া বউ-মা বলেন, সিরিন্ধ্রী। সে সিরিন্ধ্রী কিন্তু কাপড় কাচে, বাজার করে, যতক্ষণ হাজির থাকে, ততক্ষণ দুই একটা ফাই-ফরমাসও খাটে। বউ-মা স্বয়ং গৃহের সমস্ত কাজ নির্ব্বাহ করেন, শয্যা-পত্র পরিষ্কার রাখেন। সমস্ত বাসন স্বহস্তেই মাজেন; প্রাণনাথের থালা বাটি প্রাণনাথ নিজেই মাজে। চাকরাণী যে দিন

যে দিন কামাই করে, প্রাণনাথকে সেই সেই দিন তাহার কাজ-গুলি করিতে হয়; কেবল বাবুর আর বউ-মার কাপড়গুলি বউ-মা নিজেই কাচিয়া দেন; প্রাণনাথের কাপড় প্রাণনাথ আপনিই কাচে, ইহা বলাই বাহুল্য।

কষ্টে কষ্টেই দিন যায়, তাহার উপর মহা বিভ্রাট। বিপদের উপর বিপদ!—পণ্ডিতেরা বলেন, বিপদ একাকী আইসে না, জ্ঞাতিগোত্র সঙ্গে করিয়া আনে। চন্দ্রকান্তবাবুর বিপদেও দলবল অনেক। তাঁহার মাথার উপর দিয়া অনেক বিপদ চলিয়া গিয়াছে, এইবারের বিপদটা বড় শক্ত।

হ্যাণ্ডনোট লইয়া যাহারা তাঁহাকে টাকা কর্জ্জ দিয়াছিল, তাঁহার জমীদারী নীলাম হইয়া গিয়াছে সে কথা তাহারা জানিত না, দালালেরাও সে কথাটা চাপিয়া রাখিয়াছিল, জমীদার বলিয়া দালালী পাকাইত; কিন্তু বাড়ীখানি নীলাম হইয়া গেল, সে কথা আর বেশীদিন গোপন থাকিল না; কলিকাতা সহরে সকল লোকের সকল কথার খবর সকলে রাখে না, যাহাদের দরকার আছে, তাহারাই রাখে। হ্যাণ্ডনোটের মহাজনেরা জানিতে পারিল, চন্দ্রকান্তবাবু নিঃসম্বল হইয়াছেন, বিলম্ব না করিয়া একে একে তাহারা নালিশ রুজু করিতে আরম্ভ করিল। ছোট আদালতে মোকর্দ্দমা,—প্রায়ই এক এক কোপ; যেমন নালিশ, তেমনি ডিক্রী;—সঙ্গে সঙ্গেই ডিক্রীজারী। ক্রোক করিবার বস্তু নাই, সুতরাং আসামীকে ধরিবার জন্য ওয়ারীণ জারী। চন্দ্রকান্তবাবু বাড়ীর বাহির হন না, ওয়ারীণের পেয়া-দারা তাঁহাকে দেখিতে পায় না, ধরিতেও পারে না। বাবু যেদিন যেদিন ডাইমনের বাড়ীতে যান, সন্ধ্যার পরেই গিয়া

থাকেন, রাত্রিকালেই ফিরিয়া আইসেন, রাত্রিকালে ওয়ারীণ ধরিবার আইন নাই ; অতএব চন্দ্রকান্তবাবু ধরা পড়েন না।

দিনে দিনে দিন যায়, পেয়াদারা বাহিরে বাহিরে ঘোরে, কিছুতেই সুবিধা পায় না। বাবুর এদিকে খরচের টাকার নিতান্ত অকুলান ; ঋণ না করিলে সামান্য খাওয়া পরা চলাও ভার ; তাহার উপর বাড়ীওয়ালার ঘন ঘন তাগাদা। তাহা ছাড়া যে সকল চাকর চাকরাণীকে জবাব দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদেরও কাহারো কাহারো সাত আটমাসের বেতন বাকী ; তাহারাও নিত্য নিত্য তাগাদা করিতে আইসে। দুর্ভাগ্যের উদয়ের সময় দোকান-দেনাও আবশ্যক হইয়াছিল, দুই একটি বাবুগিরির অঙ্গও ধারে পরিপুষ্ট হইত। এই সময় সেই সকল দেনারও তাগাদা আরম্ভ। কোন না কোন সূত্রে দোকান-দারেরা নূতন বাসস্থানের ঠিকানা জানিতে পারিয়াছিল, দেখিয়া গিয়াছিল খোলার বাড়ী ;—সেই জন্যই বেশী তাগাদা। কাপড়-ওয়ালা, ময়দাওয়ালা, আতরওয়ালা, মেওয়াওয়ালা, ফুলোলওয়ালা মদওয়ালা, মুর্গীওয়ালা, ছাঁচিখিলিওয়ালা, এমন কি, চানাচুর-ওয়ালারা বাড়ীতে আসিয়া জুলুম করিতে লাগিল। চন্দ্রকান্ত বাবু নানা জ্বালায় বিব্রত ; ঋণ গ্রহণ ভিন্ন ছোট ছোট ঋণ পরি-শোধেরও অন্য উপায় দেখিতে পাইলেন না।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বাবু একদিন বৈকালে পূর্ব্বের এক-জন দালালের নামে একখানি পত্র লিখিলেন। দুরবস্থার সময় সামান্য ডাকমাশুল খরচ করাটাও বাজে খরচ মনে হয়, সুতরাং পত্রখানি ডাকে দেওয়া হইল না ; দালালের ঠিকানা জানা ছিল, ঠিকানা বলিয়া দিয়া প্রাণনাথকেই পত্রবাহক করিলেন।

পত্র নিরাপদে পৌঁছিল, পরদিন বৈকালে দালাল মহাশয় দর্শন দিলেন। বাবু তাহাকে একটি নির্জ্জন ঘরে লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "অনেক উপকার করিয়াছ, এইবার একটি উপ-কার কর। যাহারা আমার এখনকার অবস্থা জানে না, সেই রকমের একটি মহাজন জুটিয়ে দাও। পাড়ার ভিতর নয়,—এ অঞ্চলে নয়, দূরে, শ্যামবাজার কি বাগবাজার অঞ্চলে সেই রকম একটি লোক দেখ। বড় অনাটন, কিছু টাকা আমাকে জোগাড় করে দাও। বেশী নয়, পঞ্চাশটি টাকা।"

অল্পক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া দালাল বলিল, "পঞ্চাশ টাকার দালালী কি পাব? পাঁচ টাকা লাভ না হলে এমন উঞ্ছ কাজে আমি হাত দিতে পার্‌বো না।"

বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, পাঁচ টাকাই দেওয়া যাবে। দাও ভাই, টাকাটা আমার জোগাড় করে দাও। কিন্তু শীঘ্র।"

আবার কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া দালাল বলিল, "লোক আমার সন্ধানে আছে, কিন্তু আপনাকে একবার তার সঙ্গে দেখা কোর্‌তে হবে। বল্‌ছেন শীঘ্র চাই; খুব শীঘ্র যদি চান, তবে চলুন, আজিই চলুন, আমিও সঙ্গে যাচ্ছি, আজিই টাকা পাওয়া যাবে।"

বাহাল করিয়া বাবু বারকতক এক একটা আপত্তি তুলিলেন কিন্তু আপত্তি খাটিল না। দালালের সঙ্গে তাঁহাকে যাইতেই হইল; তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়া বাড়ী হইতে তিনি বাহির হইলেন, পশ্চাৎ পশ্চাৎ দালাল।

চারি দণ্ড বেলা আছে। বাবুকে ধরিবার জন্য ওয়ারীণের পেয়াদা ঘোরে, দালালটার সে তত্ত্ব জানা ছিল, বাবুর বাড়ীতে

প্রবেশের পূর্ব্বে একজন পেয়াদার সঙ্গে তাহার দেখাও হইয়াছিল, দুই একটা কথাও হইয়াছিল, একখানা বাড়ীর দেউড়ির কাছে পেয়াদা লুকাইয়া থাকিবে, সে কথাটাও দালালের জানা হইয়াছিল; বাবুকে রাস্তার বাহির করিয়াই ধূর্ত্ত দালাল হন হন করিয়া সেই দিকে চলিল, সেই বাড়ীর দরজার নিকটে গিয়াই একবার পূর্ব্বদিকে মুখ ফিরাইয়া চক্ষু টিপিয়া পেয়াদাকে ইঙ্গিত করিল, সেই ইঙ্গিতেই আসামীকে সনাক্ত করা মঞ্জুর; পেয়াদা তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া আসিয়া বাবুকে গ্রেপ্তার করিল। ওয়ারীণ দেখাইল।

মায় সুদ খরচা ১২০০৲ টাকার ডিক্রী। বারোটি টাকাও ঘরে নাই, নিরুপায়! তেমন তেমন ক্ষেত্রে যেমন যেমন হইয়া থাকে, তাহাই হইল; ওয়ারীণের পেয়াদা ওয়ারীণের ক্ষমতায় বাবুকে ধরিয়া লইয়া গেল। বাবুর চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। দেনদারের কারাগারে বাস করিতে হইবে, ভাগ্যে এই ছিল! ইহা ভাবিয়াই মনের দুঃখে তিনি একটি নিশ্বাস ফেলিলেন। দালালটা তাঁহার দিকে চাহিতে চাহিতে একটা গলির ভিতর প্রবেশ করিল, খানিক দূর গিয়া কতই যেন অহ্লাদে খিলখিল করিয়া হাসিল।

পাড়ার ভিতরেই—অতি নিকটেই বাবু গ্রেপ্তার, অবিলম্বেই সেই দারুণ কথাটা বউমার কর্ণগোচর হইল; তিনি কেমন একটু বিমনা হইলেন। প্রাণনাথ নিকটে বসিয়াছিল, প্রাণনাথকে তিনি বলিলেন, "কি হবে তবে?"

প্রাণনাথ বলিল, "কি আর হবে?—দেনদারের জেল, খাটুনি নাই, স্বচ্ছন্দে বসে থাক্‌বেন, পরের স্কন্ধে উত্তম আহার

চল্‌বে, কোন কষ্ট হবে না; চিন্তা কি? ফরিয়াদি কিছু বেশী দিন তাঁকে আট্‌কে রেখে খোরাকী যোগাবে না, শীঘ্রই তিনি খালাস পাবেন।"

বউমা একটি নিশ্বাস ফেলিলেন। কত রকম ভাবনা তাঁহার মনে আসিল। বাবুর দেনা অনেক, অনেকগুলো হ্যাণ্ডনোট, বউমা তাহা জানিতেন; মনে মনে ভাবিলেন, "একখানা নোটের ডিক্রীতেই এই দশা, যতবার নূতন নূতন ডিক্রীর ওয়ারীণ আস্‌বে, ততবারই ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পুর্‌বে, কতদিনে যে জেলে যাওয়ার শেষ হবে, কিছুই ভাবা যায় না। আমার দশা কি হবে? বাপের বাড়ী চলে যাব, কি এই-খানেই থাক্‌বো, সেটাও ভেবে চিন্তে ঠিক কর্‌তে পাচ্ছি না। হা বিধাতা! আমার কপালে এই লিখেছিলে!"

বউমাকে বিমর্ষ দেখিয়া, মনে মনে হাসিয়া প্রাণনাথ বলিল, "ভাব্‌ছো কি? আকাশ পাতাল ভাব্‌লেও কোন কিনারা হবে না। আমার হাতে খাতা, সব আমি জানি, অনেক টাকার হ্যাণ্ডনোট, কিছুতেই পরিশোধ হবার নয়।"

ম্লানবদনা বউমা বলিলেন, "আমার অলঙ্কার আছে, কিন্তু তা আমি দিব না। একটা দায় যদি হতো, তা হলে দিতে পাত্তেম, কিন্তু যে রকম গতিক দেখ্‌ছি, তাতে কোরে বুঝ্‌তে পাচ্ছি, বারবার এইরকম হবে; বারবার আমি কোথায় পাব?"

প্রাণনাথ বলিল, "কথাও তো তাই; তুমি কোথায় পাবে? স্ত্রীলোকের অলঙ্কার একটা জীবনের সম্বল। অলঙ্কারগুলি কি হাত ছাড়া কর্‌তে আছে? আগে তোমাকে ভরসা দিয়ে বলেছি, দেনদায়ের জেল, খাটুনি নাই, পরের খরচে খাবেন,

বেশ সুখে থাক্‌বেন, শীঘ্রই খালাস পাবেন। বলেছি বটে ঐ কথা, কিন্তু সেটা আমার মনের কথা নয়। মনের কথা কি জানো, তোমার মুখের উপর বল্‌তে আমার সাহস হচ্ছে না, বাবু কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে ফিরে আস্‌তে পার্‌বেন না; একবার খালাস পাবেন, আবার অন্য ডিক্রীর দায়ে ধরা পড়্‌বেন; এই রকমে বার বার প্রবেশ, বার বার খালাস, অনেকবার ঐ রকম চল্‌তে থাক্‌বে; নীলকুঠীর দালালের মতন কোন কালেও দেনা শোধ হবে না; বাবুরও জেলে যাওয়া ফুরাবে না। স্বামী বর্ত্তমানে তুমি যেন বিধবা হয়ে থাক্‌বে। তাই জন্যই বল্‌ছি, অলঙ্কারগুলি থাক্‌লে ভবিষ্যতে বিস্তর উপকারে আস্‌বে; ভবিষ্যতে কেন, এখুনি—"

কথার ভাব বুঝিয়াই বউমা বলিলেন, "আমিও তাই ভেবেছি। সম্প্রতি পেট খরচের জন্যই গহনায় হাত পড়্‌বে। কতদিনে যে কি হবে, সেই ভাবনাই সর্ব্বদা আমার মনে আস্‌ছে।"

অবসর বুঝিয়া প্রাণনাথ বলিল, "ভাবনাগুলো ছেড়ে দাও। অদৃষ্টে যা থাকে, তাহাই হয়। ভাবনা কোরো না, ভয় কি? আমি একটা চাকরি কর্‌বো, দুজনের তাতে বেশ চল্‌বে, তাড়াতাড়ি গহনায় হাত দিও না।"

ভাবনা আসিল, দুঃখ হইল, সঙ্গে সঙ্গে প্রবোধ আসিল, বউমা একটু সুস্থির হইলেন। প্রাণনাথ আরো অনেক কথা বলিল; ভয় দেখাইল, ভরসা দিল, আশ্বাস দিল, বিশ্বাস জন্মাইল, হিতৈষী বন্ধুর ন্যায় অনেক প্রকার সদুপদেশ ঝাড়িল। বউমার দীর্ঘনাসায় আর একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

একমাস অতীত। বউমা একদিন প্রাণনাথকে বলিলেন, "প্রাণ"—তখনি আবার রসনা কর্ত্তন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "না,—না, বিশ্বাস! পণ্ডিতজি! তোমায় একটা কথা বলি। বাবু আজ একমাস হলো জেলখানায় রয়েছেন, কেমন আছেন, তুমি এক একবার গিয়ে দেখে এসো। দেনদারের জেল, বন্ধুলোকেরা অবাধে গিয়ে দেখা কর্‌তে পারে, কেহই বারণ করে না; তুমি এক একবার গিয়ে দেখে এসো।"

প্রাণনাথ স্বীকার করিল। এক একদিন বলে, "আজ গিয়েছিলেম, বেশ আছেন, আমাকে সাবধানে থাকৃতে বলেছেন, তোমাকেও ভাব্‌তে বারণ করেছেন, তার দেহখানি বেশ আছে।" এক একদিন বলে, "হয়ে এসেছে, আর বড় দেরি নাই, পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই বেরিয়ে আস্‌বেন।" বলে এই রকম, লোকটা কিন্তু একদিনও কেল্লার মাঠ পার হয় না।

আরো একমাস।—খোট্টানী চাকরাণী একদিন প্রাতঃকালে আসিয়া দেখিল, সব ঘরের দরজা খোলা, ঘরগুলি খাঁ খাঁ করিতেছে, ঘরের জিনিষ-পত্র কিছুই নাই, মানুষও নাই। রাস্তায় বাহির হইয়া চীৎকার করিয়া ঐ সকল কথা বলিতে বলিতে খোট্টানী একদিকে ছুটিয়া চলিল, বুক চাপড়াইয়া বলিতে বলিতে গেল, "পালিয়েছে গো পালিয়েছে! আমাকেও ঠকিয়ে গিয়েছে! আমারও পাঁচমাসের তলব বাকী!

পাড়ার বিবেচক লোকেরা অবধারণ করিলেন, চন্দ্রকান্তের সেই মুহুরিটা,—বউ-মার সেই পণ্ডিতটা গত রাত্রে বউ-মাকে লইয়া চম্পট দিয়াছে! জিনিষপত্র—গহনাপত্র, সমস্তই লইয়া গিয়াছে!

লোকেরা যাহা অবধারণ করিলেন, তাহাই যথার্থ। চন্দ্রকান্তবাবু দুঃসময়ে একদিন সন্দেহ করিয়াছিলেন, প্রাণনাথ হয় তো প্রাণপ্রেয়সীর "প্রাণনাথ" হইয়া বসিয়াছে! হায় হায়! তাঁহার সেই সন্দেহটা অখণ্ড ও সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল! প্রাণনাথ বিশ্বাস সত্যই তাঁহার প্রাণপ্রেয়সীর "প্রাণনাথ" হইয়াছে! সহর ছাড়িয়া গিয়াছে কিম্বা সহরের কোন নিভৃত পল্লিতে ঘর ভাড়া করিয়াছে, তাহা জানা গেল না। ছোট সংসার হইলেও চন্দ্রকান্তবাবুর সংসারটি ছারখার!

ওদিকে ডাইমনকুমারী গর্ভবতী!—পুরুষের দাসী হইয়া থাকিতে হয় বলিয়া ডাইমনকুমারী ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, মার্কিণ-কুমারীদের ন্যায় সভ্য হইয়া চিরকুমারী থাকিবেন, জীবনকালের মধ্যে বিবাহ করিবেন না। সেই ডাইমনকুমারী এখন গর্ভবতী!—বাইশ বৎসর বয়স,—বাইশ বৎসরের ব্রাহ্মিকাকুমারী ডাইমনকুমারী গর্ভবতী!—পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানী। বিভ্রাট!—অনাচার-পরায়ণ হিন্দুর গৃহে বিধবার গর্ভ হইলে অবিবেচকেরা তাহাকে কাশীতে অথবা শ্রীবৃন্দাবনে পাঠায়; ব্রহ্মজ্ঞানীদের কাশী যাইতে নাই, বৃন্দাবনেও যাইতে নাই, কি উপায় হয়? ভজহরি ভট্টাচার্য্য গর্ভিনী কন্যাকে লইয়া সপরিবারে দার্জ্জিলিং পর্ব্বতে যাত্রা করিলেন। বাড়ীখানি চাবিবন্ধ রহিল। সংসার ছারখার!

ষষ্ঠ কল্প।

সূর্য্যকান্ত রায়।

পাঠক মহাশয়! এই সময় একবার হলধরপুরে চলুন। হলধরপুর হইতে আরম্ভ করিয়া আপনারা কত স্থানে কত প্রকার ভবের খেলা দর্শন করিতেছেন, স্মরণ করিয়া রাখিবেন। ভবসংসার একটি মাত্র, কিন্তু ভবসংসারের খেলা অশেষ প্রকার। তাহার মধ্যেও শ্রেণীভেদ আছে। বাল্যখেলা, যৌবনখেলা, বার্দ্ধক্যখেলা, মানব-জীবনে ইহা তো আছেই আছে, তাহার মধ্যেও আবার শ্রেণীভেদ। সুখের খেলা, দুঃখের খেলা, বিষাদের খেলা, আনন্দের খেলা, নিরানন্দের খেলা, শোকের খেলা, উৎসবে উৎসবে দেবতাদের অর্চ্চনার খেলা, ইত্যাদি কত প্রকার খেলা হয়, তাহা গণনা করিয়া সীমা করা যায় না।

পিতার মৃত্যুর পর সূর্য্যকান্তবাবুর কনিষ্ঠভ্রাতা চন্দ্রকান্তবাবু দুষ্টলোকের পরামর্শে ধর্ম্মের সংসার হইতে পৃথক হইয়াছিলেন, জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতাবাসী হইয়াছিলেন, পাঠক মহাশয়েরা যথাসময়েই তাহা অবগত হইয়াছেন, পৃথক হইবার পরে যে যে অনর্থ সংঘটিত হইয়াছে, তাহাও আপনারা শ্রবণ করিয়াছেন, এক্ষণে সূর্য্যকান্তবাবু কিরূপ অবস্থায় আছেন, কি করিতেছেন, তাহা দর্শন করুন।

কনিষ্ঠ সহোদরকে তিনি অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন, সেই সহোদরের বিচ্ছেদে তাঁহার মনে এক তিলও সুখ নাই;

তাহার উপর পৈত্রিক সম্পত্তিগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, পৈত্রিক ক্রিয়া-কর্ম্মগুলি বজায় রাখিতে পারিতেছেন না, দারুণ মনস্তাপ; পিতা যাঁহাদিগকে বাড়ীতে রাখিয়া প্রতিপালন করিতেছেন, নিতান্ত অনিচ্ছায় তাহাদিগকে তফাৎ করিয়া দিতে হইয়াছে, সে কষ্টও অল্প নয়। তাহার পর খতীকর্জ্জার মোকদ্দমা। কিসের খৎ, কেন খৎ, কি কারণে ঋণ হইয়াছিল, কিছুই তিনি জানেন না। সেই ভৌতিক ঋণের দায়ে ভদ্রাসন বাড়ী, গ্রামের জমীজমা, বাগানপুষ্করিণী সমস্তই ক্রোক হইয়াছিল, কতক কতক নীলাম হইয়া গিয়াছে, বহুকষ্টে কতক কতক তিনি রক্ষা করিয়াছেন। ভদ্রাসনে কনিষ্ঠের অংশ ছিল না, জমীজমাতে অংশ ছিল, সেই অর্দ্ধাংশ হস্তান্তর হইয়া গিয়াছে; নিজ অংশের কতক কতক জমীজমাও বিক্রীত হইয়াছে; বাড়ীখানি আছে, কয়েকবিঘা ভাল ভাল জমী বজায় আছে, বাগান পুষ্করিণীর অর্দ্ধাংশ হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছিল, খরিদদারকে মূল্য ধরিয়া দিয়া তাহাও তিনি উদ্ধার করিয়াছেন। পিতার দস্তখতী খতগুলার দাবী ছিল পনের হাজার টাকা. নিজের দস্তখতী খতখানার দাবী ছিল দশ হাজার টাকা; এই পঁচিশ হাজার টাকার সুদ খরচা অনেক হইয়াছিল, নিজ অংশের টাকাগুলি সূর্য্যকান্তবাবু সমস্ত শোধ করিতে পারেন নাই, কাজে কাজে কতক কতক জমী বেহাত হইয়া গিয়াছে। বড়ীখানিও তিন দিন পরে নীলাম হইবে। তিনি মনে মনে জানিতে পারিয়াছেন, সমস্তই জাল খত কিন্তু কাহারা কাহারা দাগাবাজী করিয়া সেই সকল খতের জন্ম দিয়াছিল, সেটা জানিতে পারেন নাই।

অল্প আয় হইতে সূর্য্যকান্তবাবু কি প্রকারে সেই সকল ঋণ

পরিশোধ করিয়াছেন, সেই তত্ত্বটি পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত বোধ হয় পাঠক মহাশয়ের কৌতূহল জন্মিতে পারে; অতএব সেই কথাটিই আমরা এইখানে বলিব।

কনিষ্ঠভ্রাতা পৃথক হইয়া যাইবার পর, পৈত্রিক ক্রিয়া-কর্ম্মের ব্যয় লাঘব করিয়া, আশ্রিত পোষ্যগুলিকে তফাৎ করিয়া, মফস্বলের খরচা কমাইয়া, জমীদারী নীলামের পূর্ব্বে সূর্য্যকান্তবাবু বর্ষে বর্ষে কিছু কিছু টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন; তাহাও বড় অধিক নহে, সর্ব্বসুদ্ধ সাত হাজার টাকা। খতের ডিক্রীর মোট টাকা সুদে আসলে প্রায় ত্রিশ হাজারের কাছাকাছি। পিতৃ-ঋণের পরিমাণ সুদ খরচা সমেত আঠার হাজার টাকারও অধিক হইয়াছিল; মোটামুটি হিসাবে তাহার অর্দ্ধাংশ নয় হাজার, তাঁহার নিজ নামের দশ হাজার টাকার খতের ডিক্রী মায় সুদ বার হাজার, এই একুশ হাজার টাকা সূর্য্যকান্তবাবুর নিজ অংশের দেনা। যখন নিলামী ইস্তাহার জারী হয়, সে সময় তাঁহার সম্বল ছিল সেই সামান্য সঞ্চিত সাত হাজার টাকা। চৌদ্দ হাজার অপ্রতুল। কোথা হইতে তত টাকা সংগ্রহ করা হয়, সূর্য্যকান্ত বাবু তাহা ভাবিয়াই মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত দেখিয়া পতিব্রতা ধর্ম্মশীলা বড় বধূঠাকুরাণী নিজের তোলা অলঙ্কারগুলি স্বামীর পদতলে সমর্পণ করিয়াছিলেন, যেইগুলি বিক্রয় করিয়া আট হাজার টাকা উঠিয়াছিল;—বিক্রয় করিবার সময় সূর্য্যকান্তবাবু চক্ষের জল রাখিতে পারেন নাই।

সম্বল ছিল সাত হাজার, অলঙ্কারের মূল্য আট হাজার, একুনে পনের হাজার টাকা সংগৃহীত হয়; তথাপি অকুলান ছয় হাজার। সেই ছয় হাজারের ভাবনায় বাবু অতিশয় অধীর হইয়াছিলেন।

তিন দিন পরেই নীলামের দিন। কি হয়?—ভদ্রাসনখানি বুঝি যায়!

এই ভাবনায় নিতান্ত আকুল হইয়াও ধর্ম্মসাহসে সূর্য্যকান্ত আশা করিয়াছিলেন, অভাব থাকিবে না। পিতার ধর্ম্মের সংসার, এ সংসারে কোনকালে ঋণ প্রবেশ করে নাই; সমস্তই দাগাবাজী, সমস্তই ভেল্কীবাজী, সমস্তই হিংসাপরবশ নষ্টলোকের ষড়যন্ত্র;—জালীয়াতি করিয়া ধূর্ত্তলোকেরা ফাঁকি দিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে, ষড়যন্ত্রটা ঠিক বুঝা হইয়াছে। ভয় রাখি না! পিতা চিরদিন ধর্ম্মের সেবা করিয়া গিয়াছেন, আমিও অহরহ যথাশক্তি ধর্ম্মপূজা করি, ধর্ম্ম কি আমার উপর একেবারে বিরূপ হইবেন? ধর্ম্মের শরীরে কি একবিন্দুও দয়া নাই? ধর্ম্ম কি আমাকে এককালে অতলজলে ডুবাইবেন?—না—না, ডুবাইবেন না; ধর্ম্মই আমাকে তুলিবেন,—ধর্ম্মই আমাকে রক্ষা করিবেন।

স্বর্গ হইতে ধর্ম্মদেব ধর্ম্মসেবক সূর্য্যকান্তের আশাবাক্য শুনিলেন; নারীরূপে মূর্ত্তিমতী হইয়া ধর্ম্ম আসিয়া সে বিপদ হইতে তাঁহাকে পরিত্রাণ করিলেন। ভাবনায় তিনি অবসন্ন, আশায় তিনি সজীব, ঠিক সেই সময়ে রাধারাণী, সারদাসুন্দরী, আর শচীন্দ্রশেখর তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। রাধারাণীর ক্রোড়ে সারদার স্নেহাস্পদ সুকুমার নবকুমার।

স্নেহময়ী গর্ভধারিণী জননীরূপিণী রাধারাণীকে সম্মুখে দেখিয়া সূর্য্যকান্তের চিন্তাবিষণ্ণ বদন সহসা সুপ্রসন্ন হইল; প্রফুল্লবদনে শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি ভক্তিভাবে রাধারাণীর চরণে প্রণিপাত করিলেন। শচীন্দ্রশেখরকে তিনি

চিনিতে পারিলেন না; সারদার মুখপানে অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া মনে মনে চিনিয়া লইলেন, এই সেই সারদা; রাধারাণীর ক্রোড়স্থ শিশুটির মুখপানে চাহিয়া অনুমান করিলেন, এইটি হয় তো সারদার পুত্র; আর একবার শচীন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া আরো অনুমান করিলেন, এইটি হয় তো আমাদের জামাতা; আমার জামাতা নয়, আমার ভগ্নীপতি; সারদার স্বামী।

অনুমান দুটি ঠিক ঠিক। রাধারাণীর মুখে পরিচয় শুনিয়া অনুমান দুটি তিনি সত্য বলিয়াই বুঝিলেন। আনন্দ হইল; পর্য্যায়ক্রমে শিশুর, সারদার ও শচীন্দ্রের মস্তকে করার্পণ পূর্ব্বক বারম্বার তিনি কতই আশীর্ব্বাদ করিলেন; সতী, পতি, উভয়েই ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিল। রাধারাণীর আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া সূর্য্যকান্ত পরম পুলকিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে অন্দর-মহলে প্রেরণ করা হইল; বাবুও স্বয়ং তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। এরূপ শুভ সমাগমে যেরূপ আদর যত্ন হইয়া থাকে, বিষাদের সময়েও আনন্দে আনন্দে সেইরূপ আদর যত্ন হইতে লাগিল।

রাধারাণী যখন আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন, বেলা তখন ছয়-দণ্ড। স্নান আহারাদি সমাপন হইলে অল্পক্ষণের জন্য সকলে একটু একটু বিশ্রাম করিয়া লইলেন। স্নান আহারের পূর্ব্বে রাধারাণী সূর্য্যকান্তের শিশু পুত্র-কন্যা তিনটিকে যৌতুক দান করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন; চিরদিন গৃহলক্ষ্মী হইয়া থাক বলিয়া বউমাটিকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। বউমাটি যাথার্থই গৃহলক্ষ্মী।

অপরাহ্ন সমাগত। রাধারাণী যে ঘরে ছিলেন, সূর্য্যকান্ত

সেই ঘরে আসিয়া বসিলেন। সারদা আসিয়াও সেই ঘরে বসিয়া শিশুটিকে স্তন্যপান করাইতে লাগিল। রাধারাণী বলিলেন, "বাবা! যে পত্রখানি পাঠিয়েছিলে, সেখানির মর্ম্ম আমি ভালরূপ বুঝ্‌তে পারিনি, পরিষ্কার কথা লেখ নাই; বিপদ ঘোটেছে, দুর্দ্দিন এসেছে, এইটুকু মাত্র লেখা;—কি বিপদ, জান্‌তে না পেরে মনে বড় দুর্ভাবনা এসেছিল, এখনো সে দুর্ভাবনা রয়েছে; সেই জন্যই মেয়ে-জামাই নিয়ে ছুটে এসেছি। এমন ধর্ম্মের সংসারে বিপদ হবে, সেটা আমার স্বপ্নেরও অগোচর। বলো তো বাবা শুনি, কি রকম বিপদ?"

ম্লানবদনে বাবুর মুখপানে চাহিয়া করুণস্বরে সারদা জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ, কি বিপদ দাদা? সে পত্রখানা আমিও পড়েছি; বিশেষ কথা কিছুই লেখা নাই; কি বিপদ দাদা?—আপনার বিপদ, পত্রে সেই কথাটা পড়ে আমার সর্ব্বশরীর কেঁপেছিল। ভেবেছিলেম, ধর্ম্মের সংসারে বিপদ আসে?—ধর্ম্ম কি তবে নাই? বলুন,—বলুন, মা যে কথা জিজ্ঞাসা কোচ্ছেন, আমিও তাই জান্‌তে চাই। বলুন,—কি রকম বিপদ?"

ছলছলচক্ষে সূর্য্যকান্তবাবু এক একটি করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা বলিলেন; বলিয়াই অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসনাঞ্চলে নেত্রজল মার্জ্জন করিলেন;—মুখখানি রক্তবর্ণ হইল।

কথা শুনিয়া, ভাব দেখিয়া, রাধারাণী হায় হায় করিতে লাগিলেন, সারদাসুন্দরীও বিস্তর আপ্‌শোষ করিল। তাঁহাদের চারিটি চক্ষুই অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল।

অশ্রুমার্জ্জন করিয়া সারদা জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা! সে বিপদশান্তির কি কোন উপায় হতে পারে না?"

বাবু বলিলেন, "উপায় দিদি, ভগবানের হাতে। মানুষ এখন আমার কোন উপকার করিবে, সে আশা আমি রাখি না। দুঃসময়ে কেহ কাহারও উপকার করে না, তাহার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। বন্ধু-বান্ধবেরাও দেখা করে না। বেশী কথা, কি বলিব, যারা যারা আমার পিতার কাছে সময়ে সময়ে বিস্তর উপকার পেয়েছিল, তারাও এখন আমার পরম শত্রু। যে সকল কথা আমি বলিলাম, তৎসমস্তই কেবল শত্রুপক্ষের কুচক্রের ফল। জমীদারী নীলাম হওয়া, সেটাও কুচক্র, খতের মামলাও দারুণ কুচক্র। সর্ব্বৈব মিথ্যা। খতের কথা কিছুই আমি জানি না, পিতাঠাকুরের এক পয়সাও ঋণ ছিল না, সমস্তই জালখত। গোপনে গোপনে এক তরফা ডিক্রী করাইয়াছে; বেটারা আমার সর্ব্বনাশ করিতেছে!"

ঊর্দ্ধমুখী হইয়া সারদা জিজ্ঞাসা করিল, "কত টাকার খত দাদা?"

সূর্য্যকান্ত বলিলেন, "তুমি ছেলেমানুষ, তুমি সে কথা শুনিয়া কি করিবে?"

রাধারাণী বলিলেন, "ধর্ম্ম যদি থাকেন, আমি নিশ্চয় বোল্‌তে পারি, তোমার এ বিপদ কখনই থাকবে না। সারদা যে কথা জিজ্ঞাসা কোচ্ছে, তার উত্তর দাও।"

অধোবদনে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া, অল্পে অল্পে মুখ তুলিয়া সূর্য্যকান্তবাবু বলিলেন, "আমার নিজ অংশে একুশ হাজার টাকা, তাহার মধ্যে আমার তহবিলে ছিল সাত হাজার, আর আপনার বড় বউটী নিজের অলঙ্কার বিক্রয় করাইয়া আট হাজার টাকা সাহায্য করিয়াছেন! এখন অবশিষ্ট ছয় হাজারের জন্য

আটকাইয়া আছে। কোন উপায় স্থির করিতে পারিতেছি না। নীলামের আর তিনটি দিন মাত্র বাকী।"

জননীর মুখের দিকে একবার সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া, সারদা একবার উঠিয়া দাঁড়াইল, ছেলে কোলে করিয়া বাহির হইয়া গেল। বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া গেল, "আস্‌ছি দাদা, উঠে যাবেন না।"

সারদা বাহির হইল। রাধারাণীর সহিত সূর্য্যকান্তের অন্যান্য কথোপকথন চলিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে উপস্থিত নীলামের দুশ্চিন্তার কথা।

সারদাসুন্দরী যে গৃহটি শয়নের জন্য প্রাপ্ত হইয়াছে, পুত্র ক্রোড়ে লইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল। মাতুলালয় হইতে আসিবার সময় কাপড় ঢাকা দিয়া সারদা একটি ছোট রকম টিনবাক্স সঙ্গে আনিয়াছিল, গৃহে প্রবেশ করিয়া, দ্বার অবরোধ পূর্ব্বক সেই বাক্সটি খুলিল; পরিপূর্ণ ব্যাঙ্কনোট। মাতুলালয়ে সূর্য্যকান্তবাবুর পত্র পাইয়া অবধি সারদা বিজনে বসিয়া মঙ্গলচণ্ডীর প্রদত্ত মোহরগুলির হিসাব করিয়াছে;—হিসাবে বুঝিয়াছে, একহাজার মোহরের মূল্য পঁচিশ হাজার টাকা; মোহনপুরের যে বাইশ ঘর গরিবের মাসিক সাহায্য করিবার সঙ্কল্প, তাহাতে প্রতি মাসে ৬৫৲ টাকা লাগিবে, বৎসরে ৭৮০৲ টাকা; যদি কিছু নূতন যোগ হয়, তাহা হইলে সর্ব্বসুদ্ধ ৮০০ আটশো টাকা; দশ বৎসরে ৮ হাজার; সেই আট হাজার টাকা স্বতন্ত্র রাখা হইবে; বাকী থাকিবে ১৭ হাজার; সেই ১৭ হাজারের মধ্যে ১০ হাজার টাকার মোহর বদলাই করিয়া শচীন্দ্রের দ্বারা ব্যাঙ্কনোট আনাইয়া রাখিয়াছিল; সেই ব্যাঙ্ক-

নোটগুলি এই টিনবাক্সে পরিপূর্ণ। ব্রতের ৮ হাজার, নোটের ১০ হাজার, এই ১৮ হাজার, বাকী ৭ হাজার টাকার মোহর অখণ্ড আছে। বস্ত্রাঞ্চলে নোটগুলি বাঁধিয়া লইয়া, ছেলেটিকে কোলে করিয়া, সারদাসুন্দরী সে গৃহ হইতে বাহির হইল।

এইখানে প্রকাশ থাকুক, গদাধর ভট্টাচার্য্য আর শচীন্দ্রশেখর ভিন্ন সারদার গুপ্তধনের কথা আর কেহ জানিতেন না; হলধর-পুরে আসিবার পূর্ব্বে সারদা সঙ্গোপনে জননীকে সেই গুপ্তকথা বলিয়াছিল, তাহাতেই রাধারাণী সাহস করিয়া কন্যা জামাতার সহিত হলধরপুরে আসিয়াছেন।

সূর্য্যকান্তের সহিত রাধারাণীর কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় সারদাসুন্দরী সেই গৃহ মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিল; প্রবেশ করিয়াই ছেলেটিকে মায়ের কোলে দিয়া, আঁচল খুলিয়া নোট-গুলি বাহির করিয়া সূর্য্যকান্তের সম্মুখে ধরিল; প্রফুল্লমুখে বলিল, "দাদা! ৬ হাজার টাকার জন্য আপনার দায় আট-কাইতেছে, আপনি এই ১০ হাজার টাকা গ্রহণ করুন; ৬ হাজারে ডিক্রীর দেনা শোধ হবে, বাকী ৪ হাজার বউ-দিদির গহনার দামের মধ্যে তাঁকে এখন নগদ দিবেন, বাকী ৪ হাজার আবার আমি শীঘ্রই পাঠাব।"—বলিতে বলিতে দাদার মুখপানে চাহিয়া চকিতস্বরে সতীলক্ষ্মী আবার বলিল, "ওকি দাদা? মুখখানি অমন হলো কেন?—ভাবছেন বুঝি কিছু? ভাব্‌বেন না—ভাব্‌-বেন না—এ টাকা আমার নয়,—মা মঙ্গলচণ্ডীর টাকা, এ টাকা আপনাকে গ্রহণ কোত্তেই হবে; ধর্ম্মের সংসার বজায় রাখ্‌বার জন্য মা জগদম্বা আমার হাত দিয়া এই টাকাগুলি আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

একবার সারদার মুখের দিকে, একবার রাধারাণীর মুখের দিকে, আর একবার সেই নোটগুলির দিকে চমকিত নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া সূর্য্যকান্তবাবু অবাক,—জড় পদার্থের ন্যায় স্তম্ভিত। তাঁহার তখনকার বিস্ময়ভাব দর্শন করিলে বড় বড় কবিরাও সে ভাবের অনুরূপ বর্ণনায় সমর্থ হইতেন কি না, সন্দেহ স্থল। সূর্য্যকান্ত ভাবিতে লাগিলেন, এটা কি স্বপ্ন, না সত্য?—বালিকা সারদা আমাকে ১০ হাজার টাকা দিল! ইহা যথার্থ ই দৈবানুগ্রহ বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। ভাবিতে ভাবিতে কৃতাঞ্জলিপুটে মঙ্গলচণ্ডীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, সারদাকে প্রাণের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া, বিষণ্ণবদনে একটু হাস্য করিলেন; বিস্ময় ভাব দূরে গেল, বিষণ্ণবদন প্রসন্ন হইল।

পরদিন বৈকালে সূর্য্যকান্তবাবুকে নিকটে ডাকাইয়া রাধারাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীতে আগে আগে যাঁরা যাঁরা থাক্‌তেন, তাঁরা তো এখন নেই, দুটি নূতন বউ আর একটি নূতন ছেলে আছে; ওরা কে?"

সূর্য্যকান্ত বলিলেন, "আমার একটি মাসী ছিলেন, তাঁদের এখন কেহই নাই, ঐ একটি ছেলে আর ঐ দুটী বিধবা বউ। অবস্থা বড় খারাপ। ছেলের বাপের নাম ছিল জনার্দ্দন ঠাকুর; তাঁর কতকগুলি শিষ্যযজমান ছিল, মৃত্যুর পর সেগুলি রক্ষা করিবার লোকাভাব. ঐ তিনটি প্রাণীর দিন গুজরাণেরও পূর্ণ অসংস্থান। বালকটি সেই জনার্দ্দন ঠাকুরের পুত্র, বলিয়াছি সে কথা,—বউ দুটি সেই ঠাকুরের পুত্রবধূ; বড় ছেলে দুটি মারা গিয়াছে, বিধবা হইয়া বউ দুটী বড়ই কষ্টে পড়িয়াছিল, ছেলেটিও কার্য্যক্ষম হয় নাই; নিরুপায় নিরাশ্রয় হইয়া আমার

কাছে আসিয়াছিল, আমি আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছি। সম্পর্ক আছে,—নিকট সম্পর্ক ;—পর নয়,—আমি ওদের প্রতিপালন করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছি।"

রাধারাণী বলিলেন, "বেশ কোরেছ। জন্ম জন্ম এই রকম করো।"

সূর্য্যকান্ত বলিলেন, "যখন উহারা আসিয়াছিল, তখন আমার এতদূর দুঃসময় হয় নাই ; সেই অবধিই আছে। যদি কোন-রূপ সুবিধা না হয়, আমি যতদিন বাঁচিব, ততদিন এইখানেই রাখিব, ইহাই আমার ইচ্ছা।"

রাধারাণী বলিলেন, "মা দুর্গা তোমার সাধু ইচ্ছা ফলবতী করুন। ধর্ম্মের পানে চেয়ে আমি বল্‌ছি, যারা যারা বজ্জাতি কোরে তোমাকে এই রকম বিপদে ফেলেছে, মা দুর্গা তাদের সর্ব্বনাশ করুন,—ঝাড়েমুড়ে নিপাত করুন,—তারা সব অনন্ত নরকে পচুক ; তোমার সংসার উথ্‌লে উঠুক। আহা ! তোমার উপর বদিয়াতি করে গা !—তোমার আবার শত্রু হয় গা ! আহা. আইন জান না, আদালত জান না, মকদ্দমা জান না, ঝগ্‌ড়া কোঁদল জান না, দলাদলি জান না, পরের মন্দ কখন কর্‌নি, আদাআদি বাদাবাদির কিছুই জান না, শরীরে রাগ নেই, হিংসে নেই, মনে একবিন্দু লোভ নেই, তোমার আবার শত্রু হয় গা ? জানি নি বাছা, ধর্ম্মের কেমন বিচার !"

বিমাতার চরণে প্রণিপাত করিয়া, সূর্য্যকান্ত কহিলেন, "আইন আদালত যদি ভালবাসিতাম, তাহা হইলে দাগাবাজেরা বোধ হয় আমাকে এতদূর জব্দ করিতে পারিত না।"

রাধারাণী বলিলেন, "তা হোক্,—জব্দ করুক, বেশী দিন

তোমাকে জব্দ কোরে রাখ্‌তে পার্‌বে না। নির্দ্দোষী লোককে যারা জব্দ কর্‌বার চেষ্টা ক'রে, নিজেই তারা শতগুণে জব্দ হয়। আজ হোক্, কাল হোক্, দশ দিন পরেই হোক্, তোমার শত্রুরা একদিন জব্দ হবেই হবে,—মা দুর্গা তাদের উচিত প্রতিফল দিবেনই দিবেন। তুমি ভেব না, আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি, দিব্যজ্ঞানে জান্‌তে পাচ্ছি, তোমার অমঙ্গল কখনই থাক্‌বে না।"

মাতাপুত্রে আরো অনেক রকম কথা হইল। টিপি টিপি সারদা আসিয়া, জানালার বাহিরে দাঁড়াইয়া আগাগোড়া সব কথা শুনিতেছিল, এই সময় ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া, প্রতিমার ন্যায় বাবুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া, প্রফুল্লবদনে বলিল, "জানো দাদা,—মা আমার সাক্ষাৎ মা দুর্গা, মা এখন যে যে কথা বল্লেন, সবগুলি ঠিক ঠিক ফোল্‌বে, নিশ্চয়ই মা দুর্গা সদয় হবেন।"

দাদার ইঙ্গিতে সারদাসুন্দরী বসিল। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, সারদা! তোমার ছেলেটির নাম রেখেছ কি?"

সলজ্জবদনে সারদা উত্তর করিল, "নাম এখন কিছু রাখা হয়নি; রথের দিন হয়েছে, সেই জন্য বাড়ীর সকলের ইচ্ছা নাম থাকে জগবন্ধু। তাই সকলে এখন "জগু জগু" বোলে আদর করে।"

একটু হাস্য করিয়া রাধারাণী বলিলেন, "সারু আমার খুব চালাক মেয়ে! বোল্লে কি না বাড়ীর সকলের ইচ্ছা। সকলের ইচ্ছা কি বুঝ্‌তে পেরেছ? শচীবাবুর ইচ্ছা।"

সূর্য্যকান্তবাবু ঈষৎ হাস্য করিলেন। লজ্জায় সারদাসুন্দরী অধোমুখী।

সে সময়ে আর জমী-জমা মামলা-মোকদ্দমা, দেনা-পাওনা, কিম্বা ঘর-সংসারের কোন কথা উঠিল না,—হাওয়া বদলাইয়া গেল। মৃদু হাসিয়া রাধারাণী বলিলেন, "সারু আমার বেশ মহাভারত পড়ে। কেবল মহাভারত নয়, রামায়ণ, কালীবিলাস, কৃষ্ণবিলাস, গঙ্গাবিলাস, আরো কত কি ধর্ম্মলীলার পাঁজী-পুঁথি পড়ে।" সারদার মুখের দিকে চাহিয়া ফুল্লবদনে তিনি বলিলেন, "শোনাও না দাদাকে গুটিকতক মহাভারতের কথা।"

সুন্দর মুখখানি ঘুরাইয়া আদুরে আদুরে কথায় সারদা বলিল, "মার আমার ঐ একরকম কেমন কেমন ছিষ্টিছাড়া কথা! দাদাকে আমি মহাভারতের কথা শোনাব? দাদার পেটে আঠার পর্ব্ব গজ্ গজ্ কোচ্ছে।"

ঈষৎ হাসিয়া সূর্য্যকান্ত বলিলেন, "গজ্ গজ্ করাই তো ভাল;—যাহা যাহা তুমি বলিবে, ঠিক ঠিক আমি বুঝিয়া লইতে পারিব। বল তো দিদি, কি কি শিখেছ?"

রাধারাণী বলিলেন, "অতি মিষ্ট শুনায়। বল মা, বলো,—তোমার দাদার সাধ হয়েছে শুন্‌তে। এদিকেও সন্ধ্যে হয় হয় হয়ে এসেছে, আমিও এই সময় তোমার মুখে গুটিকতক ধর্ম্ম-কথা শুনে রাখি।"

মাতার অনুরোধ, ভ্রাতার অনুরোধ, ধর্ম্মেরও অনুরোধ, তিন অনুরোধে বাধ্য হইয়া সারদাসুন্দরী মহাভারত বলিতে আরম্ভ করিল;—সংক্ষেপে সংক্ষেপে নলরাজার উপাখ্যান, শ্রীবৎসের উপাখ্যান, হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, রামবনবাসের উপাখ্যান,

শিবিরাজার উপাখ্যান, দিব্য স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া শুনাইয়া দিল।

আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া রাধারাণী বলিলেন, "বুদ্ধি থাক্‌লেই হয় না,—বুদ্ধি আবার সময়বিশেষে, জায়গাবিশেষে, অবস্থা-বিশেষে খাটানো চাই।" উল্লাসে উল্লাসে সূর্য্যকান্তের বদন নিরীক্ষণ করিয়া স্নেহময়ী সস্নেহবচনে আবার বলিলেন, "দেখ্‌লে বাবা, মেয়ের আমার কত বুদ্ধি? তোমার এখন দুঃসময় পড়েছে, তাই ঐ সব মহাপুরুষের দৃষ্টান্তগুলি বোলে তোমাকে সান্ত্বনা দিলে। নলরাজা, শ্রীবৎসরাজা, রামরাজা, শিবিরাজা, আর রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানগুলি শোনালে;—কেমন সুকৌশলে তোমাকে বিপদে অবসন্ন হতে নিষেধ কোল্লে।"

সূর্য্যকান্ত বলিলেন, "তাহা আমি অনেকক্ষণ বুঝিয়াছি। সতীসাবিত্রী হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করুক, শচীন্দ্রশেখর দীর্ঘজীবী হোক, ছেলেটি শতায়ু হইয়া সুখে থাকুক, আজ আমি সারদার কাছে অনেক জ্ঞান পাইলাম। অবসন্ন হইব না ভাবি, কিন্তু কোথা হইতে অবসন্নতা ছুটিয়া আসিয়া আমাকে গ্রাস করে। এখন অবধি আর সে সকল ভাবনা কিছুই মনে আনিব না। ভাবনা আসিলেই ঐ সকল মহাত্মা মহাপুরুষের নাম, কীর্ত্তি স্মরণ করিব, সকল প্রকার দুশ্চিন্তাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিব।"

একটু কি ভাবিয়া রাধারাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "শিবিরাজার দৃষ্টান্তটি কেন এনেছে বুঝেছ? শিবিরাজা দুর্দ্দশায় পড়েন নি, তিনি শরণাগত-রক্ষক ছিলেন,—নিজের গায়ের মাংস কেটে দিয়ে শ্যেনপক্ষীর মুখ থেকে আশ্রিত কপোতপক্ষীকে রক্ষা

করেছিলেন। তুমিও শরণাগতপালক,—বিপদে পোড়ে যে কেহ শরণ লয়, সাধ্যমতে তার উপকার করা ধর্ম্মের উপদেশ, সেটা তুমি বেশ জানো, শরণাগতকে পরিত্যাগ কর্ত্তে নাই;—তোমার জানা কথা স্মরণ করাবার জন্য সারদা তোমাকে শিবিরাজার দৃষ্টান্তটি শুনিয়েছে।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সূর্য্যকান্ত বলিলেন, "শরণাগত পালন করিতে কৈ পারি মা? তাহা যদি পারিতাম, তবে আর নিজ সম্পর্কের আশ্রিত পরিবারগুলি এ সংসার হইতে বিদায় হইয়া যাইত না।"

আশ্বাস দিয়া রাধারাণী বলিলেন, "ভেব না তুমি, আবার তাদের আনাবো। সংসার আবার যেমন তেমনই সুখের সংসার হবে,—ধনে জনে পরিপূর্ণ থাক্‌বে।"

বাক্যে বাক্যে প্রতিধ্বনি করিয়া সারদাসুন্দরী বলিল, "আবার তাদের আনাবো। সংসার পরিপূর্ণ হবে।"

সন্ধ্যা হইল। তিনজনে স্ব স্ব কর্ত্তব্যকার্য্যে তিনদিকে চলিয়া গেলেন।

দুইদিন পরে নীলাম। নীলামের দিন সমাগত। নীলাম-ওয়ালারা যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল, অনেক লোক জমিল, নীলাম ডাকা আরম্ভ হইল। পল্লীগ্রামের বাড়ীর বেশী দাম হয় না; একবিঘা নিষ্কর জমীর উপর মায় আওলাৎ একতালা নূতন বাড়ী; হাজার টাকা হইতে ডাক আরম্ভ হইয়া তিন হাজার টাকা পর্য্যন্ত উঠিল; তাহার বেশী আর কেহ ডাকিল না। সূর্য্যকান্তবাবু ইত্যগ্রে সিদ্ধেশ্বরকে উপদেশ দিয়া রাখিয়াছিলেন, সকলের ডাক শেষ হইলে তুমি তাহার

উপর ৫০০৲ টাকা বেশী ডাকিও; লোকেরা যখন জিজ্ঞাসা করিবে, কে ডাকিল?—তখন তুমি বলিও, শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর নামে আমি ডাকিলাম। সেই উপদেশানুসারে সব ডাকের পর শেষকালে সিদ্ধেশ্বর ডাকিল, সাড়ে তিন হাজার। সেই ডাকেই নীলাম মঞ্জুর। বাবু যেরূপ শিখাইয়া দিয়াছিলেন, নীলামওয়ালার সম্মুখে হাজির হইয়া সিদ্ধেশ্বর সেই কথাই বলিল, নীলাম শেষ হইয়া গেল।

পূর্ব্বের নীলামে যে সকল জমী-জমা ডাক হইয়াছিল, সূর্য্যকান্তবাবু নিজেই সেগুলি বেনামীতে ডাকিয়া লইয়াছিলেন; বাড়ীখানিও বেনামী হইল। বাড়ীর অধিকারিণী হইলেন শ্রীমতী রাধারাণী দেবী।

দশদিন থাকিয়া সপুত্র কন্যাজামাতাকে লইয়া রাধারাণী দেবী মোহনপুরে যাত্রা করিলেন;—সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া শীঘ্র আবার আসিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া গেলেন।

একপক্ষ অতীত। সূর্য্যকান্তবাবু কতকটা শান্ত হইয়া সম্ভবমত স্বচ্ছন্দে সংসার-ধর্ম্ম পালন করিতেছেন, সেই সময় হঠাৎ চন্দ্রকান্তের দুর্ভাগ্যের সংবাদ তাঁহার কর্ণে আসিয়া পৌঁছিল। চন্দ্রকান্ত পৃথক হইয়াছিলেন, কিন্তু ভাই ভাই মনোবাদ হয় নাই, পূর্ব্বের ন্যায় না হোক, সাদাসিদা সম্প্রীতি ছিল, সহোদরের দুর্জ্জয় বিপদের সমাচার পাইয়া তিনি অতিশয় মনোবেদনা পাইলেন,—নির্জ্জনে নীরবে রোদন করিলেন; পরদিনই কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন, জানবাজারের বাড়ীর নিকটস্থ প্রতিবেশীগণের মুখেই বিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। চন্দ্রকান্ত বুদ্ধির দোষে কুসঙ্গে মিশিয়া, কুলোকের

মন্ত্রণায় সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া, কারাবাসী হইয়াছেন। এখনকার উপায় কি? কারাগারে সূর্য্যকান্ত একবার ভ্রাতাকে দেখিয়া আসিয়াছিলেন, উদ্ধারের উপায় করিতে পারেন নাই। অনেক টাকার অনেক হ্যাণ্ডনোট, সে অবস্থায় তাহা পরিশোধ করা তাঁহার অসাধ্য, সুতরাং চক্ষের জলে ভাসিয়া তিনি মর্ম্মান্তিক দুঃখে দেশে ফিরিয়া যান। চন্দ্রকান্তের স্ত্রীটি কোথায়, তিনি তাহারও কোন সন্ধান জানিতে পারেন নাই।

সপ্তম কল্প।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

এক বৎসর অতীত। যে সকল হিংসাপরায়ণ লোকের ষড়যন্ত্রে সূর্য্যকান্তের দুরবস্থা, সেই সকল লোক আপনাপনি মাকড়সার জালে জড়াইয়া পড়িল। হরকান্তবাবুর পুরাতন আমলাগুলিকে জবাব দিয়া, পুত্রেরা মফস্বলে ভিন্ন ভিন্ন কাছারী স্থাপন করিয়া, নূতন নূতন নায়েব গমস্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন বলা উচিত, সেই নূতন আম্‌লারা ষড়যন্ত্রকারী চক্রীদলের পেটাও লোক; চক্রীদলের পরামর্শেই নূতন নায়েবেরা লাটের কিস্তির খাজনা বাকী ফেলিয়া জমীদারীগুলি নীলাম করাইয়াছিল। যাহারা নীলাম-খরিদ্দার, তাহারাও চক্রীদলের পেটাও লোক;—যাহারা জালখতের মহাজন হইয়াছিল, তাহারাও চক্রীদলের হাতের লোক; তত লোকের,—বিশেষতঃ দুষ্ট লোকের বেশীদিন ঐক্য থাকা অসম্ভব। লাভের বখ্‌রা লইয়াই সে রকম লোকের পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। নূতন নায়েবেরা পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদিগকে কেহই খুঁজিয়া পায় নাই; নীলামে যাহারা জমিদারী কিনিয়াছিল, জালখতে যাহারা মহাজন হইয়াছিল, চক্রীদলের সহিত তাহাদের দলাদলি ঘটিল। চক্রীরা বলে, "আমাদের পরামর্শে তোমাদের লাভ, সেই লাভের অর্দ্ধেক অংশ আমরা চাই।" অন্য পক্ষ বলে. "তাহা আমরা কেন দিব? কত

ঝুঁকি মাথায় কোরে আমরা তত বড় কাজ কোরেছি, সব লাভ আমাদের।” মহামারী ব্যাপার! যাঁড়ে বাঘে যুদ্ধ! সে যুদ্ধের পরিণাম কি হইল?

বিরোধীপক্ষের জনকতক লোক সূর্য্যকান্তবাবুর নিকট আসিয়া, নানারকম ভূমিকা করিয়া বলিল, “আমাদের যদি আপনি বাঁচান, তাহলে আমরা সকল প্রকার ঘটনার বিশেষ বিশেষ কথা আপনার কাছে প্রকাশ করি।”

সূর্য্যকান্তবাবু বলিলেন, “অঙ্গীকার করিতেছি. বাঁচাইবার উপায় থাকিলে অবশ্যই আমি তোমাদিগকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিব। বল দেখি, গুপ্তচক্রের ব্যাপারখানা কিরূপ?”

লোকেরা একে একে আগাগোড়া সকল কথাই বলিয়া ফেলিল। সূর্য্যকান্তবাবু চমকিত হইলেন। পূর্ব্ব হইতেই কতক কতক তিনি সন্দেহ করিয়াছিলেন, তাহাই এখন ঠিক ঠিক মিলিল; সেই সকল লোককে সাক্ষী করিয়া তিনি মোকদ্দমা তুলিবার সঙ্কল্প করিলেন। যাহারা গোয়েন্দা হইতে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্য হইতে একজন পুরোবর্ত্তী হইয়া বলিল, “ডিটেক্‌টিভ ভেজাতে হবে। সেই সকল কুচক্রী লোক এখনও এক এক রাত্রে ভবশঙ্কর সেনের বাড়ীতে বৈঠক করে, বুক বাজিয়ে বাজিয়ে সেই সব কথার আন্দোলন করে, আমাদিগকে ফাঁকি দিবার প্যাঁচালো প্যাঁচালো যুক্তি খাটায়;—পুলিসের একজন পাকা ডিটেক্‌টিভ যদি দুইরাত্রে সেই বৈঠকে উপস্থিত থাক্‌তে পারে, তা হলে একেবারে ঝাঁকের উপর লাঠি পড়ে, সব ক'টা একসঙ্গে ধরা পড়ে যায়। আপনি একজন বহুদর্শী ডিটেকটিভ্‌কে হাত করুন; দরকারমতে তাকে পাওয়া যেতে

পারে, সেইরূপ একটা ব্যবস্থা করে রাখুন। যে রাত্রে বৈঠক হবে, আপনাকে আমরা সংবাদ দিব, আপনি তাকে আনাবেন; বাকী কাজ আমরাই হাঁসিল্ করবো।"

চিন্তা করিয়া সূর্য্যকান্তবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, আজ তোমরা যাও, তিনদিন পরে আর একবার দেখা কোরো। সন্ধ্যার পর এসো;—সকলকে আস্‌তে হবে না, একজন এলেই চল্‌বে।"

লোকেরা বিদায় হইল, সূর্য্যকান্তবাবু ভাবিতে বসিলেন। পুলিসের সঙ্গে তাঁহার কোন সংস্রব ছিল না, তথাপি একজন ডিটেক্‌টিভের সঙ্গে তাঁহার আলাপ ছিল। কার্য্যে সেই ডিটেক্‌টিভের যথেষ্ট সুখ্যাতি; তাঁহাকেই তিনি সংবাদ দিবেন স্থির করিয়া রাখিলেন।

উপযুক্ত অবসরে সংবাদ দেওয়া হইল, ডিকেক্‌টিভ্ আসিলেন, বাবু তাঁহাকে রাত্রি চারিদণ্ড পর্য্যন্ত চণ্ডীমণ্ডপে বসাইয়া রাখিলেন। তিনদিন পরে একজন গোয়েন্দার আসিবার কথা ছিল, সেই দিন সেই গোয়েন্দা আসিল, ডিটেক্‌টিভের সঙ্গে গোয়েন্দার দুটি পাঁচটি কথা হইল।

অশুভ চক্রের পরিবর্ত্তনে শুভ চক্র যখন ঘুরিয়া আইসে, সকল দিকেই তখন সুরাহা হয়;—সেই রাত্রেই চক্রীদলের বৈঠক। গোয়েন্দা সেই কথা জানাইল। ডিটেক্‌টিভ্ প্রস্তুত। তাঁহার সঙ্গে একটি বড় রকম ব্যাগ ছিল, বাবুকে আর গোয়েন্দাকে একটু সরাইয়া দিয়া, সেই ব্যাগটি খুলিয়া তিনি একরকম সজ্জা বাহির করিলেন, নিজের পোষাক ছাড়িয়া দিব্য একটী সন্ন্যাসী সাজিলেন; গায়ে মুখে খড়িমাখা, চক্ষের কোলে সিন্দুরের রেখা, ললাটে চীনের সিন্দুরের দীর্ঘ ফোঁটা, মস্তকে লম্বা লম্বা

জটা, মুখে দীর্ঘ দীর্ঘ গোঁপদাড়ি, গলদেশে ও বাহুযুগলে হালি হালি রুদ্রাক্ষমালা, পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম, হস্তে একটা চিম্‌টা; দিব্য একটি শিব-সন্ন্যাসী।

সজ্জা সমাপ্ত হইলে মিহিস্বরে সন্ন্যাসী একটি বাঁশী বাজাইলেন, গোয়েন্দার সহিত সূর্য্যকান্তবাবু চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া প্রণাম করিবার ইচ্ছা হইল, সূর্য্যকান্তবাবু ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসীটি ব্রাহ্মণ, তিনিও হস্ত উর্দ্ধে তুলিয়া "স্বস্তিঃ স্বস্তিঃ—শিবঃ শিবঃ" বাক্য উচ্চারণ করিলেন।

দুই একটি কথার পর গোয়েন্দা পথপ্রদর্শক হইল, সন্ন্যাসী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ভবশঙ্করের বাড়ীখানি একটু দূর হইতে দেখাইয়া দিয়া, গোয়েন্দা ধাঁ করিয়া সরিয়া গেল।

ঝম্‌ঝম্ করিয়া চিম্‌টার কড়াগুলি বাজাইতে বাজাইতে, "শিব কেদার—বম্ কেদার" শব্দ করিতে করিতে দীর্ঘাকার শিব-সন্ন্যাসী বামে দক্ষিণে হেলিতে হেলিতে সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সরাসর ভবশঙ্করের বৈঠকখানার চৌকাঠের উপর দণ্ডায়মান।

বৈঠকে যাহারা বসিয়াছিল, হঠাৎ রাত্রিকালে সন্ন্যাসী দেখিয়া তাহারা সকলেই বিস্ময়াপন্ন। সাধু সন্ন্যাসীর উপর ভবশঙ্করের বাহ্যভক্তি বিলক্ষণ, তিনি গাত্রোত্থান করিয়া সযত্নে সন্ন্যাসীকে বসিবার আসন দিলেন, গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিলেন। "বম্ বিশ্বেশ্বর" বলিয়া সন্ন্যাসী দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিলেন।

প্রায় সব সন্ন্যাসীই গাঁজা খায়, বৈঠকের দুই চারিটি পাণ্ডাও

গঞ্জিকাভক্ত;—সন্ন্যাসীকে গঞ্জিকা সেবা করাইবার উদ্যোগ হইতে লাগিল; কিন্তু এ সন্ন্যাসী গাঁজা খান না; হস্তসঞ্চালন পূর্ব্বক তিনি ভক্তগণকে নিষেধ করিলেন;—হিন্দি করিয়া বলিলেন, "কিছুই প্রয়োজন নাই, কেবল রাত্রিকালে আশ্রয় ভিক্ষা।"

বৈঠকের কার্য্য বন্ধ হইল না, সন্ন্যাসী দেখিয়া সন্দেহও হইল না, হরকান্তবাবুর ষ্টেটের গল্প চলিতে লাগিল। সন্ন্যাসী স্থির হইয়া, কান খাড়া করিয়া, একমনে সেই সকল গল্প শুনিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসীর কর্ণ রহিল বৈঠকী লোকগুলির বাক্যের দিকে, চক্ষু রহিল তাহাদের মুখের দিকে। কাহার মুখখানি কেমন, আড়ে অড়ে তিনি বিশেষরূপে তাহা নিরীক্ষণ করিলেন। কিরূপ চেহারার লোকেরা কিরূপ কার্য্য করিতে পারে, মুখশ্রী-বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা তাহা যেমন নিরূপণ করিতে পারেন, পুলিসের বহুদর্শী ডিটেক্‌টিভেরাও সেইরূপ নিরূপণে সমর্থ। সন্ন্যাসীরূপী ডিটেকটিভ্ সেই লোকগুলির মুখ দেখিয়া তথ্য বুঝিয়া লইলেন।

বৈঠক ভঙ্গ হইল। সন্ন্যাসীর মুখের দিকে কটাক্ষপাত করিতে করিতে লোকেরা যখন বিদায় হয়, একটি লোক সেই সময় নয়নেঙ্গিতে ভবশঙ্করবাবুকে ডাকিয়া, নির্জ্জনে লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিল, "সন্ন্যাসীটা রাত্রে এখানে থাক্‌তে চায়, দেখ্‌বেন,—সাবধান,—জিনিষ-পত্র যেন বাহিরে থাকে না; সন্ন্যাসীরা প্রায়ই চোর হয়।"

হাস্য করিয়া ভবশঙ্কর বলিলেন, "কি চুরি কর্‌বে? ছবি

দেয়ালগিরি নিয়ে যেতে পার্‌বে না, বালিশ-বিছানা নিয়ে যেতে পার্‌বে না, চৌকিদারেরা পাকড়াবে,—পালাবার যদি চেষ্টা করে, রাত থাক্‌তেই যদি পালাবার পন্থা দেখে, তাও পার্‌বে না;—দরজার কাছে একজন দরওয়ান শুয়ে থাক্‌বে; তাকে আমি সজাগ থাক্‌তে বোলে দিব।”

লোকেরা বিদায় হইল। যে লোকটা সন্ন্যাসীকে চোর ঠাওরাইয়াছিল, সে লোকটার কথা সন্ন্যাসীর কর্ণে প্রবেশ করে নাই, কিন্তু ভবশঙ্করের গোটাকতক কথা তিনি সুস্পষ্ট শুনিয়াছিলেন। শুনিয়া কিন্তু সন্ন্যাসীর মনে কষ্ট হইল না, মাথা হেঁট করিয়া তিনি মৃদু মৃদু হাস্য করিলেন।

একটু পরে বাবু স্বহস্তে একবাটী দুগ্ধ, আর খানকতক পাটালী আনিয়া সন্ন্যাসীর সম্মুখে রাখিলেন। সন্ধ্যার পর সন্ধ্যাহ্নিক করিয়া, সন্ন্যাসী সাজিবার চারিদণ্ড পূর্ব্বে তিনি সূর্য্যকান্তবাবুর বাড়ীতে উদর পূর্ণ করিয়া জলযোগ করিয়াছিলেন, হিন্দী করিয়া বলিলেন, “রাত্রিকালে আমি কিছুই আহার করি না, আপনি ঐ সামগ্রীগুলি বাড়ীর ভিতর রাখিয়া আসিতে পারেন।”

ভবশঙ্করবাবু তথাপি দুই তিনবার অনুরোধ করিলেন, অনুরোধ রক্ষা হইল না। বাবু একজন দাসীর নাম ধরিয়া ডাকিলেন, দাসী আসিয়া দুধ পাটালী লইয়া গেল।

নিকটে আসিয়া বসিবার জন্য আগ্রহ জানাইয়া, ভবশঙ্করবাবু ভক্তিভাবে সন্ন্যাসীকে বলিলেন, “এই গালিচার উপর আমি একখানি মৃগচর্ম্ম পাতিয়া দিতেছি, সে আসনে বসিতে আপনার আপত্তি আছে কি?”

ক্ষণেক মৌন থাকিয়া হিন্দী কথায় সন্ন্যাসী বলিলেন, "আর বসিব না। প্রথমে বলিয়াছিলাম, এই আশ্রমে নিশাযাপন করিব, কিন্তু এখন ভাবিয়া দেখিলাম, আবশ্যক নাই; গ্রামের ঠাকুর-বাড়ীতেই বিশ্রাম করিব," বলিয়াই সন্ন্যাসী দাঁড়াইলেন। ভবশঙ্করবাবু প্রণাম করিলেন, "শিবঃ শিবঃ" উচ্চারণ করিয়া সন্ন্যাসী বাহির হইয়া গেলেন। রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর।

গালিচার উপর বসিয়া, বৃহৎ একটা তাকিয়ার গায়ে ঠেস দিয়া, ভবশঙ্করবাবু মনের আয়েসে আলবোলা টানিতে লাগিলেন, ওষ্ঠপুটে যেন কোন রণ-বিজয়ের হর্ষসূচক হাস্যরেখা দেখা দিল। কি কারণে হাস্য, পাঠক মহাশয়, তাহা হয় তো অনুমানে অনুমানে বুঝিয়া লইতেছেন—তবু আমরা একটু শাট করিয়া বুঝাইতেছি। প্রথম কথা, জিনিষচুরির ভয় গেল. দ্বিতীয় কথা. কিছু বেশী আনন্দের। তিনি ভাবিলেন, সন্ন্যাসীটা সব কথা হিন্দী কয়; নিশ্চয়ই এ হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী; আমাদের কথাবার্ত্তার একটি বর্ণও বুঝিতে পারে নাই।

ওদিকে ডিটেক্‌টিভ্ সন্ন্যাসী দ্রুতপদে সূর্য্যকান্তবাবুর বাড়ীতে গিয়া বারবার জোরে জোরে দরজায় করাঘাত করিলেন। কেহই কিছু উত্তর দিল না। সন্ন্যাসী চীৎকারস্বরে ডাকিলেন না, কাহারও উত্তর না পাইয়া একটু উঁচুস্বরে বাঁশী বাজাইলেন। তাড়াতাড়ি সূর্য্যকান্তবাবু স্বয়ং আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন, সন্ন্যাসী প্রবেশ করিলেন।

রাত্রেই সন্ন্যাসী আসিবেন, বাবু তাহা জানিতেন, বাড়ীর ভিতর শয়ন করিতে যান নাই, চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়াই ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন; দ্বারে করাঘাত-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া তিনি

মনে করিয়াছিলেন, হয় ত কোন বদ্‌মাস লোক; সেই জন্যই উত্তর দেন নাই;—শেষকালে বংশীধ্বনি শুনিয়া শীঘ্র শীঘ্র দ্বার খুলিয়াছেন।

সন্ন্যাসীর শুভ যাত্রার সময় সূর্য্যকান্তবাবু তাঁহার সন্ন্যাসী-বেশ দর্শন করিয়াছিলেন, সেই সন্ন্যাসী-বেশেই পুনর্দ্দর্শন; তথাপি তাঁহার মুখে হাস্য দেখা দিল; হাসিয়া তিনি বলিলেন, "সন্ন্যাসী, আজ ফিরে যাও বাসায়।"

সন্ন্যাসীও হাস্য করিলেন। বাবু তখন পরিহাস পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বেশ সম্বরণ করুন; আমি গৃহী লোক, সন্ন্যাসীর সহিত আমার বিষয়-কর্ম্মের কথা চলিবে না, বিষয়ীবেশ ধারণ করুন। দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, রাত্রিও গভীর, আর কেহ আসিবে না।" পরিহাস ত্যাগ করিয়াও বাবুর আবার আর একটু রহস্য করিবার ইচ্ছা হইল; হাস্য করিয়া তিনি বলিলেন, "মিলেছে আমার ভাল সন্ন্যাসী-গোঁসাই।"

বন্ধু আসিয়া আহার করিবেন, বাবু তজ্জন্য সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন, কথা রাখিয়া অগ্রেই বন্ধুকে আহারার্থ আমন্ত্রণ করিলেন। বন্ধু বলিলেন, "একটু পরেই হইবে; দুইপ্রহরের পূর্ব্বে কোন রাত্রেই আমার আহার জোটে না, এক একদিন শেষ রাত্রিও হইয়া যায়;—অল্প রাত্রে আহার করা আমার অভ্যাস নয়; দেরি হওয়াই ভাল। আর একটা বিশেষ কথা কি,—সন্ন্যাসীর তপস্যার বৃত্তান্ত সন্ন্যাসীবেশেই বর্ণন করা শাস্ত্রসম্মত। এই বেশেই আমি আপনাকে আমার দৌত্যকার্য্যের পরিচয় দিব। দশটা লোককে দেখিয়া আসিলাম, দশজনের মধ্যে একজন সেই বাড়ীর কর্ত্তা ভবশঙ্কর। সবাকার

মুখগুলি চিনিয়া আসিয়াছি; একবৎসর পরে দেখিলেও ঠিক চিনিতে পারিব। আপনার উপর যাহারা যাহারা দৌরাত্ম্য করিয়াছে, তাহাদের নাম আপনি জানেন ?"

বাবু বলিলেন, "সকলের নাম আমি জানি না; সকলকে হয় ত আমি দেখিও নাই;—যাহাদের উপর আমার সন্দেহ হয়, তাহাদের মধ্যে কেবল তিনজনের নাম আমি বলিতে পারি; ভবশঙ্কর সেন, উমানাথ তরফ্দার, আর জটাধারী বিশ্বাস।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "উমানাথের আর জটাধারীর চেহারা কিরূপ, বলুন দেখি ?"

সূর্য্যকান্তবাবু সেই দুইজনের অবিকল চেহারা বলিয়া দিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, "ঠিক! তাহারাও সেই বৈঠকে ছিল। ভবশঙ্করকে আমি বেশ চিনিয়াছি। পরিচয় না থাকিলেও ব্যবহার দেখিয়া বাড়ীর কর্ত্তাকে চিনিয়া লওয়া ভারি কথা নয়। আপনি যদি ভরসা দেন, সেই তিনজনকেই আমি আগে ধরি। চালান দিবার অগ্রে থানার ঠাণ্ডাগারদে রীতিমত ঠাণ্ডা করিলে, তাহাদের মুখেই অন্যান্য লোকের নাম বাহির হইবে।"

বাবু বলিলেন, "আমার ভরসা আপনি;—আপনি যদি ঐ তিনজনকে আগে ধরা ভাল বিবেচনা করেন, তবে ধরুন। আমি কেবল এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ঐ তিনজনই সমস্ত কুচক্রের মূল।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমিও বুঝিয়াছি, উহারাই পালের গোদা। আচ্ছা, এইবার যেদিন বৈঠক বসিবে, সেই দিনই তাহাদের গোদাগিরী বাহির করিব। আপনি কিন্তু আপনার সেই গোয়েন্দাটির মুখে বৈঠকের দিনের সংবাদ জানিয়া আমার

কাছে লোক পাঠাইবেন। দশ বারদিন আমি এই এলাকার পুলিস-থানায় অবস্থান করিব; আরও দুই তিনটা জটিল তদন্ত আছে; দিনমানে হয় ত থানায় থাকিতে পারিব না, বেশী রাত্রেও থাকিব না;—সন্ধ্যার পর আটটার মধ্যে লোক পাঠাইবেন।”

বাবু স্বীকার করিলেন, বেশী কথা না তুলিয়া একবার বাড়ীর ভিতর গেলেন, আহারের আয়োজন করিতে বলিয়া আবার তখনি চণ্ডীমণ্ডপে ফিরিয়া আসিলেন। সন্ন্যাসী এই সময় বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া বাবু সাজিলেন।

অতঃপর আহারাদি করিয়া উভয়ে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বসিলেন। চণ্ডীমণ্ডপেই দুটি শয্যা প্রস্তুত হইল, রাত্রি আড়াই প্রহরের পর উভয়ে শয়ন করিলেন; সমস্ত রাত্রি বাতী জ্বলিল। পূর্ব্বে বলা কহা ছিল, ভোরে উঠিয়াই ডিটেকটিভ প্রস্থান করিলেন।

আটদিন পরে আবার ভবশঙ্করের বাড়ীতে চক্রীদলের বৈঠক। সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বিধুভূষণ প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। পূর্ব্বকথিত ডিটেকটিভের নাম বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৈঠক বসিয়াছে, সবগুলি একত্র হইয়াছে, নূতন নূতন ফন্দীফিকিরের কথায় হাস্যের তুফান উঠিতেছে, রাত্রি ছয়দণ্ড। রক্তবর্ণ চাপকান পরা, কৃষ্ণবর্ণ কটিবন্ধ, রক্তবর্ণ বাঁধাপাগড়ী, গুচ্ছ গুচ্ছ গালপাট্টা, একটি লোক সেই বৈঠকের বিছানার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। পকেট হইতে একখানা রঙ্গীণ খাম বাহির করিয়া, মাথা নাড়িয়া দেখিয়া দেখিয়া ধীরে ধীরে সেই লোকটী বলিল, “বাবু ভবশঙ্কর সেন—টেলিগ্রাফ।”

পেয়াদার হস্ত হইতে খামখানা লইয়া একটি লোক সেখানা ভবশঙ্করের হস্তে প্রদান করিল। খাম খুলিয়া পাঠ করিয়া, পেয়াদার দিকে চাহিয়া ভবশঙ্কর বলিলেন, "আচ্ছা, যাও"

একজন জিজ্ঞাসা করিল, "কোথাকার খবর? সুখবর তো?"

ভবশঙ্কর বলিলেন, "নামটা বোঝা যাচ্ছে না। লিখেছে, দিদি ভাল আছে, চিন্তা করিবেন না।"

কথা বলিতে বলিতে বাবু একবার দরজার দিকে চাহিলেন, পেয়াদার উপর নজর পড়িল, পেয়াদা তৎক্ষণাৎ একটু কুঁজো হইয়া সেলাম করিয়া বলিল, "বাবু, বক্‌সিস্।"

বাবু বলিলেন, "এটা কোন কাজের খবর নয়, দোস্‌রাবারে দেখা যাবে!"

পুনরায় সেলাম করিয়া পেয়াদা চলিয়া গেল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে দ্বাদশজন সুসজ্জিত কনষ্টেবল সেই বৈঠকে উপস্থিত;—অগ্রে অগ্রে একজন সর্দ্দার জমাদার।

পুলিসের লোক দেখিয়া বৈঠকের লোকেরা চমকিয়া উঠিল। জমাদার বলিল, "জাল নীলাম ও জালখতের মাম্‌লায় আসামী-দের নামে ওয়ারীণ।"

চমকিত লোকেরা এইবার ভয় পাইয়া আরও অধিক চম-কাইল, সকলেরি মুখ শুখাইল, কেহ কেহ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। পলায়ন করিবার উপায় নাই, দরজার ধারে সারি সারি যমদূত।

জমাদার বলিল, "ভয় নাই, সকলকে বাঁধা যাবে না;—সকলকেই কিন্তু আমাদের সঙ্গে থানায় যেতে হবে;" বলিয়াই

পশ্চাতে ফিরিয়া প্রহরীদের দিকে ইঙ্গিত করিল, তিনজন কনষ্টেবল গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। হস্তস্থিত ছড়ি দ্বারা জমাদার একে একে তিনটি লোককে দেখাইয়া দিল, কনষ্টেবলেরা সেই তিনটি লোকের হাতে হাতকড়ি লাগাইল;—ভবশঙ্কর, উমানাথ, আর জটাধারী।

বৈঠকের লোকেরা হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, মুখে বাক্যস্ফূরণ হইল না। পুলিসের লোকেরা বৈঠকের সব লোকগুলিকে বেষ্টন করিয়া থানায় লইয়া গেল।

ঠাণ্ডাগারদের বিষাক্ত ঔষধের জোরে বন্দীগণের বিকার কাটিল; দলের সমস্ত লোকের নাম বলিয়া দিল, আসামীরা অপরাধ স্বীকার করিল। সমস্ত লোকের হাতে হাতকড়ি পড়িল।

এইখানে বলিয়া রাখা উচিত, সেই টেলিগ্রাফের পেয়াদাই আধঘণ্টার মধ্যে নূতন মূর্ত্তিতে পুলিসের জমাদার হইয়াছিল। আট রাত্রি পূর্ব্বে ভবশঙ্করের বাড়ীতে যে সন্ন্যাসী অতিথি হইয়াছিলেন, তিনিই টেলিগ্রাফের পেয়াদা, তিনিই পুলিসের জমাদার।

থানাতেও সেই জমাদারটি সেই বেশে সেই রকম জমাদার। থানার দারোগাকে নিকটে রাখিয়া জমাদার সাহেব ভবশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খতগুলি জাল করিয়াছিল কে? কাহার হাতের লেখা? কাহার হতের দস্তখত?"

ভবশঙ্কর কথা কহিলেন না। আবার দস্তুর মত ঔষধ প্রয়োগ করা হইল; অসহ্য যাতনায় ভবশঙ্কর তখন বলিয়া ফেলিলেন, "জটাধারী বিশ্বাস।"

পুলিসেরও জানা ছিল, জটাধারী লোকটা হস্তকন্মে; কিন্তু

চালাকীর জোরে জটাধারী বারবার এড়াইয়া এড়াইয়া ফাঁকে ফাঁকে বেড়াইতেছিল, একবারও ধরা পড়ে নাই; বারবার এইবার!

রাত্রের মত বিশ্রাম। পরদিন রবিবার,—সে দিনও বিশ্রাম। সোমবার আসামীরা চালান হইল. বিধুভূষণ বাবুর সঙ্গে সূর্য্যকান্ত-বাবু ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে উপস্থিত হইয়া আগাগোড়া এজেহার দিলেন;—যাহারা গোয়েন্দা হইয়াছিল, তাহারা হাজির হইয়া ঠিক ঠিক জবানবন্দী দিল; আসামীরাও সমস্ত অপরাধ কবুল করিল।

মোকদ্দমা দায়রায় গেল। আসামী বারোজন। জজের বিচারে জটাধারী ব্যতীত এগারজনের দশ দশ বৎসর সশ্রম কারাবাস; জটাধারীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

অষ্টম কল্প।

ধর্ম্মের জয়।

আসামীরা সাজা পাইয়া গেল। জালখতে যাহারা মহাজন হইয়াছিল, সেই সকল খতে যাহারা সাক্ষী হইয়াছিল, তাহারাই গোয়েন্দা; তাহারাই সূর্য্যকান্তবাবুকে চক্রান্তের গোড়ায় খবর জানাইয়া দিয়াছিল, সুতরাং বাবু তাহাদিগকে আসামী করেন নাই। যাহারা মহাজন হইয়াছিল, তাহারা বলিয়াছে, ডিক্রী-জারী সূত্রে যত টাকা আদায় হইয়াছে, তাহা সমস্তই ভবশঙ্কর, উমানাথ, জটাধারী এই তিনজনে ভাগ করিয়া লইয়াছিল; মহাজনেরা কেবল নাম মাত্র মহাজন; দলপতিদের অনুগ্রহ-পাত্র হইয়া এক একজনে পঞ্চাশ টাকা করিয়া পুরস্কার পাইয়াছে মাত্র।

জজসাহেবের হুকুমে ঐ তিনজন প্রধান আসামীর ঘর বাড়ী সম্পত্তি-বিক্রীত হইয়া যত টাকা উঠিল, সূর্য্যকান্তবাবু জালখতের ডিক্রীর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সেই সমস্ত টাকা প্রাপ্ত হইলেন; নীলামে যাহারা অল্প মূল্যে জমিদারী কিনিয়াছিল, সেই মূল্য গ্রহণ করিয়া তাহারা সূর্য্যকান্তবাবুর নামে সেই সকল জমিদারী কোবালা লিখিয়া দিল, জমিদারী খালাস হইল।

পূর্ব্ব নীলামে যে সকল জমী তিনি কিনিয়া রাখিতে পারেন নাই, অন্য লোকে ডাকিয়া লইয়াছিল, যাদু বাছা বলিয়া, মিষ্ট বচনে তুষ্ট করিয়া, এই সময় সেই সকল খরিদ্দারকে মূল্য দিয়া,

সেগুলিও তিনি উদ্ধার করিয়া লইলেন। চন্দ্রকান্তের অংশ সমস্তই বিকাইয়া গিয়াছিল, সে সকল খরিদ্দারকেও যথোচিত মূল্য দিয়া, সে অংশটিও তিনি হস্তগত করিয়া রাখিলেন; চন্দ্রকান্তের দেনায় কলিকাতার বাড়ী নীলাম হইয়াছিল, সূর্য্যকান্ত বাবু সেখানি খালাস করিতে পারিলেন না; পরিলেন না কিম্বা ইচ্ছা করিয়াই অবহেলা করিলেন, তাহা আমরা জানি না।

ধর্ম্মের সংসার পুনর্ব্বার উজ্জ্বল হইল। পতিব্রতা রাধারাণীর আশীর্ব্বাদ ফলিল। জমীদারীগুলিতে নূতন বন্দোবস্ত। পুরাতন আমলারা পূর্ব্বেই বিদায় হইয়াছিল, পৃথক পৃথক কাছারীতে যাহাদের নূতন নিয়োগ, লাটের কিস্তি বাকী ফেলিয়া জমীদারী নীলাম করাইয়া, তাহারা বেমালুম পলাইয়া গিয়াছিল; বাবু এক্ষণে ভাল ভাল বিশ্বাসী লোক দেখিয়া, পাকা পাকা জামিন লইয়া উপযুক্ত উপযুক্ত নূতন নূতন নায়েব গোমস্তা নিযুক্ত করিলেন।

একমাস গত হইল। এই সময় চন্দ্রকান্ত বাবুকে খালাস করিবার চেষ্টা। চন্দ্রকান্ত যখন কয়েদ হন, সূর্য্যকান্তের তখন অর্থের অত্যন্ত অনাটন, সেই জন্য দেওয়ানী জেলে ভাইকে দেখিতে গিয়া তিনি কেবল কাঁদিয়া আসিয়াছিলেন, কোন প্রকার উপায় করিতে পারেন নাই; এই সময় অবস্থা স্বচ্ছল হওয়াতে তিনি একটি শুভদিন দেখিয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। প্রথম দর্শন কারাগারে। যাহার ডিক্রীজারিতে চন্দ্রকান্ত প্রথম কয়েদ, তাহার সমস্ত টাকা শোধ করিয়া দিয়া, ভাইকে তিনি খালাস করিয়া আনিলেন, তালতলার একজন বন্ধুর বাড়ীতে কয়েক দিনের জন্য বাসা লইলেন; হাণ্ডনোটের

যে কয়েকজন মহাজন ছিল, তাহাদের সকলের টাকাই শোধ করা হইল; তাহার পর ভিন্ন ভিন্ন দোকানদার ও বরখাস্ত চাকর-চাকরাণীগণের পাওনা টাকা শোধ করা হইল;—সর্ব্ব প্রকারে নিরাপদ,—নির্ঝঞ্ঝট। অতঃপর বাড়ী যাইবার উদ্‌যোগ। সূর্য্যকান্ত সেই অবসরে চন্দ্রকান্তকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ডাকিয়াছিলেন, বাড়ীর চাকর আসিয়া বলিয়া দিল, "বৈকালে তিনি বেড়াতে গিয়েছেন, সন্ধ্যার পর আস্‌বেন।"

সন্ধ্যার পর চন্দ্রকান্ত আসিলেন, দাদার কাছে গিয়া বসিলেন, "না বলিয়া বাহির হইয়াছিলে কেন" দাদা সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মনে মনে রচনা করিয়া চন্দ্রকান্ত একটা আল্‌গা আল্‌গা উত্তর দিলেন। বাড়ী যাইবার সমস্ত আয়োজন হইয়াছিল, পরদিন নক্ষত্রদোষ, যাত্রা নাস্তি, সুতরাং তৃতীয় দিবসে যাত্রা করাই স্থির। তখনকার আবশ্যকমত কথোপকথনের পর বড়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বউ-মা কোথায়?"

চন্দ্রকান্তের মাথা ঘুরিল। বুদ্ধি ছিল, তৎক্ষণাৎ উপস্থিত বুদ্ধি যোগাইল, পূর্ব্বাপর না ভাবিয়া তিনি একটা মিথ্যা কথা বলিলেন। মিথ্যা না বলিলে তখন আর অন্য উপায় ছিল না, সেই কারণেই মিথ্যাকথা। চন্দ্রকান্ত বলিলেন, "পাওনাদারেরা বেজায় তাগাদা করিতে আরম্ভ করিল, বাড়ীখানি নীলাম হইল; কোথায় রাখি, ভাবিয়া চিন্তিয়া একজন জানা-শুনা লোক সঙ্গে দিয়া তাহাকে তাহার বাপের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছি।"

দাদার প্রশ্নে ত এই উত্তর দেওয়া হইল, কিন্তু আসল কথাটা কি?—বৈকালে চন্দ্রকান্ত বেড়াইতে গিয়াছিলেন; বেড়াইতে যাওয়া নয়, সেই খোলার বাড়ীর তত্ত্বে বাহির হওয়া। তিনি

দেখিয়া আসিলেন, সে বাড়ীতে অন্য ভাড়াটিয়া রহিয়াছে; পাড়ার লোকের মুখে শুনিয়া আসিলেন, সর্ব্বনাশ। দাদাকে সে কথা বলিতে পারিলেন না, কাজে কাজেই মিথ্যাকথা।

তৃতীয় দিবসে উভয় ভ্রাতা হলধরপুরে যাত্রা করিলেন। তাহারা বাড়ীতে পৌছিলে মঙ্গলাচরণ হইল। সেখানেও আবার সেই কথা। বড় বধূ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোট বউ আসিল না?"

ভ্রাতার মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন, বড়বাবু সত্য তত্ত্ব না জানিয়াও তাহাই বলিলেন। উত্তর শুনিয়া বড় বউ-মা চুপ করিয়া রহিলেন; তাঁহার মন কিন্তু চঞ্চল হইল।

দাদার মুখে সংসারের অবস্থা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া চন্দ্রকান্ত পরম সন্তুষ্ট। সন্তোষ অবশ্যই আসিয়াছিল, তথাপি কিন্তু অন্তরে অন্তরে বিষাদ—অন্তরে অন্তরে অনুতাপ। স্ত্রীটী কোথায় গেল, তাহা স্মরণ করিয়াই বিষাদ,—তাদৃশ ভ্রাতৃবৎসল সহোদরকে ত্যাগ করিয়া, কলিকাতায় গিয়া কুসঙ্গে মিশিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়াই অনুতাপ।

দুইমাস অতিবাহিত। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রাধারাণী দেবী কন্যা জামাতা সঙ্গে লইয়া হলধরপুরে আসিলেন, নিজ বাড়ীতেই বাস করিলেন। সারদার পুত্রের পরে দুর্দ্দিন অপগত হইয়া সুদিনের উদয়, সেই বিশ্বাসে পুত্রটির আদর বাড়িল।

কর্ত্তার পিসী, নিজের পিসী, আর তাঁহাদের পরিবারেরা যেখানে যেখানে আশ্রয় লইয়াছিলেন, পত্র দ্বারা সূর্য্যকান্তবাবু তাহা জানিয়া রাখিতে ভুলিয়া যান নাই, এই সময় তিনি স্বয়ং সেই সেই স্থানে গিয়া তাঁহাদিগকে বাটীতে লইয়া আসিলেন।

সংসার পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ পরিপূর্ণ হইল। আকাশ হইতে যেন জয়ধ্বনি আসিল, "ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়।"

চন্দ্রকান্ত যেন সর্ব্বদাই বিষণ্ণ, সর্ব্বদাই অস্থির। দাদার কাছে যতক্ষণ থাকেন, ততক্ষণ হাসি-খুসি দেখান, একাকী হইলেই দুর্ভাবনা-রাক্ষসী তাঁহার মনের সর্ব্বশান্তি গ্রাস করিয়া ফেলে।

চারিমাস বাড়ীতে থাকিয়া, একটা বিশেষ কার্য্যের ছল করিয়া, দাদার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক চন্দ্রকান্তবাবু কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। শীঘ্রই ফিরিবেন, এইরূপ অঙ্গীকার রহিল।

কলিকাতায় আসিয়া তিনি কোথায় থাকিবেন চিন্তা করিলেন, জেলখানা হইতে বাহির করিয়া আনিয়া দাদা তাঁহাকে যে বন্ধুর বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন, সেই বাড়ীতেই উপস্থিত হইলেন; সেখানে তাঁহার যথেষ্ট সমাদর হইল।

সমাদর লাভের আশায় এবারে চন্দ্রকান্তের কলিকাতায় আসা নয় উদ্দেশ্য অন্য প্রকার। পাঁচদিন রহিলেন; প্রতিদিন সেই খোলার বাড়ীর পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীগুলির গৃহস্থগণকে মনের কথা জিজ্ঞাসা করেন, ঠিক এক রকম উত্তর পান; সে সকল উত্তরে কোন সন্ধান পাইবার সম্ভাবনা থাকে না। কিরূপে কোথায় সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাই তিনি সর্ব্বদা ভাবেন। একরাত্রে নির্জ্জন গৃহে শয়ন করিয়া তিনি নানাখানা ভাবিতেছিলেন, হঠাৎ একটা পূর্ব্বকথা মনে পড়িল। জটাধারী তাঁহাকে একদিন বলিয়াছিল, তাহার পুত্রকে গৌহাটী হইতে আনাইয়াছে, সেই পুত্র শৈশবাবধি গৌহাটীতে থাকিয়াই লেখাপড়া শিখিয়াছিল। সেই কথা স্মরণ হওয়াতে চন্দ্রকান্ত স্থির করিলেন, শালা তবে গৌহাটীতে গিয়াছে। সত্য সত্য সেখানে গিয়াছে কি না,

তাহাও জানিবার চেষ্টা করিলেন। জটাধারীর একজন আলাপী লোক জানবাজারে থাকিত; তিনি একদিন তাহার বাসায় গিয়া, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাহাকে বলিলেন, "জটাধারীর পুত্র প্রাণনাথ আমার কাছে মুহুরীগিরী করিত, তুমি তাহাকে দেখিয়াছ? শুনিতেছি, সে না কি এখন গৌহাটীতে গিয়াছে। তুমি তাহার পিতৃবন্ধু, তুমি তাহাকে একখানা পত্র লেখ; খুব আত্মীয়তা জানাইয়া, কেমন আছে, কি করিতেছে, কলিকাতায় আসিতে ইচ্ছা আছে কি না, এই সকল কথা লিখিয়া দাও; পত্র পাইবামাত্র যেন উত্তর লিখিয়া পাঠায়, বিশেষ করিয়া এইরূপ অনুরোধ কর। আহা! গরিব—তার উপর আমার দয়া হয়। সে যদি এখানে আইসে, আবার আমি তাহাকে মুহুরীগিরীতে নিযুক্ত করি। পত্রে কিন্তু তুমি আমার নামের ছন্দাংশও লিখিও না, স্রেফ্ কেবল সাদাকথা লিখিয়া দাও। এখনি লেখ, আমার সাক্ষাতেই লেখ; আমি হয় ত আরো দুই একটা কথা বলিয়া দিতে পারিব। লেখ,—আমার হাতেই দাও, আমি নিজেই ডাকঘরে দিয়া আসিব।"

লোকটী বলিল, "পত্র লিখিতে হইবে না। গৌহাটীতেই গিয়াছে। আজ দশদিন হইল, সে আমাকে একখানা পত্র লিখিয়াছে। ভাল আছে, কোন কষ্ট নাই, সেখানকার ডাকঘরে চাকরী করিতেছে।"

চন্দ্রকান্তের বদন গম্ভীর হইল। সে কথা চাপা দিয়া তিনি অন্য পাঁচ রকম কথা তুলিলেন; বলিলেন, "অবস্থা স্বচ্ছল হইয়াছে, সমস্ত দেনা পরিশোধ হইয়াছে, দাদার সহিত মিলন হইয়াছে, আমি এখন দেশের বাড়ীতেই বাস করিতেছি।"

লোকটী সন্তোষ প্রকাশ করিল। চন্দ্রকান্ত আর বেশীক্ষণ সেখানে রহিলেন না, আত্মীয়তা করিয়া শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া আসিলেন। বেলা এগারোটা।

সেই দিন বৈকালে দাদাকে তিনি এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিলেন :—

"কার্য্যগতিকে এখানে আমার প্রায় একমাস বিলম্ব হইবে। তালতলার বাজারেই আমি আছি। আপনার সেই বন্ধুটী আমাকে বিলক্ষণ আদর-যত্ন করিতেছেন। চিন্তা করিবেন না।"

পত্রখানি ডাকে রওনা করিয়া দিয়া, চন্দ্রকান্ত একজন উকিলের বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে কেবল কুকাজে কুসংসর্গেই তিনি কাল কাটান নাই, দুটি পাঁচটি ভদ্রলোকের সঙ্গেও আলাপ করিয়াছিলেন। যাঁহার কাছে গেলেন, সেই উকিলটীও তাঁহার আলাপী। মূল কথা গোপন রাখিয়া উকিলকে তিনি কেবল প্রাণনাথের পলায়নের কথা বলিলেন; বিশেষ করিয়া বলিলেন, "লোকটা আমার মুহুরী ছিল, আমার অনুপস্থিতিকালে নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় আট হাজার টাকা চুরি করিয়া পলাইয়া গিয়াছে; কোথায় আছে, তাহারও সন্ধান আমি পাইয়াছি। এখন কি করা কর্ত্তব্য?"

উকিল বলিলেন, "নালিশ করুন; কল্য সোমবার, কল্যই নালিশ করুন। বড় শক্ত মোকদ্দমা;—দরখাস্ত শুনানী হইবামাত্র ওয়ারীণ বাহির হইবে। চাকর চোর,—চাকর পলাতক, চাকর বিশ্বাসঘাতক; এ মোকদ্দমার খাড়া খাড়া ওয়ারীণ জারী;—কল্যই আপনি নালীশ করুন।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, "মোকদ্দমার ফেরফার কিছুই আমি

বুঝি না, আপনি যদি দয়া করিয়া এই তারটা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমার বিশেষ উপকার হয়। আসামীটা সাজা পাইলে আমি আপনাকে সাধ্যমত পুরস্কার দিব।”

উকিল সম্মত হইলেন, চন্দ্রকান্তবাবু বিদায় হইয়া আসিলেন। পরদিন কলিকাতা পুলিসে দরখাস্ত হইল, ওয়ারীণ বাহির হইয়া গেল।

যে ভেড়াটা আতপ চাউলের আস্বাদন পায়, সে ভেড়া শীঘ্র তাহা ভুলিতে পারে না। চন্দ্রকান্তবাবু উত্তম শিক্ষা পাইয়াও ডাইমনকুমারীকে ভুলিতে পারেন নাই। একদিন সন্ধ্যাকালে তিনি ভজহরি ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, সদর দরজায় চাবি বন্ধ। পাশের একখানি বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া একটি লোককে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “অমুক নম্বর বাড়ীতে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা কোথায় গিয়াছেন?”

গৃহস্থ-পল্লীর মধ্যে একঘর ব্রহ্মজ্ঞানী থাকিয়া সর্ব্বদা সমাজ-বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে, নানা রকম অনাচার করিলে, তাহার উপর সকলের ঘৃণা হয়, আক্রোশ হয়, কোপও হয়। চন্দ্রকান্তের প্রশ্ন শুনিয়া লোকটী বলিল, “তারা পালিয়েছে। ভট্টাচার্য্যের সেই ধুব্‌ড়ো ধেড়ে মেয়েটা গ্রাবিন হয়েছিল, তাকে নিয়ে গুষ্টি-সুদ্ধ একেবারে উধাও হয়ে গে'ছে।” চন্দ্রকান্তের ডাইমন লাভের আশা ফুরাইল, নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বাসার দিকে ফিরিলেন।

উপযুক্ত সময়ে কুড়ুনীনন্দন প্রাণনাথ বিশ্বাস গৌহাটী হইতে গ্রেপ্তার হইয়া আসিল, পুলিসে গহনা চুরি স্বীকার করিল, একটী স্ত্রীলোকের নাম করিবার উপক্রম করিতেছিল. উকিল তাহাকে ধমক দিয়া থামাইয়া দিলেন। মোকদ্দমা

সেসনে গেল। চাকর থাকিয়া বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক মনিবের সম্পত্তি চুরি করিয়া পলায়নের অপরাধে প্রাণনাথের সাত বৎসর করাবাস দণ্ডাজ্ঞা।

কারাগারে লইয়া যাইবার সময় উকিল তাহাকে জনান্তিকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "পলায়নের সময় যে স্ত্রীলোক তোর সঙ্গে ছিল, সে স্ত্রীলোক কোথায়?" মুখ বাঁকাইয়া কয়েদী বলিয়াছিল, "বিষ খেয়ে অক্কা পেয়েছে।"

শত্রুকে কারাগারে পাঠাইয়া চন্দ্রকান্তবাবু হলধরপুরে ফিরিয়া গেলেন। হঠাৎ কলিকাতায় কি কাজ পড়িয়াছিল, দাদা সে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, তাঁহাকেও কৈফিয়ৎ দিতে হইল না। দুই তিন সপ্তাহ গৃহবাস করিয়া চন্দ্রকান্ত কতক পরিমাণে নিশ্চিন্ত হইলেন। রাধারাণী দেবী তাঁহার দুর্দ্দশার কথা শুনিয়াছিলেন, একদিন তাঁহাকে বিরলে পাইয়া, বুঝাইয়া বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, "আর তুমি সহরে যেও না। আমি শুনেছি, পাড়াগাঁয়ের উচক্কা ছেলেরা সহরে গেলেই খারাপ হয়। কেন তুমি সহরে গিয়েছিলে? স্বভাব বিগ্‌ড়ে গিয়েছিল, পুঞ্জ পুঞ্জ দেনা দাঁড়িয়েছিল, জেলখানায় বাস কত্তে হয়েছিল, লাঞ্ছনার আর বাকি ছিল না; কি কত্তে সহরে গিয়েছিলে? অমন দাদা, শিবতুল্য দাদা, সে দাদার অবাধ্য হওয়া কি তোমার ভাল হয়েছিল?—আর তুমি সহরে যেও না। বিষয়-কর্ম্মের খাতিরে যদি কখন যেতে হয়, তিন রাত্রের বেশী বাস কোরো না। পাপ-সহরের নামে আমার গায়ে কাঁটা দেয়। পৃথিবীতে যত রকম পাপ আছে, সব রকম পাপ কলিকাতা সহরে মূর্ত্তিমান। যাই নি আমি কখনো, কিন্তু ঘরে

বসে বসে সব শুন্‌তে পাই। সাবধান, সাবধান! মেয়েমানুষ বোলে আমার কথায় অবহেলা কোরো না; বউমাকে বাড়ীতে এনে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরসংসার করো।"

মাথা হেঁট করিয়া চন্দ্রকান্ত সব কথা শুনিলেন, একটিও উত্তর করিলেন না; নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, অবশেষে বলিলেন, "বেশী দরকার না হলে আর আমি কলিকাতায় যাব না।"

চন্দ্রকান্ত সে গৃহ হইতে বাহির হইলেন, রাধারাণী অন্য কাজে মন দিলেন। সন্ধ্যা হইয়াছিল; সন্ধ্যাকালের কাজগুলি সুসম্পন্ন করিয়া, আবার তিনি চন্দ্রকান্তকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, চন্দ্রকান্ত আবার অন্দরমহলে প্রবেশ করিলেন। সারদার মুখে সারদার জননী তাঁহাকে মহাভারত শুনাইলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরের দ্বৈত্যবনে অবস্থানের সময় ধৌম্যপুরোহিত যে সকল সদুপদেশ দিয়াছিলেন, যে সকল দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়া পঞ্চ পাণ্ডবকে সেই কষ্টের সময় সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিলেন, বনপর্ব্বের সেই সকল কাহিনী বাছিয়া বাছিয়া সারদাসুন্দরী একমনে ধীরে ধীরে পাঠ করিল। চন্দ্রকান্ত ক্ষুন্নমনে সারদাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তথা হইতে উঠিয়া গেলেন।

আরো পাঁচদিন অতীত হইল। একদিন মধ্যাহ্নভোজনের সময় সূর্য্যকান্তবাবু ভ্রাতাকে বলিলেন, "আর কেন ভাই বিলম্ব কর, বউমাকে আন্‌তে লোক পাঠাও;—যদি পার, নিজেই একবার যাও, নিজেই সঙ্গে কোরে নিয়ে এসো।"

চন্দ্রকান্ত কথা কহিলেন না। সেই দিন বৈকালে দুই সহোদরে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া পাঁচ রকম গল্প করিতেছিলেন, সেই অবসরে পূর্ব্ব কথা তুলিয়া সূর্য্যকান্তবাবু বলিলেন, "কবে

যাওয়া স্থির কোল্লে? দেরি কোরো না; নিজে যাওয়াই ভাল; নিজে গিয়েই শীঘ্র শীঘ্র বউমাকে নিয়ে এসো।"

সে রকম প্রশ্নের কি রকম উত্তর দিতে হইবে, বুদ্ধিমান চন্দ্রকান্ত সেটা পূর্ব্ব হইতেই রচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন; একটু ম্লানবদনে বলিলেন, "কারে আর আন্‌বো? সে দফা সাঙ্গ। যে লোকের সঙ্গে তাকে বাপের বাড়ীতে পাঠিয়েছিলেম্, এইবার কলিকাতায় গিয়ে সেই লোকের সঙ্গে দেখা করি, সে বোল্লে রেলগাড়ী থেকে নেমে নৌকা ভাড়া কোরেছিল, জলপথে অনেকটা দূর যেতে হয় কি না,—নোকা কোরেই নিয়ে যাচ্ছিল, খানিকদূর গিয়ে একখানা বড় নৌকার ধাক্কা লেগে নৌকাখানা ডুবে যায়; দাঁড়ী-মাঝীরা সাঁতার দিয়ে উঠেছে, সে নিজেও হাবুডুবু খেয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে এসেছে, যাকে দরকার, তাকে তল্লাস কোরে পায় নাই; অগাধ জবে ডুবে মরেছে।"

নারায়ণ স্মরণ করিয়া সূর্য্যকান্তবাবু হায় হায় করিতে লাগি-গেল, দুঃখের সমাচার বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন, হায় হায় করিয়া সকলেই কাঁদিয়া উঠিলেন।

একবৎসর পরে হুগলি জেলার একজন ধনবান উকিলের কন্যার সহিত চন্দ্রকান্তের দ্বিতীয়বার বিবাহ হইল, সংসারে আর নূতন কোন প্রকার বিষাদের কারণ রহিল না।

বাড়ীখানি একতালা ছিল, দোতালা হইল; চণ্ডীমণ্ডপের বনিয়াদের উপর পাকা দালান নির্ম্মিত হইল; সদর বাড়ীতে মাটির প্রাচীর ছিল, পাকা প্রাচীর উঠিল; প্রাচীরের পূর্ব্বদিকে দুটি বড় বড় বৈঠকখানা নির্ম্মাণ করান হইল; তখন যেন যথার্থ বড় মানুষের বাড়ীর মত দেখাইতে লাগিল। হরকান্ত-

বাবুর কেবল ধর্ম্মকর্ম্মের দিকে মন ছিল, লোকজনকে ভোজন করাইবার জন্য বিশেষ যত্ন ছিল, ঘরবাড়ীর বাহ্য আড়ম্বরে তাঁহারা আদৌ মনোযোগ ছিল না; সেই কারণেই তিনি ভাল রকম বাড়ীঘর নির্ম্মাণে সর্ব্বদাই ঔদাস্য করিতেন; টাকা জমাইবার দিকেও তাঁহার নজর ছিল না; কেবল "দীয়তাং ভোজ্যতাং" মন্ত্রে তিনি দীক্ষিত ছিলেন।

যে বৎসর নূতন দালান নির্ম্মাণ সমাপ্ত হয়, রাধারাণীর অনুরোধে সূর্য্যকান্তবাবু সেই বৎসর খুব ঘটা করিয়া দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। গ্রামের সমস্ত লোক আসিয়া সেই দুর্গোৎসবে মহা উৎসাহ দেখাইয়াছিল। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল লোক সেই ধর্ম্মের সংসারের হিংসা করিত, ভবশঙ্করাদি মাতব্বর লোকের পরিণাম দেখিয়া তাহারা আর সূর্য্যকান্তের সৌভাগ্যে প্রকাশ্যরূপে একটুও হিংসা দেখাইত না; সকলেই সূর্য্যকান্তের একান্ত অনুগত বাধ্য হইয়াছিল।

বৎসর ক্রমশই অগ্রসর হইতে লাগিল, চন্দ্রকান্তের একটি পুত্রসন্তান জন্মিল, বড়বাবুও আরো দুটি পুত্রকন্যার জনক হইলেন; সারদারও একটী কন্যারত্ন জন্মগ্রহণ করিল। শচীন্দ্রশেখরের চাকরী করা বন্ধ হইল। হরধরপুর হইতে কৃষ্ণনগর অনেক দূর;--দুই হপ্তা অন্তর বাড়ী আসিবারও অসুবিধা, মাসে মাসে আসাও কষ্টকর; অতএব সূর্য্যকান্তবাবু তাঁহাকে চাকরী হইতে ছাড়াইয়া লইলেন, দিব্য সুখভোগে রাখিলেন, ঠিক যেন সহোদরের মত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। শচীন্দ্রও জমীদারীর কাজকর্ম্ম দেখিতে থাকিলেন।

নবম কল্প।

সারদার নূতন ব্রত।

সেই সময় সারদার একটী নূতন চিন্তা উপস্থিত। সারদা ভাবিল, মোহনপুরে বাইশ ঘর গরিবের একরকম ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, হলধরপুরেও গরিব লোক কম নয়;—সকলকে সাহায্য করা সুসাধ্য হইবে না, তথাপি এখানেও সেই রকম একটা কিছু ব্যবস্থা করা উচিত; অভাবপক্ষে ঘর কুড়িক গরিবকে কিছু কিছু সাহায্য করিতে হইবে। করিতে ত হইবে, কিন্তু ব্যবস্থা করে কে? এখানে ত আর গদাই দাদা নাই, কাহার দ্বারা সঙ্গোপনে সে কার্য্য সাধন করা হয়, সারদা কিয়ৎক্ষণ তাহাই ভাবিল; ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল, এখানেও একটি গদাই দাদা চাই।

গ্রাম তখন সুস্থির;—সারদার ঠাকুরদাদা সম্পর্কের আট দশটি বৃদ্ধ লোক গ্রামের সেই পাড়ার মধ্যেই ছিল; প্রায় নিত্যই সেই সকল ঠাকুরদাদার সঙ্গে সারদার দেখাসাক্ষাৎ হইত;—বেশ ঘনিষ্টতা জন্মিয়াছিল; ঠাকুরদাদাদের মধ্যে যেটির উপর সারদার কিছু বেশী শ্রদ্ধা, সেইটিকেই উকিলের পদে বরণ করিতে সারদার ইচ্ছা হইল;—যেদিনের ভাবনা, সেই দিন বৈকালেই সারদা একটি ছেলে কোলে করিয়া ঠাকুরদাদার বাড়ীতে চলিয়া গেল। ঠাকুরদাদার নাম মোহনলাল চট্টোপাধ্যায়।

মোহনলালের বাড়ীতে গিয়া, বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে পাঁচ রকম কথাবার্ত্তা কহিয়া, সারদাসুন্দরী শেষকালে কর্ত্তার শয়ন-ঘরে প্রবেশ করিল। কর্ত্তা তখন সবে বৈকালিক নিদ্রাভঙ্গে হস্ত মুখ প্রক্ষালনার্থ গাড়ু হাতে করিয়া বাহির হইতে-ছিলেন, সারদাকে সম্মুখে দেখিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বাঃ! কি সৌভাগ্য! বোসো দিদি, আস্‌ছি।"

সারদা বসিয়া রহিল, মোহনলাল শুচি হইয়া আসিলেন; গাড়ুর মুখে গামছাখানি পাট করিয়া রাখিয়া একখানি তক্তা-পোষের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া, একটু হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন, "মেঘ চাইতেই জল! ঘুম থেকে উঠে এইমাত্র আমি মনে কচ্ছিলেম, সারদা যদি আসে, বস্তাখানেক ধর্ম্মকথা শুনে ফেলি। তবে দিদি অসময়ে কি মনে কোরে?"

হাসিয়া সারদা বলিল, "তোমার অসময় হতে পারে, আমার কিন্তু এই সময়টাই সুসময়। তুমি বল্লে, এইমাত্র আমাকে তুমি মনে কচ্ছিলে; ভালবাসলেই মনে কোত্তে হয়। তা যা হোক্ দাদা, আজ আমি বেশীক্ষণ বস্‌তে পাচ্চি না, এখুনি যেতে হবে;—আজ আমি তোমাকে একটা ছোট রকম নিমন্ত্রণ কোত্তে এসেছি; সাধ হয়েছে, তোমায় কিছু জল খাওয়াব। নিবেদন করি, কাল বিকেল বেলা,—ঠিক এম্নি সময়, দুঃখিনীর কুটীরে আপনি একবার পদধূলি দিবেন।"

হাস্য করিয়া মোহনলাল বলিলেন, "যে আজ্ঞা। তোমার এই ঠাকুরদাদাটি রোজ রোজ ঐ রকম নিমন্ত্রণ চান!"

"আশীর্ব্বাদ করুন, তাই-ই হবে। আচ্ছা, তবে এখন আমি আসি।" এই বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ছেলের মুখে চুম্ব দিতে

দিতে, সারদাসুন্দরী সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল; মেয়েদের কাছে বিদায় লইয়া স্ব গৃহে প্রতিগমন করিল।

পরদিন ঠিক বৈকালে—যথাসময়ে বৃদ্ধ মোহনলাল সূর্য্য-কান্তবাবুর বাড়ীতে হাজির। সরাসর অন্দরে,—সরাসর সারদার ঘরে।—ঘরেই সারদা ছিল,আদর করিয়া ঠাকুরদাদাকে বসাইল, আপনিও তাঁহার একটু গা ঘেঁসিয়া বসিল। ঠাকুরদাদা প্রথমেই রসিকতা জুড়িলেন, হাসিয়া হাসিয়া সারদাও তাঁহার মুখের মত উত্তর দিল; তৎপরে ঠাকুরদাদার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া, পূর্ব্ববৎ হাসিতে হাসিতে চুপি চুপি বলিল, "এই দেখ দাদা, আমি ব্যাকরণ জানি কি না? আজ আমি তোমার একটি অভিনব নামকরণ করিব।"

মোহন। (হাসিয়া) আজ আমার অন্নপ্রাশন না কি? বলুন ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়, কি রকম নামকরণ?

সারদা। উত্তম নামকরণ। মামার বাড়ীর গাঁয়ে আমার একটি গদাই দাদা আছেন, তোমার চেহারাখানি ঠিক তাঁরি মতন, তাঁরে আমি বড় ভালবাসি, তোমার উপরেও আমার সেই রকম ভালবাসা; বুঝ্‌লে কি না? সেই জন্যে স্থির কোরেছি, আজ অবধি তোমারও নূতন নাম রাখ্‌বো—গদাই দাদা।

মোহন। গদাই নাম না রেখে যদি তুমি আমাকে জটাই বোলেও ডাক, তাও আমার পক্ষে মিষ্ট মিষ্ট মিষ্ট—মধুর মধুর মধুর—স্বর্গের অপ্সরাগীতের মতন সুধাময় জ্ঞান হইবে।

সারদা। জান কি ঠাকুরদ্দা, সব সময় আমি তোমাকে গদাইদাদা বোল্‌বো না। সেখানকার গদাইদাদা আমার জন্যে

যেমন একটি কাজ করেছেন, তুমি যখন যখন সেই রকম কাজ কোর্‌বে, কেবল তখন তখন আমি তোমাকে গদাইদাদা বোল্‌বো; বাকী সব সময়ে তুমি আমার যে ঠাকুরদ্দা, সেই ঠাকুরদ্দা।

মোহন। সেখানকার গদাই তোমার কি রকম কাজ কোরেছেন?

সারদা তখন চুপি চুপি সমস্ত মনের কথা খুলিয়া বলিল; শেষকালে বলিল, "কিন্তু ঠাকুরদ্দা, কাজটা তুমি কাহারো কাছে প্রকাশ কোরো না;—গুহ্য—গুহ্য—অতি গুহ্য!"

মোহনলাল বিস্ময়াপন্ন। মনে মনে তিনি সারদার সদ্‌-গুণের বহুৎ বহুৎ তারিফ করিলেন; কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া আনন্দভরে কহিলেন, "এত বড় মহৎ কার্য্যের ভার আমি গ্রহণ কল্লেম, এটাও আমার ভাগ্যের কথা। প্রকাশ কোত্তে বারণ কোচ্ছো, প্রকাশ হবে না; নিশ্চিন্ত থেকো, আমার মুখে কদাচ এ কথা প্রকাশ পাবে না। উৎকৃষ্ট কার্য্য। গোপনে দান করাই সাত্ত্বিক দান।"

নূতন গদাই দাদাকে প্রণাম করিয়া, সারদাসুন্দরী তাঁহার জলযোগের আয়োজন করিল। উত্তম উত্তম উপাদেয় সামগ্রী আহরণ করা হইয়াছিল, ঠাকুরদাদা মহাশয় উদর পূরিয়া ভক্ষণ করিলেন, পরিতৃপ্ত হইয়া সারদাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, উপদেশমত কার্য্য করিয়া কল্য আবার সাক্ষাৎ করিবেন স্বীকার করিয়া চলিয়া গেলেন।

উপদেশমত কার্য্য হইল। পরদিন বৈকালে ঠাকুরদাদা আসিয়া সারদাকে সেই কার্য্যের সমাচার দিলেন, ফর্দ্দ দেখাইয়া

বলিলেন, "আটাশ ঘর।—তার মধ্যে ছাব্বিশ ঘরকে দু-টাকার হিসাবে দিলেই চল্‌বে, বাকী দু-ঘর বড় গরিব, সেই দু-ঘরকে আটটি টাকা দিলেই ভাল হয়।"

মনে মনে হিসাব করিয়া সারদা তৎক্ষণাৎ বাক্স খুলিয়া, ছয়-খানি দশটাকার নোট বাহির করিয়া, ঠাকুরদাদার হস্তে দিল; নোটগুলি হস্তে লইয়া,ঠাকুরদাদা হাঁ করিয়া, খানিকক্ষণ সারদার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। সারদা বলিল, "আমার মুখপানে চেয়ে থাক্‌লে পুণ্য হবে না, যাদের মুখপানে চাইলে পুণ্য হয়, তাদেরি মুখপানে চেও। মাসে মাসে আমি তোমাকে ষাট টাকা কোরে দিব, গোপনে গোপনে তুমি গিয়ে তাদের সব বেঁটে-চেটে দিও;—মনে কোরে রেখো, তুমি যেন নিজেই দান কোচ্চো।"

আর অল্পক্ষণ ধর্ম্মকথার আলোচনা করিয়া মোহনলাল বিদায় গ্রহণ করিলেন। সারদার নূতন ব্রত আরম্ভ হইল। সংসারে ইতিপূর্ব্বে যে সকল বড় বড় দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে, ক্রমে ক্রমে সকলে তাহা ভুলিলেন;—ভুলিলেন, কিন্তু হরকান্ত বাবুকে আর পদ্মরাণীকে ভুলিতে পারিলেন না। তাঁহাদের নাম স্মরণ করিয়া প্রায় সকলেরি চক্ষে অশ্রুপাত হয়। সেইটুকু ছাড়া সর্ব্ব প্রকারেই সকলে সুখী।

কলিকাতায় আসিয়া চন্দ্রকান্তের স্বধর্ম্মানুরাগ বিলুপ্ত হইয়া-ছিল, সদাচার পরিত্যাগ করিয়া তিনি অনেক প্রকার কদাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন. পুনরায় স্বগ্রামে ফিরিয়া গিয়া তিনি আবার পূর্ব্ববৎ ধর্ম্মাচরণে রত হইলেন।

দুঃসময়ে সূর্য্যকান্ত বাবু অগত্যা সারদাসুন্দরীর দশহাজার

টাকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুসময়ে সেই দশ হাজার টাকা সারদাকে প্রত্যর্পণ করিয়া মিষ্ট বচনে বলিলেন, "দিদি! তোমার টাকা তুমি গ্রহণ কর; ভগবান এখন সুপ্রসন্ন হইয়াছেন, এখন আর আমি তোমার টাকাগুলি নিজের কাছে রাখিব না।"

দুই হস্ত পাতিয়া টাকাগুলি গ্রহণ করিয়া সুশীলা সারদা ভক্তিভাবে বড় দাদাকে প্রণাম করিল; লইব না বলিয়া অস্বীকার করিতে তাহার সাহস হইল না।

ভবসংসারের খেলা বড় চমৎকার। যিনি এই বিশ্বসংসারের কর্ত্তা, তাঁহার নাম বিষ্ণু কি ব্রহ্মা, শিব কি গণপতি, দুর্গা কি কালী, ভক্তের অভিধানে বুদ্ধ কি চৈতন্য, যিশু কি মহম্মদ, তাহা আমরা জানি না;—কেহই জানে না;—বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার নাম উপাধি কিছুই নাই;—অচিন্ত্য, অব্যক্ত, নির্গুণ, গুণময়, সমস্ত জগতের আধার সেই পরমেশ্বর। শাস্ত্রপ্রমাণে ইহাই প্রতিপন্ন হয় বটে, কিন্তু সেই বিশ্বনাথের অনেক খেলা। নিজে তিনি খেলা ভালবাসেন, অবতারে অবতারে কত প্রকার লীলাখেলা করিয়াছেন, দ্বাপরাবতারে গরু বাছুর চরাইয়াছিলেন; লীলাময়ের লীলাখেলার অন্ত নাই। সংসারে খেলা করিবার জন্য যাহাদিগকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদেরও নানা প্রকার খেলা। এই আখ্যায়িকায় অনেক প্রকার খেলা প্রদর্শন করা হইল; হরকান্ত বাবুর সংসারে যত প্রকার খেলা হইল, তদ্-সমস্তই ভবের খেলা। প্রত্যেক খেলাতেই ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়!

দশম কল্প।

বন্দে মাতরম্।

দিনগুলি উড়িয়া উড়িয়া যায়, মাসগুলি ছুটিয়া ছুটিয়া যায়, বৎসরগুলি লাফাইয়া লাফাইয়া যায়। বাবু সূর্য্যকান্ত রায় বিবিধ চক্রে—বিবিধ বিপদে পরিবেষ্টিত হইয়াছিলেন, ধর্ম্মের মহিমায় সমস্ত বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্ব বিষয়েই সুখী হইলেন; ধর্ম্মেরই জয় হইল। করুণাময়ের ইচ্ছা এই যে, অধর্ম্মের পরাভব, ধর্ম্মের জয়। ধর্ম্মের সংসারে পুনর্ব্বার ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইল, তাহার পর ক্রমে ক্রমে বিংশতি বর্ষচক্র ঘুরিয়া গেল।

বিংশতি বর্ষ অতিক্রান্ত; এই সময়ের মধ্যে অনেকগুলি ঘটনা হইয়া গিয়াছে। মহারাণী ভিক্টোরীয়ার স্বর্গারোহণ, সপ্তম এড্‌বার্ড উপাধিতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র এড্‌বার্ড আলবার্টের রাজসিংহাসনে আরোহণ,নূতন মন্ত্রীসভার সংস্থাপন,লর্ড কর্জ্জনের ভারতাগমন, দিল্লির অভিষেক-দরবারে ভারত রাজস্বের প্রচুরাধিক প্রচুর অর্থ আকর্ষণ, ভারতের চতুর্দ্দিকে হাহাকার ক্রন্দন, লাট কর্জ্জনের পত্নী-বিয়োগ, ইত্যাকার অনেক ঘটনার সাক্ষী হইয়াছে এই অতীত বিংশতি বৎসর। হর্ষের ঘটনা—রাজকুমারের রাজ্যাভিষেক; বিষাদের ঘটনাই বেশী।

বঙ্গাব্দ ১৩১২ সাল। লর্ড কর্জ্জনের মস্তিষ্কসম্ভূত নূতন প্রস্তাবে বঙ্গপ্রদেশের অর্দ্ধাংশ বিভাগ। বাঙ্গালা সমাচার পত্রের সম্পা-

দকেরা এই বিভাগকে "বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ" বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। স্থূল কথা এই যে, পূর্ব্ববঙ্গের কতকগুলি জেলা আসাম প্রদেশের সহিত সংযুক্ত করিয়া তদ্প্রদেশ শাসনের জন্য একজন অতিরিক্ত লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণরের পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে।

এই উপলক্ষে বঙ্গবাসীরা স্বদেশ-গৌরব দেখাইবার অভিলাষে "বন্দে মাতরম্" ধূয়া ধরিয়া, স্বদেশ-ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলি স্বদেশেই প্রস্তুত করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। অবশ্যই মঙ্গলের নিদর্শন। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদে এই মঙ্গলের সূত্রপাত; অতএব লর্ড কর্জ্জনকে ভারতের শুভাকাঙ্ক্ষী বলিয়া সম্মান দান করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের জন্মদিন ইংরাজী ১৬ই অক্টোবর, বাঙ্গালা ৩০এ আশ্বিন। বঙ্গের হিতৈষী বন্ধুরা, সমাজের প্রধান প্রধান বাগ্মীরা এবং নবীন উৎসাহপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের বালকেরা সেই দিনটীকে বিষাদের দিন জ্ঞানে নিরানন্দের অভিনয় করেন। ভারতের রাজধানীতেই এই বিষয়ের প্রথম অনুষ্ঠান। নগরবাসীরা সেই দিনে স্ব স্ব গৃহে রন্ধনকার্য্য বন্ধ রাখেন, সমস্ত দোকান-পাট বন্ধ থাকে, নগরময় বন্দে মাতরম্ সংকীর্ত্তন হয়, নিরাপদের অভিলাষে সকলের হাতে হাতে রাখীবন্ধন করা হয়। যাঁহারা ঐ মন্ত্রের মহিমা বুঝিয়াছেন, সেই দিনে তাঁহারা পন্থা-বিহারের সময় ছত্র অথবা পাদুকা ব্যবহার করেন না। কেবল সেই দিনেই যে বন্দে-মাতরম্-কীর্ত্তন-সম্প্রদায় বাহির হয়, অন্য-দিনে হয় না, ইহা যেন কেহ মনে না করেন;—মধ্যে মধ্যে মহিমাকীর্ত্তন হইয়া থাকে, এক এক পল্লীতে প্রতিদিন ঐ মহিমা পরিকীর্ত্তিত হয়।

এতদিনের পর অকস্মাৎ "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের প্রচার কিরূপে হইল, তাহাও জানিতে হইবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমাদের ভক্তিভাজন প্রিয়বন্ধু বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তৎ-প্রণীত "আনন্দমঠ"নামক পুস্তকে ভবানন্দের মুখ দিয়া মাতৃ-ভূমির মহিমাবর্দ্ধক একটী সুমধুর সংগীত কীর্ত্তন করাইয়া গিয়াছেন; সেই সংগীতের প্রসাদেই অধুনা সমগ্র বঙ্গদেশে সেই মহামন্ত্রের অর্চ্চনা হইতেছে। পাঠক মহাশয়গণের মধ্যে যাঁহারা সেই তত্ত্বের সবিশেষ সংবাদ পরিজ্ঞাত নহেন, তাঁহাদের অবগতির নিমিত্ত সেই মধুর সংগীতটী এই স্থলে উদ্ধৃত হইল:—

গীত।

বন্দে মাতরম্!
সুজলাং, সুফলাং, মলয়জ শীতলাং
শস্য-শ্যামলাং, মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্—
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্,
সুখদাং বরদাং, মাতরম্।
সপ্তকোটি-কণ্ঠ-কল-কল-নিনাদ করালে,
দ্বিসপ্তকোটি ভুজৈর্ধৃত খর-করবালে,
অবলা, কেন বা এত বলে।
বহুবলধারিণীং, নমামি তারিণীং,
রিপুদলবারিণীং, মাতরম্।

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম,
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণা শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা, দশপ্রহরণধারিণী—
কমলা কমলদল-বিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী, নমামি ত্বাং।
নমামি কমলাং অমলাং, অতুলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরম্!
বন্দে মাতরম্!
শ্যামলাং, সরলাং, সুস্মিতাং, ভূষিতাম্,
ধরণীং ভরণীম্ মাতরম্!

সংগীতটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সর্ব্বাংশেই মঙ্গলফলপ্রদ, সন্তানগণের নবীন উৎসাহ-পরিবর্দ্ধক। মাতৃভূমির মহিমা যাঁহারা পূর্ণাংশে পরিজ্ঞাত ছিলেন না, এই ভক্তি সংগীতটী তাঁহাদিগকে নবভাবে মাতাইয়া তুলিয়াছে।

আরো দুই বৎসর অতীত। রাখীবন্ধনের প্রথম সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান হইয়াছিল ১৩১৩ সালে, দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান হইয়াছে ১৩১৪ সালে।

দেশের লোকেরা বিদেশী দ্রব্য গ্রহণ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে,স্বদেশী দ্রব্য স্বদেশে প্রস্তুত করিবার সূত্রপাত হইয়াছে; বস্ত্রের উপরেই অধিক দৃষ্টি;—অধিক মনোযোগ।

দেশের স্থানে স্থানে নূতন নূতন কল বসিয়াছে, নূতন নূতন তাঁত বসিয়াছে,যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে দেশীয় বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে, দেশের লোকেরা সাগ্রহে সমাদরে তাহা গ্রহণ করিতেছেন। অন্যান্য দ্রব্যও প্রস্তুত করিবার আয়োজন হইতেছে। অবশ্যই শুভলক্ষণ, অবশ্যই নূতন পরিবর্ত্তন, অবশ্যই স্বদেশের মঙ্গল।

বঙ্গাব্দ ১৩১৪ সালের আষাঢ় মাসে সহরের বহুবাজার অঞ্চলে একটী ভদ্রলোকের বাটীতে—তাঁহার বৈঠকখানায় একদিন একটী মজলিস্ বসিয়াছিল। যে রকম মজলিসে স্বদেশ-প্রেমের বড় বড় বক্তৃতা হয়,সে রকম মজলিস্ নহে, ছোটখাটো গুপ্ত মজলিস্। সে মজলিসে স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষ, বিপক্ষ, উভয় দলের লোক ছিলেন। এক এক করিয়া সকলের মন্তব্য প্রকাশ হইবার পর, দুই দলের দুইজন প্রধান লোক পরস্পর অনুকূল-প্রতিকূল তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ করিয়াছিলেন। স্বাপক্ষ-দলের প্রধান লোকটীর নাম হরিহর মিত্র, বিপক্ষ দলের প্রধান লোকটীর নাম গিরিজাশেখর মল্লিক।

হরিহর।—স্বদেশী-প্রথার আন্দোলনে দেশের যতদূর উপকার হইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এ দেশের শিল্পবাণিজ্য সাহেব-লোকেরা একচেটে করিয়া লইয়াছেন, বিদেশী জিনিসেই আমাদের দেশ পরিপূর্ণ। প্রধান ব্যবহার্য্য পরিধেয় বসন; ছোট বড় সর্ব্বলোকের লজ্জা-নিবারণ বসনগুলি ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে আমদানী হইতেছিল; দৈবাৎ ম্যাঞ্চেষ্টরের অকৃপা হইলে এ দেশের লোকগুলিকে উলঙ্গ হইয়া থাকিতে হইত। পুরাতন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী এই অনর্থ জাগাইয়া দিয়া গিয়াছেন; বস্ত্রশিল্প এককালে বিলাতী তাঁতীদের

একচেটে হইয়াছিল। ভগবানের কৃপায় সেই বিপত্তির অবসান হইতেছে; অল্প দিনের মধ্যে এ দেশে রাশি রাশি বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছে; পার্য্যমাণে দেশের কেহই প্রায় বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার করিতেছেন না। ইহা কি আপনারা দেশের মঙ্গল বলিয়া স্বীকার করেন না?

গিরিজা।—মঙ্গল বলিয়া স্বীকার করি, কিন্তু আসলে কুলাইলে হয়। মনে করুন, বঙ্গদেশে সাতকোটী লোকের বাস, বৎসরে এত লোকের কত বস্ত্রের প্রয়োজন,সেটাও ভাবিয়া দেখুন। জনকতক লোক থানকতক বস্ত্র বয়ন করিয়া কতদিকে ঠাই দিবে? অনেকদিন হইতে বোম্বাই নগরে কাপড়ের কল হইয়াছে, বোম্বাই তাঁতীরা কি বিলাতী তাঁতীদের সঙ্গে টক্কর দিতে পারিবেন?—তাঁহারা কি স্বদেশের অভাব ঘুচাইতে সমর্থ হইবেন?

হরি।—একদিনে পারিবেন না, দিন যতই অগ্রসর হইবে, দেশের লোকে দেশের জন্য যতই উদ্যমশীল হইবে, ততই দেশের অভাব পূরণ হইবার সুবিধা হইয়া আসিবে। এই দেখুন না কেন, দুই বৎসরের চেষ্টায় কতদূর উপকার হইয়াছে।

গিরি।—হইয়াছে আমার মাথা!—জনকতক লোকের গলাবাজী, দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকের আবদারের চীৎকার, আর গোটাকতক কাপড়ের কারখানার সরফরাজীর ধূমধাম। আমাদের দেশের যে রকম গতিক,তাহাতে অনুমান হয়, এটা যেন একটা হুজুগের মধ্যেই গণ্য; দিনকতক পরে হয় ত হুজুগের আগুন নিভিয়া যাইতে পারে; তখন আবার সেই বুড়ীর পদাশ্রয় ভিন্ন আর উপায় থাকিবে না।

হরি—ওটা আপনার মিথ্যা আশঙ্কা। যে আগুন জ্বলিয়াছে, তাহা আর নিভিবার নয়। দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যখন একমতে যোগ দিয়াছে, তখন কি ইহা হুজুগ বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়? দিন দিন আরও বরং অধিক উজ্জ্বল হইয়া এই অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে।

গিরি।—(হাস্য করিয়া) অগ্নি জ্বলিয়াছে, এই কথাটাই সত্য। আর কিছু হউক না হউক, এই আগুনে দেশটা পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইবে। এই এখনই দেখুন না, মানুষের আহার্য্য-ব্যবহার্য্য সমস্ত জিনিসের মূল্য চতুর্গুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হায় হায়! যে দেশের নাম স্বর্ণভূমি, যে দেশের নাম রত্নগর্ভা, সেই দেশে এখন বারোমাস দুর্ভিক্ষ—বারোমাস দুর্ভিক্ষ! বারোমাস হাহাকার!

হরি।—আপনি ছেলেমানুষের মতন কথা কহিতেছেন। দুর্ভিক্ষের কারণ অন্যপ্রকার। দেশের লোকে দেশের জিনিস সরবরাহ করিবার সংকল্প করিয়াছে, সেই অপরাধেই দুর্ভিক্ষ, এরূপ মনে করা মস্ত ভুল। দুর্ভিক্ষের একটা কারণ ইংরাজ বণিক; কেন না, বেশী বেশী মূল্য দিয়া তাঁহারা এ দেশের চাউলগুলি, গমগুলি এবং অপরাপর প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি স্বদেশে রপ্তানী করিয়া দিতেছেন, কাজে কাজেই দেশের দ্রব্য দেশের মধ্যে দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে। দেশের জিনিস দেশে থাকিলে কদাচ এমন অমঙ্গল ঘটিত না। এই গেল একটা, দ্বিতীয় কথা হইতেছে অজন্মা, অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, জলপ্লাবন ইত্যাদি কারণে সকল স্থানের সকল ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত শস্য জন্মিতেছে না। সৃষ্টিকর্ত্তার শুভদৃষ্টি হইলে সকল দিকেই মঙ্গল

ফল হইবে। দুর্ভিক্ষের ভাবনা ভাবিয়া বর্ত্তমান উৎসাহে বিঘ্ন জন্মাইবার চেষ্টা করা,—উদ্যোগী পুরুষদিগকে নিরুৎসাহ-সাগরে ডুবাইয়া দেওয়া কদাচ বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। সত্য সত্য যাঁহারা স্বদেশের হিতকামনা করেন, তাঁহারা কদাচ এই সদনুষ্ঠানকে হুজুগ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছেন না।

গিরি।—অবজ্ঞা করিতেছেন না, কিন্তু অবজ্ঞার হেতু আসিয়া দেখা দিতেছে। দেশে আজকাল ঘোরতর বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে, তাহা কমাইতে না পারিলে সহস্র চেষ্টা করিলেও সত্য অভাব ঘুচিবে না। দেশের ব্যবহার্য্য দ্রব্য দেশে প্রস্তুত করিতে হইবে, এই হুজুগ পাইয়া কত দিকে কত লোক আগে ভাগে স্বদেশী সাবান, স্বদেশী বার্ডসাই, স্বদেশী ফুটবল, স্বদেশী ক্রীকেট, স্বদেশী ম্যাকেশার প্রভৃতি সৌখীন জিনিস প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কেন গা?—ঐ সকল জিনিস না হইলে কি বাঙ্গালীর প্রাণরক্ষা হইবে না?—বলিতে হাসিও আইসে, দুঃখও হয়, কোন্ দিন হয় ত শুনিতে হইবে, স্বদেশী ব্রাণ্ডী হুইস্‌কী প্রস্তুত হইয়াছে!

হরি।—আপনি পরিহাস করিতেছেন। বাস্তবিক এটা কিন্তু পরিহাসের বিষয় নয়। যাহারা ঐ সমস্ত সামান্য জিনিস প্রস্তুত করিতেছে, আমি তাহাদের প্রশংসা করি না, আমাদের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে, বস্ত্র আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিল্প; সেই বিষয়ে যাহাতে অধিক উৎসাহ দেওয়া হয়, অধিক লোক সেই বিষয়ে ব্যাপৃত হয়, তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

গিরি।—আপনি ত বলিলেন কর্ত্তব্য, কিন্তু শান্তভাবে কায়মন সমর্পণ করিয়া ক'জন লোক সেরূপ চেষ্টা করিতেছে?

যাঁহারা দলপতি,তাঁহারা ইন্দ্রজিতের ন্যায় মেঘের আড়ে লুকাইয়া বাক্যবাণ বর্ষণ করিতেছেন, এক একদল বালক অগ্রবর্ত্তী হইয়া, আসল কর্ত্তব্য ভুলিয়া গাজনের সন্ন্যাসীর মত নাচিয়া বেড়াইতেছে, বন্দে মাতরম্ বলিয়া চীৎকার করিতেছে, গরীব দোকানদারের বিলাতী কাপড় জ্বালাইয়া দিতেছে, দোকানের বিলাতী চিনি ও লবণ প্রভৃতি রাস্তায় ছড়াইতেছে, বিলাতী ছাতি ভাঙ্গিয়া দিতেছে, স্বদেশী দোকানদারের বিলাতী জুতা টানিয়া টানিয়া ফেলিতেছে, পুলিসের লোকের সঙ্গে দাঙ্গা করিতেছে, ইহাই কি বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের শিক্ষা? এ শিক্ষার এই ফল হইতেছে যে, পুলিসের হস্তে প্রহার সহ্য করিতে হইতেছে, কারাবাস করিতে হইতেছে, স্কুল ছাড়িতে হইতেছে, আরও অনেক প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে। ইহাই কি মঙ্গল?—তাহারা বলে, স্বদেশকে উদ্ধার করিতে হইলে, লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, জেলে যাইতে হয়, এমন কি, প্রাণ দিতেও হয়। বলুন দেখি মহাশয়, দুগ্ধপোষ্য বাঙ্গালী বালকের মুখে এ সকল কথা কি শোভা পায়?

হরি।—বালকের মুখে শোভা পায় না, কিন্তু কথাটা অকাট্য। ঐরূপ না হইলে কোন জাতিই প্রকৃতপক্ষে একটা জাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। স্মরণ করিয়া দেখুন, দশ বৎসর পূর্ব্বে একটা লাল পাগড়ী দেখিলে, যাহারা ভয়ে পলায়ন করিত, এখন দলবদ্ধ লালপাগড়ীর সম্মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকেরা নির্ভয়ে মুখামুখী করিয়া চোটপাট জবাব করিতেছে, তেমন তেমন স্থলে হাতাহাতি করিতেও পেছু-পা হইতেছে না। ইহা কি আপনি বীর্য্যপ্রকাশের লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করেন না?

গিরি।—বীর্য্যপ্রকাশের লক্ষণ, কিন্তু কাহার কাছে বীর্য্য প্রকাশ করা হইতেছে, তাহা কি আপনি ভাবিয়া দেখেন না? রাজার সঙ্গে বিরোধ করা প্রজার পক্ষে ভারী দোষের কথা। বাঙ্গালী বালকেরা মাতামাতি করিতেছে, তাহা দেখিয়া রাজপুরুষেরা মনে মনে হাস্য করিতেছেন, খেলনা দিয়া ছেলেগুলিকে যেমন একটু প্রশ্রয় দেওয়া হয়, রাজপুরুষেরা সেইরূপে প্রশ্রয় দিয়া দূর হইতে তামাসা দেখিতেছেন। একটু বেশী বাড়াবাড়ি হইলে হয় ত কেল্লার জনকতক গোরা ছাড়িয়া দিবেন, তখনকার রঙ্গ দেখিয়া আপনিও হয় ত গা-ঢাকা দিবেন। সে রকম লালমুখ দেখিলে কে কোথায় পলাইবে, কে কোথায় লুকাইবে, ঠিক থাকিবে না; কাহারও টিকী দেখা যাইবে না, উচ্চবাচ্যও শুনা যাইবে না। গোরা সেনারা বাঙ্গালী বালকের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিবে না, গোলাগুলিও ছুড়িবে না, কেবল ঘোড়া ছুটাইয়া, রাস্তা কাঁপাইয়া, চলিয়া গেলেই সকলে অন্ধকার দেখিবে, আতঙ্কে কাঁপিয়া অন্দরের রন্ধনগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। তখন আর বন্দে মাতরম্ মন্ত্র কাহারও মুখে উচ্চারিত হইবে না। বলুন দেখি, এটা কি আমি মিথ্যা বলিলাম?

হরি।—কথাটা মিথ্যা নয়, কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য যাহারা অল্পে অল্পে যত্ন করিতেছে, অল্পে অল্পে একটু একটু সাহস দেখাইতে শিখিতেছে, তাহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া কি আমাদের কর্ত্তব্য নয়?

গিরি।—(বিস্ময় প্রকাশ করিয়া) উৎসাহ?—কাহাকে উৎসাহ দিব?—এক একটা স্বদেশী সভার রিপোর্টে আমি দেখিয়াছি, ভারি গোল। ঠিক ঠিক নাম খুঁজিয়া পাওয়া যায়

না। সভায় কে কে উপস্থিত ছিলেন, তাহা দেখিবার জন্য আমার কৌতূহল জন্মিয়াছিল। রিপোর্টে দেখিলাম, অনেক-গুলি নাম ;—এ, সিন্‌হা, বি, চাটর্জি, সি, ভাটাচারিয়া, সি, ড্যাট্টা, ই, বনার্জি, জি, ঘোষা, যে, মাল্লিক, এচ, পান, এইচ্‌, মহলানবীশ, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকল কি বাঙ্গালীর নাম? পিতামাতা আদর করিয়া ছেলেদের যে সকল নাম রাখিয়াছিলেন, সে সকল নাম কোথায় গেল? কোন কোন নামের পূর্ব্বে মিষ্টার শব্দ দেখিতে পাই, ইহাও কি স্বদেশী গৌরব? উৎসাহ দিব কাহাকে?—নাম ঠিক করিতে না পারিলে উৎসাহ দিবার যোগ্যপাত্র কোথায় খুঁজিয়া বেড়াইব?

যে মজলিসের কথা বলা হইতেছে, সেই মজলিসে গুটিকতক যুবক আর যৌবনের অঙ্কুরপ্রাপ্ত গুটিকতক বালক ছিল। তাহাদের মধ্যে তিনটী যুবক অল্পে অল্পে সরিয়া সরিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের নাম জীবেন্দ্র, দিবেন্দ্র ও শিবেন্দ্র। দুটী ভদ্রলোকে তর্ক করিতেছিলেন, যুবক তিনটীকে সম্মুখে দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য তাঁহাদের তর্ক বন্ধ হইল। গিরিজা-শেখরকে লক্ষ্য করিয়া জীবেন্দ্র বলিল, "আপনি যে দেখিতেছি, বড় শক্ত শক্ত কথা বলিতেছেন। বন্দে মাতরম্‌ মন্ত্রের মহিমা আপনি কিছু বুঝেন কি? সমাজ-সংস্কার না হইলে কোনও দেশের লোকে মানুষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, সমাজকেও সমাজ বলিয়া গণ্য করা যায় না। আপনারা সমাজে থাকেন, আপনাদের সমাজের আষ্টে-পৃষ্ঠে ঘা, তাহা আপনারা দেখিতে পান না। যাঁহারা চিকিৎসা করিতে আগ্রহবান, তাহাদিগকেই গালাগালি দেন। ইহাই কি আপনাদের মনুষ্যত্ব?

গিরিজাশেখর একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, "বোসো বাবা, বোসো। এটা তোমাদের সভামন্দির নয়, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বক্তৃতা ঝাড়িতে হইবে না। যাত্রার আসর নয়, থিয়েটারের রঙ্গভূমিও নয়, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অভিনয় করিতে হইবে না; স্থির হইয়া উপবেশন কর। জানি আমি, তুমি বিলক্ষণ জ্যাটা ছেলে,—জ্যাটামী ছড়াইবার জায়গা এটা নয়। কাজের কথা পড়িয়াছে, আমরা কাজের কথা লইয়া তর্ক করিতেছি, কোমর বাঁধিয়া ঝগড়া করিতেছি না; তোমার গায়ে ঝাল লাগিল কেন যাদু? কথা কহিবার যদি কিছু থাকে, বসিয়া বসিয়া শান্ত হইয়া কথা কও।"

যুবকেরা বসিল; অপ্রস্তুত হইল না। ঊর্দ্ধমুখ করিয়া জীবেন্দ্র বলিল, "বলুন, আপনি আমাকে কি বলিতে চান?"

গিরিজাশেখর বলিলেন, "তুমি সমাজ-সংস্কারের কথা তুলিয়াছ। ছেলেমানুষের মুখে সমাজ-সংস্কারের কথা বড় মিষ্ট। বুঝিতেছি, যাঁহারা এখন আমাদের সমাজ-সংস্কারক নামে বাচ্য, তোমরা তাঁহাদের চেলা। অনেকদিন ধরিয়া সমাজ-সংস্কারের তুফান উঠিয়াছে। ফল কি হইয়াছে, তাহা গণনা করিতে হয়। আমি ত দেখিতেছি, বিবাহের সময় নীলামের উচ্চডাকে বর বিক্রয় হইতেছে, কন্যাকর্ত্তাকে ফতুর করিয়া বরকর্ত্তা খুব উচ্চদরে পুত্র বিক্রয় করিতেছেন। পচা ব্রাহ্মণেরা কন্যা বিক্রয় করিত, সমাজে তাঁহারা পতিত হইয়া থাকিত; এখনকার কুলীন ব্রাহ্মণেরা কুলীন কায়স্থেরা গরু ছাগলের মতন পুত্র বিক্রয় করিয়া সমাজ মধ্যে সগৌরবে মাথা উঁচু করিয়া বেড়াইতেছেন; কুলীন অকুলীন সকল দলেই পুত্র বিক্রয়ের ধূম।

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সমাজ-সংস্কারের এই ত একটা সুপক্ক ফল। দ্বিতীয় কথা, তোমাদের দলের নবীন যুবকেরা অন্দরের কুল-বধূগুলিকে—কুলকন্যাগুলিকে অলঙ্কার-বস্ত্রে সাজাইয়া প্রকাশ্য প্রকাশ্য থিয়েটার দেখাইতে—সাহেব লোকের সারকাস্ দেখাইতে—আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখাইতে লইয়া যাইতে-ছেন; কিছুদিন পরে হয় ত কুলবধূরা ঘোড়ায় চড়িয়া কেল্লা দেখিতে যাইবার আব্‌দার ধরিবেন। সহরের চারি পাঁচ ক্রোশ দূর হইতেও গৃহস্থকামিনীরা থিয়েটার-সার্কাস দেখিতে আসি-তেছেন; গৃহস্থের ঘরে ঘরে—অন্দরে অন্দরে হারমোনিয়ম্ বাজিতেছে। ইহাই ত সমাজ-সংস্কার। জিজ্ঞাসা করি, ইহাই কি তোমাদের স্বদেশী গৌরবের নিদর্শন?"

জীবেন্দ্র বলিল, "ওগুলি আপনি স্বদেশী প্রসঙ্গের সঙ্গে ধরিয়া লইতেছেন কেন? স্বদেশে স্বদেশী জিনিসের প্রচলন করা আমাদের কার্য্য।"

গিরিজাশেখর বলিলেন, "দেখাইতে হইলে একে একে দেখাইতে হয়। হিন্দুর অন্তঃপুরে হারমোনিয়ম্ বাজে, এ সকল যন্ত্রকে তুমি হয় ত স্বদেশী যন্ত্র বলিয়া মানিয়া লইতেছ। আচ্ছা, আরও বুঝাইব। মনে কর, তুমি একটী ডিস্‌পেন্‌সারী খুলিয়াছ, ডিস্‌পেন্‌সারীতে রাশী রাশী বিলাতী ঔষধ, বিলাতী মদ্য, বিলাতী যন্ত্র, বিলাতী অস্ত্র বিলাত হইতে আমদানি হয়; তুমি কি বলিতে পার, সেগুলি আমাদের স্বদেশী? রামশঙ্করবাবু একটী ছাপাখানা খুলিয়াছেন, মুদ্রাযন্ত্র, ইলেক্‌ট্রিক মেশিন, ষ্টীম মেশিন, ছাপিবার টাইপ, ছাপিবার ভাল ভাল চক্‌চকে কালী, ভাল ভাল চক্‌চকে কাগজ, আরও ভাল ভাল সাজ-সরঞ্জাম

বিলাত হইতে আমদানি করা হইতেছে, না করিলে প্রেসের কার্য্য চলে না। তুমি কি বলিতে চাও, সে সকল সরঞ্জামও আমাদের স্বদেশী? আরও মনে কর, ওষ্ঠে অগ্নি জ্বালাইয়া বাবুরা যখন ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে বাইসিকল চালাইয়া যান, পঁ্যা-পোঁ শব্দ করিয়া যখন মোটরকার হাঁকাইয়া যান, তখন কি তোমাদের মনে হয়, ঐ সকল কলের গাড়ীও আমাদের স্বদেশী? আরও, মনে কর, যখন তোমরা বৈঠকখানা সাজাও, তখন কত রকম বিলাতী ছবি, কত রকম ঝাড়-লণ্ঠন দেয়ালগিরি, কত রকম শিশি গেলাস, কত রকম সৌখীন বাসন, ফুলদান, বিজলি পাখা, বিজলি আলো আরও কত কি আবশ্যক হইয়া থাকে, তাহাও কি আমাদের স্বদেশী? তুমি বালক, তোমাকে কত বুঝাই? ইংরাজের রাজত্ব, প্রায় দুইশত বৎসর সাহেব-লোকেরা সকল প্রকারে আমাদের উপরে প্রভুত্ব করিতেছেন, বিলাতের জিনিসে আমাদের দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছেন; ছুরি, কাঁচি, সূচ, সূতা, চাবি, তালা, কলকব্জা, এমন কি, প্রদীপ, জ্বালিবার দীয়াশলাই পর্য্যন্ত বিলাতী আমদানী;—তাহার মধ্যে যদি কিছু কিছু স্বদেশী জিনিস বাহির হয়, তাহা দেখিয়াই এ দেশের সৌখীন লোকেরা নাক মুখ বাঁকাইয়া তখনই বলেন, ছ্যা! এ সকল দেশী জিনিস, বাজে মেকার, বিলাতী চাই। এখন বল দেখি, বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের প্রভাবে এই তুফান থামাইতে কতদিন লাগিবে? তাড়াতাড়ি উন্মত্ত হইয়া সাহেবের সঙ্গে টক্কর দিতে যাওয়া, কতদূর সহজ কথা? ধৈর্য্য ধারণ কর, শান্ত হইয়া কাজ কর, রাজার পুলিস-প্রহরিগণকে মার-পিট করিতে যাইও না, তাহাতে ফল ভাল হইবে না। যেপ্রকার

চেষ্টা হইতেছে, তাহা আমি মন্দ বলি না, ভবিষ্যতে অবশ্যই মঙ্গল হইবে, কিন্তু ধৈর্য্য চাই। হঠাৎ গায়ের রক্ত গরম করিয়া তুলিলে বিপরীত ফল হইবে। বক্তৃতা কমাও, জারি-জুরি কমাও, বাহাদুরী দেখাইবার আন্দোলন কমাও, সকলের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিয়া ধীরে ধীরে কাজ কর।"

জীবেন্দ্রকে একটু পশ্চাতে রাখিয়া শিবেন্দ্র আসিয়া সম্মুখে বসিল; ললাটে হস্ত স্পর্শ করিয়া গিরিজাবাবুকে বলিতে লাগিল, "মহাশয়! আপনি বেশ দুইদিক গাহিতেছেন। একবার বলিতেছেন, স্বদেশী আন্দোলন ঠিক নয়, আবার বলিতেছেন, ধীরে ধীরে কাজ কর। আপনার কোন্ কথাটা আমরা মানিয়া লইব?"

গিরি। কে তুমি? শিবু? সেই শিবু তুমি? বাঃ! বেশ সাজিয়াছ! দাড়ী রাখিয়াছ, চশমা পরিয়াছ, সিঁথি কাটিয়াছ, খুব বাহাদুর!

শিব। আপনি বলেন কি? কথা হইতেছে স্বদেশী জিনিসের প্রচলন, সে কথাটা ছাড়িয়া আপনি আর একপ্রকার শ্লেষ ঝাড়িতেছেন। এ সকল কাজে কি হিংসা, বিদ্বেষ, শ্লেষ, উপহাস—

গিরি। কিবা তুমি বুঝিলে, কিবা তুমি বলিলে, কোথায় বা শ্লেষ দেখিলে, আমি ত কিছুই বুঝিলাম না। বলিতেছিলাম, তোমার রূপখানি বেশ নূতন হইয়াছে; শীঘ্র চিনিতে পারা যায় না। ইহার মধ্যে শ্লেষ কোথায়? স্বদেশী, তোমার অঙ্গে স্বদেশী চিহ্ন অনেক আছে; দাড়ী রাখিয়াছ, সেটাও স্বদেশী; মাথার চুলের সিঁথি, সেটাও স্বদেশী; কিন্তু ঐ গ্রীণ রঙের চস্‌মা

জোড়াটী স্বদেশী হইতে পারিতেছে না। উহা পরিত্যাগ করিলেও সভ্যতার অঙ্গ রক্ষা হইবে না।

শিব। আপনি সাগর লঙ্ঘন করিতেছেন। প্রসঙ্গ ছাড়িয়া আমাকে টিট্‌কারী দিবার ভূমিকা আওড়াইতেছেন।

গিরি। কিছুই ভূমিকা নয়, কিছুই ভূমিকা নয়, সাদা কথা,—সাফ কথা! তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছ, তাহা আমি শুনিয়াছি। ভালই করিয়াছ। পরাৎপর পরমেশ্বরের শরণ লওয়া পরম ধর্ম্ম। আমরা পারি না, আমাদের মন তত ঠিক নয়, আমাদের শাস্ত্রে দেব-দেবীর নাম অনেক, কাজেই আমরা একটীর উপর খাঁটি বিশ্বাস—খাঁটী ভক্তি, রাখিতে পারি না, তোমরা পারিতেছ; অবশ্যই তোমাদের বাহাদুরী আছে।

শিব। ধর্ম্মের কথা আপনি এখানে কেন আনিতেছেন? আমি যদি পরাৎপর পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে ভক্তিমান হইতে পারি, তাহাতে আপনার অসন্তোষ জন্মিবার কি কোন কারণ হইতে পারে?

গিরি। অসন্তোষ?—অসন্তোষ? রাম—রাম! তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী হইবে, তাহাতে আমাদের পরম সন্তোষ ভিন্ন অসন্তোষের লেশমাত্র নাই। তবে কি না, তোমাদের দলের কতকগুলি লোকের বিশ্বাস এইরূপ যে, দাড়ী না রাখিলে পরব্রহ্মের কৃপা হয় না; চশমা ধারণ না করিলে নিরাকার পরমেশ্বরকে দেখা যায় না; আর্য্য দেব-দেবীর নিন্দা না করিলে পরব্রহ্মের কৃপালাভের আশা থাকে না; আর্য্য-গৃহের আচার-ব্যবহার রক্ষা করিলে পরমেশ্বরের রাগ হয়; ব্রাহ্মণের ছেলের গলদেশে যজ্ঞোপবীত থাকিলে পরমেশ্বর তাহাকে

অবজ্ঞা করেন; এই সকল কারণেই তোমরা আমাদের সমাজের সমস্ত আচার পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক সেই পরাৎপরের পদে প্রাণ মন সমর্পণ করিতেছ। তথাপি যে তোমরা স্বদেশের মঙ্গলে উৎসাহ প্রকাশ করিতেছ, ইহা অবশ্য শ্লাঘার কথা। দেখ শিবু, তুমি হয় ত মনে কর, যাহাদের দাড়ী চশমা নাই, তাহারা সকলেই মিথ্যা কথা কয়। মনে কর এইরূপ, তাহা আমি বুঝিয়াছি; এইমাত্র তুমি বলিলে, আমি স্বদেশী আন্দোলনের নিন্দা করি, অথচ আবার ধীরে ধীরে কাজ করিতে বলি। তবেই জানা গেল, আমার একটা কথাও সত্য নয়। আচ্ছা দেখাও দেখি, কোন্ কথাটায় আমি স্বদেশী আন্দোলনের নিন্দা করিয়াছি?

শিব। কোন্ কথাটায় নয়?—আপনি বলিয়াছেন, সাহেবের সঙ্গে টক্কর দিতে পারিবে না, স্বদেশী বস্ত্রে স্বদেশের লোকের কুলাইবে না, স্বদেশী জিনিস স্বদেশে বেশী পরিমাণে প্রস্তুত হইতে পরিবে না, বিদেশী জিনিস এ দেশ হইতে তফাৎ হইবে না, ডাক্তারখানা, ছাপাখানা, বৈঠকখানা, এই সকল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, ইহার মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধী নয় কোন্‌টা?

গিরি। একটাও বিরোধী নয়। তখনও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, আন্দোলনটী খুব ভাল; ভবিষ্যতে মঙ্গল হইবে। শান্ত হইয়া ধীরে ধীরে কাজ করিতে হইবে, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতে অনেকদিন বিলম্ব হইবে, ইহাই আমার কথা। আরও কি জান, দেশের বাণিজ্যের একটী প্রশস্ত ক্ষেত্র আছে। তুমি ছেলেমানুষ,—না না,—ছেলেমানুষ নও, আমার অপেক্ষা

অনেক বেশী বেশী পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছ, বয়সে বালক হইলেও বিদ্যাতে তুমি প্রবীণ হইয়াছ; যে কথাটা আমি বলিলাম, আমার অপেক্ষা সে কথটা হয় ত তুমি বেশী জান। বাণিজ্যের একটা প্রশস্ত ক্ষেত্র আছে। সে ক্ষেত্রটা—

শিব। কি প্রকার প্রশস্ত ক্ষেত্র, অগ্রে তাহা প্রকাশ করুন, তাহার পর ক্ষেত্রের ফলাফল শুনিব।

গিরি। সেই কথাই ত বলিতেছি। প্রশস্ত ক্ষেত্র আছে। একটী স্থানে যে সকল জিনিস উৎপন্ন হইবে, যে সকল জিনিস প্রস্তুত হইবে, তাহা যদি একটী স্থানেই আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে কদাচ বাণিজ্য বিস্তার হয় না। আমার দেশে যাহা নাই, অথচ সে জিনিস আমার দরকার আছে, সেরূপ অবস্থায় বিদেশী জিনিসের আমদানী একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। স্থানের জিনিস স্থানে থাকিলে আমরা বাণিজ্যের সুধাময় সুস্বাদু ফল আস্বাদন করিতে পারিব না, বাণিজ্যের প্রশস্ত ক্ষেত্র কত-দূর, তাহার সীমাও বুঝিয়া উঠিতে পারিব না। একটা রহস্য মনে পড়িয়া গেল। একবৎসর একজন সুনামলব্ধ ইংরাজ ব্যারিষ্টার কলিকাতার একটী কলেজের এম, এ ক্লাসের ছাত্র-গণকে আইনের উপদেশ দিতেছিলেন, উপদেশের মধ্যে মধ্যে ভারতের এক এক স্থলের দৃষ্টান্ত আসিয়া পড়িয়াছিল। ছাত্রেরা ভূগোল শাস্ত্রে পণ্ডিত, ইংরাজ ব্যারিষ্টারের মুখে ভারতের স্থানের পরিচয় শুনিতে তাহাদের বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল, উপদেশ শুনিতে শুনিতে তাহারা অন্যমনস্ক হইয়াছিল। সাহেব তাহা বুঝিতে পারিয়া মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন; ক্রোধ চাপিয়া রাখিয়া দিব্য ঠাণ্ডা মেজাজে বলিয়াছিলেন, 'দেখ, তোমরা

মনে করিতেছ এম, এ পড়, আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি, আমিও একজন এম, এ; আমার মুখে নূতন উপদেশ শ্রবণ করা তোমাদের লজ্জার বিষয়, সেই জন্য বোধ হয় অভিমানবশে তোমরা অন্যমনস্ক হইতেছ। তোমরা হয় ত ভাবিয়াছ, সব শিখিয়াছ, সব জানিয়াছ, আর তোমাদের কিছু শিখিতে কি জানিতে বাকি নাই। সেটা তোমাদের বড় ভ্রম। তোমরা কলিকাতার বালক, কলিকাতার বাহিরে কি আছে, তাহা তোমরা চক্ষে দেখ নাই। পুস্তকে পড়িয়াছ ভারতবর্ষ, বাস্তবিক ভারতবর্ষের কোথায় কি, তাহা তোমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ভূগোলে লেখা ভারত-সীমা বিস্মৃত হইয়া, তোমরা হয় ত মনে করিতে পার, উত্তরে বাগবাজারের খাল, পূর্ব্বসীমায় মারহাট্টা খাদ, দক্ষিণে লোয়ার সারকিউলার রোড, পশ্চিমে হুগলি নদী, এই চতুঃসীমার মধ্যেই ভারতবর্ষ। অহো! এরূপ ভ্রান্তি থাকা বড় দোষ। আরও তোমরা জানিয়া রাখিও, ভারতে যাহারা এম, এ উপাধী প্রাপ্ত হয়, তাহাদের বিদ্যার মূল্য বড় জোর ইংরাজী পাঁচ পাউণ্ড মাত্র।'—শুনিলে শিবু, কেমন সুন্দর দৃষ্টান্ত! রহস্য থাকুক, কাজের কথা বলি। বাণিজ্যের প্রশস্ত ক্ষেত্র অসীম। এক দেশের জিনিস অন্য দেশে চলিয়া যায়, অন্য দেশের জিনিস স্থানান্তরে আমদানী হয়, ইহাই প্রশংসনীয় বাণিজ্য-নীতি। এক দেশের জিনিস অপর দেশে বদলাই করিয়া অপর দেশের অন্য জিনিস লইয়া আসা বাণিজ্যের একটী উত্তম অঙ্গ। ইহার নাম বিনিময়-বাণিজ্য। শিবু, আর একটা কথা বলি। তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছ, অসভ্য হিন্দুর কোন পুস্তকের দৃষ্টান্ত তোমার ভাল লাগিবে কি?

কবিকঙ্কণ চণ্ডীর বর্ণনায় তোমার বিশ্বাস হইবে কি? শ্রীমন্ত সওদাগর সিংহলপাটনে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার বিনিময়-বাণিজ্য কি প্রকার, তাহা তোমাকে শুনাইব কি? সব কথা এখানে উথাপন করিয়া বক্তৃতা বাড়াইব না, দু-এক কথা বলিয়াই তোমাকে বুঝাইয়া দিই।—"শুক্তি বদলে মুক্তা পেলেম, ভেড়ার বদলে ঘোড়া।" এইরূপে বিনিময়-বাণিজ্য সর্ব্ব দেশে প্রচলিত হইলে সকল দেশেরই শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে। এতদিন সাহেবের সঙ্গে আমাদের দেশের যেরূপ বিনিময়-বাণিজ্য চলিতেছিল, তাহাও ঐ রকম। ভেড়ার বদলে ঘোড়া। ইংলণ্ডের বণিকেরা আমাদিগকে সামান্য সামান্য জিনিস দিয়া এ দেশের মূল্যবান জিনিস গ্রহণ করিতেছিলেন। প্যারিমোহন কবিরত্নের একটী গীতে লেখা আছে;—

'এ দেশের নিচ্চে রাইস্, দিচ্চে আইস্, মা,—
নিচ্চে রেশম, পাট পশম, চিনি, সোরা, নীল,
পাকা মাল, তূলা, তসর, তীল,
দিচ্চে লিভারপুলের কাদা, সাদা মাটির ঢিল;
এরা ভেড়া দিয়ে নিচ্চে ঘোড়া, বল মা উপায় কি করি?
আর চাই না বিলাতী পানি, কুইন গো!
কুশলে থাক্ ধানেশ্বরী।'

বুঝিলে শিবু, বিনিময়-বাণিজ্য কিরূপ?—সাহেবেরা এদেশ হইতে পাট লাইয়া যাইতেছে, তুলা লইয়া যাইতেছে, আবার তাহাই কলে চড়াইয়া নূতন আকারে আমাদের দেশে প্রেরণ করিয়া খুব ফ্যালাও কারবার করিতেছে। সাহেবেরা এদেশ হইতে চাউল লইয়া যাইতেছে, সরু চাউলগুলি "টেবীল রাইস্"

করিয়া খানার টেবীল সাজাইতেছে, মোটা চাউলগুলিতে মদ প্রস্তুত করিয়া এদেশে পাঠাইয়া ধড়াধড় বিক্রয় করিতেছে। বুঝিলে আমার কথা ?

শিবেন্দ্র কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছিল, পশ্চাৎ হইতে হামাগুড়ি দিয়া দিবেন্দ্র আসিয়া আসর লইল; শিবেন্দ্রকে বলিল, "তুমি ভাই একটু চুপ কর, মল্লিক মহাশয়ের সঙ্গে আমার এইবার বুঝা পড়া।" এই বলিয়া গিরিজাশেখরের মুখপানে চাহিয়া বলিতে লাগিল, "বাহবা-বাহবা! এতক্ষণের পর আপনি আমাদের দিকে একটু হেল্‌চেন। বিলাতী-বাণিজ্যে আমরা যে কথা বলি, আপনিও সেই সব কথা বল্‌ছেন। আপনার কথাতেই আমাদের দলের জিত হয়ে আস্‌ছে। বিলাতের লোকেরা আমাদের দেশে ভাল ভাল জিনিস জাহাজে তুলে প্রায়ই বিনামাশুলে ভাসিয়ে দিচ্ছে, আমাদের ধনে তারা বড় মানুষ হয়ে উঠ্‌ছে, আমরা গরীব হয়ে পড়্‌ছি। এখানে আমরা—

হরিহর বাবু একটু তফাতে ছিলেন, নিকটে আসিয়া দিবেন্দ্রকে থামাইয়া তিনি ধূয়া ধরিলেন, ঐ কথাই ত আমার। এদেশের জিনিস এই দেশে রাখাই আমাদের দরকার। দেশে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা যদি আমরা দেশে রাখিতে পারি, তাহা হইলে দুর্ভিক্ষের তাড়নে আমাদিগকে অবসন্ন হইতে হয় না, অভাবের আগুনে দগ্ধ হইতে হয় না; এক বৎসর কিছু অল্প ফসল জন্মিলে চতুর্দ্দিকে হাহাকার উঠে না। সেই চেষ্টাতেই আমরা—

বাধা দিয়া, হস্ত বিস্তার করিয়া গিরিজাশেখর বলিলেন,

"চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন কই?—আসলেই গলদ। বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের শিষ্য-সেবকেরা স্বদেশী জিনিস প্রস্তুত করিতে, স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করিতে সংকল্প করিতেছেন, অতি উত্তম সংকল্প; বিদেশের জিনিস লইবেন না, এটাও ভাল কথা; কিন্তু এ দেশের জিনিস বিদেশী লোককে দিবেন না, এমন প্রতিজ্ঞা আপনারা করিতে পারেন?"

হরি।—সেই চেষ্টাই ত হইতেছে। প্রতিজ্ঞা না করিলে কখনই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারিবে না।

গিরি।—তাহা যদি বুঝিয়া থাকেন, তবে ত চেষ্টা বৃথা। এ দেশের জিনিস বিদেশে দিবেন না, এ প্রতিজ্ঞা আপনাদের থাকিবে না; তবেই ধরুন, কখনই আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না।

হরি।—কি কথা আপনি বলেন?—প্রতিজ্ঞা করিব, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিব না, এতই কি কাপুরুষ আমরা? কখনই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না, এ কথা আপনি কেন বলেন?

গিরি।—কেন বলি?—এখনও আপনার মুখে ঐ প্রশ্ন? প্রথমেই ধরুন, আসল কথা।—বাঙ্গালীর প্রাণধারণের প্রধান উপায় চাউল;—সেই চাউল কি আপনারা দেশে মজুত করিয়া রাখিতে পারিবেন?—পারিতেছেন কি? অগ্রহায়ণ মাস পড়িতে পড়িতেই সাহেব ব্যাপারীরা এদেশে চাউলের কাঁটা বসায়; ভাল ভাল চাউল অধিক মূল্য দিয়া কিনিয়া লইয়া জাহাজে তুলিয়া দেয়, তাহা আপনারা নিবারণ করিতে পারেন কি?—পারিতেছেন কি?

হরি।—আমাদের দেশে চাষা লোকেরা বোকা ; তাহারা টাকা ভালবাসে ;—প্রাণ অপেক্ষা বেশী ভালবাসে ; ইহাও আমি বলিতে পারি। সাহেব লোকে বেশী টাকা দিয়া চাউল লয়, আপনারা কি খাইয়া বাঁচিবে, চক্‌চকে টাকা হাতে পাইয়া চাষারা সে কথাটা একেবারেই যেন ভুলিয়া যায় ; চৈত্র মাস আগত হইতে না হইতেই অন্নের জন্য হাহাকার করে, তথাপি টাকার মায়া ছাড়িতে পারে না। আমি একবার—

শিষ্টাচারবিরুদ্ধ হইলেও বিলাতী-সভ্যতার নবীনশিষ্য জীবেন্দ্র নাথ শীঘ্র শীঘ্র সম্মুখে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, "আপনি বুঝাইতে পারিবেন না, আমি বুঝাইব। গিরিজাবাবু যে কথা তুলিয়াছেন, সে কথার ও রকম উত্তর নয়।"

গিরিজা।—(সকৌতুকে) কি করম উত্তর তবে ?

জীব।—উত্তর এই যে, স্বাধীন বাণিজ্যে কেহ বাধা দিতে পারে না। যে দেশে স্বাধীন বাণিজ্য চলে, সে দেশে জিনিসের অধিকারীরা যাহাতে ইচ্ছা, তাহাতেই আপনাদের জিনিস বিক্রয় করিতে পারে। স্বাধীন বাণিজ্য না থাকিলে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয় না।

গিরি।—হরিবোল হরি।—স্বাধীন বাণিজ্য কাহাদের বাপু ? তোমরা ইংরাজী পড়িয়াছ, ইংরাজেরা স্বাধীন বাণিজ্য আনিয়াছেন, তোমরা তাহাতে বাধা দিতে চাও না ;—বাধা দিতে পার না ; কাজে কাজেই এ দেশের চাউল রপ্তানির পথ বন্ধ হইতে পারে না। যদি রপ্তানির পথ বন্ধ হইতে না পারে, তবে আমদানীর পথ বন্ধ হইবে, তাহার যুক্তি কি ? স্বাধীন বাণিজ্যের খাতিরে এ দেশের চাউল স্বচ্ছন্দে অবাধে

বিদেশে চলিয়া যাইবে, তবে সেই স্বাধীন বাণিজ্যের খাতিরে বিদেশী বস্ত্রাদি—বিদেশী সৌখিন দ্রব্যাদি এদেশে আমদানী হইবে না কেন? স্বাধীন বাণিজ্য যদি তোমাদের এত প্রিয়, তবে কেন চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া থাক না। এত গণ্ডগোল, এত বক্তৃতা, এত দাঙ্গা-হাঙ্গামা তবে কিসের জন্য?

জীব।—ও সকল কথায় কথা কহা আপনার অধিকারের সীমা বহির্ভূত। টাকার হিসাব করিতে আপনাদের জাতি বিলক্ষণ মজবুত, আপনি সেই টাকার হিসাব ধরিয়া থাকুন; আমাদের সমাজের ভাল মন্দ কথায় আপনার তর্ক-বিতর্ক করা উচিত হয় না।

গিরি।—(হাস্য করিয়া) বুঝিয়াছি তোমার মনের কথা; তুমি আমাকে হঠাইয়া দিবার মতলবে আছ। আমি মল্লিক, তুমি আমাকে টাকাওয়ালা মল্লিক ভাবিয়া লইয়াছ।

জীব।—(গলা উচু করিয়া কট্‌মট চক্ষে চহিয়া) কি তবে আপনি?

গিরি।—(মৃদু হাস্য করিয়া) সে কথা তোমার দরকার? শুনিয়াছি, তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছ, ইংরাজী পড়িয়াছ, নূতন ধরণে সমাজ সংস্কারের বক্তৃতা করিতে শিখিয়াছ, নূতন ধরণের সভ্য-খাতায় নাম লিখাইয়াছ, আমাদের জাতীয় কথা লইয়া বাদানুবাদ করায় তোমার কি লাভ?

জীব।—যতদিন এ দেশে জাতিভেদ আছে, ততদিন জাতির কথাটা পরিত্যাগ করা যায় না, যাহা আমি বলিয়াছি, তাহাতে আমার কি দোষ, তাহা কি আপনি আমায় বুঝাইয়া দিতে পারেন?

গিরি।—তুমি আমাকে টাকাওয়ালা মল্লিক বিবেচনা করিয়াছ। বহুৎ আচ্ছা! এই হরিহর বাবুকে তুমি জান ত? হরিহর বাবু আমার বাড়ীতে অন্নগ্রহণ করেন, তাহা তুমি জান ত? হরিহর বাবুর কন্যার সহিত আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ হইয়াছে, সে সম্বন্ধটা তুমি জান ত?

জীব।—আজ্ঞে না,—অত তত্ত্ব আমি জানি না। কি তবে আপনি?

গিরি।—এখনও প্রশ্ন? কেবল ব্রহ্মজ্ঞানী?—কেবল জ্যাটামী?—কেবল পাকা পাকা কথা? কুলিন কায়স্থ বংশীয় মিত্রের কন্যার সহিত আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ এ কথা শুনিয়া এখনও তোমার ভ্রম ঘুচিতেছে না? এখনও সন্দেহ? এসো যাদু, তোমার সন্দেহ ভঞ্জন করি। হরিহরবাবু কোন্নগরের, মিত্র, আমি হইতেছি মাহিনগরের বসু; আমার আসল উপাধি হইতেছে বসু-মল্লিক। এখন বুঝিতে পারিলে? আরও বেশী কিছু বুঝাইতে হইবে কি?

পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া শিবেন্দ্র ও দিবেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া জীবেন্দ্র তখন নীরব হইয়া রহিল। গিরিজাশেখর বলিতে লাগিলেন, চাউল-রপ্তানী বন্ধ করিতে পারিবে না, বিলাতের বস্ত্রের আমদানী বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছ, স্বাধীন বাণিজ্যের প্রতাপে তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। পলাশী যুদ্ধের পর ইংরাজ কুঠিয়ালেরা বঙ্গের তাঁতিগণকে হুকুম দিয়াছিল, তোমরা কাপড় প্রস্তুত কর, সব কাপড় আমরা লইব, অপর খরিদ্দারকে তোমরা বিক্রয় করিতে পারিবে না; যদি কর, তোমাদের আঙ্গুল কাটিয়া লইব। কেবল ভয় দেখান

কথা নয়, সত্য সত্য সাহেব লোকেরা জনকত তাঁতির বৃদ্ধা-ঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া লইয়াছিল। তদবধি সাহেবরা কাপড়ের ব্যবসাটা একচেটে করিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে সেই একচেটে বাণিজ্য প্রবল হইয়াছে, সমভাবে চলিয়া আসিতেছে; সেই সূত্র হইতেই ম্যাঞ্চেষ্টারের তাঁতিগণের প্রাধান্য। এ দেশের তাঁতিরা গরীব হইয়া পড়িয়াছে, কলমপেশা চাকরী শিখিতেছে, আমাদের কাপড় বিলাত হইতে আসিতেছে।

দিবেন্দ্র। (অগ্রসর হইয়া) আসিতেছিল, আর আসিবে না। আমরা এখন দেশের ব্যবহার্য্য বস্ত্র দেশেই প্রস্তুত করিয়া যোগাইব। ক্রমে ক্রমে সকল প্রকার বিলাতী জিনিসের আমদানী বন্ধ হইয়া যাইবে।

গিরি।—বন্ধ হইয়া যাইবে, কিম্বা বাড়িয়া উঠিবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? একটা নুতন দৃষ্টান্ত বলি ঃ—পথে, ঘাটে, গৃহস্থ বাড়ীর দেওয়ালে, খবরের কাগজে, ট্রামগাড়ীর মাথায় মাথায় বড় বড় বিজ্ঞাপন দেখা যায়, "গোয়ালিনী মার্কা গাঢ় দুগ্ধ ব্যবহারে আনিও।"—এখানে গোয়ালিনী মার্কা গাঢ় দুগ্ধ কি, তাহা বুঝিতে হইবে। গাঢ় দুগ্ধ মানে বিলাতী দুগ্ধ। তোমরা সকলেই এখন চা খাইতে শিখিয়াছ, প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে সকল বাড়ীতে স্বদেশী গাভীদুগ্ধ সুলভ হয় না, অথচ তোমাদের চা খাওয়াও বন্ধ থাকে না. কাজে কাজে অম্লানবদনে তোমরা গোয়ালিনী মার্কা গাঢ় দুগ্ধ কিনিয়া রাখ, কিছুই ভাবিতে হয় না, স্বচ্ছন্দে সকাল বৈকাল দুইবেলা সাধ মিটাইয়া চা খাওয়া হয়।

দিব।—যাহারা খায়, তাহারা খায়, আমরা খাই না।

গিরি।—তোমরা ক'জন? অঙ্গুলি দ্বারা তোমাদের সংখ্যা গণনা করা যায়। বেশী লোকে যাহা করে, তাহাই ধরিতে হয়। আরও দেখ, মাতৃস্তন্যদুগ্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুগণের অসুখ হয়, এই হেতুবাদ দর্শাইয়া সহরে এখন মেলিনফুড্, নেসলফুড্, মিলোফুড্ ইত্যাদি নূতন নূতন শিশুফুড্ বিক্রিত হইঁতেছে। অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করিয়া সেই সকল "ফুড্" গৃহে গৃহে রাখিতেছেন। সেই সকল ফুডের প্রভাবে ছেলেরা মোটা হয়, রোগ থাকে না, রোগ হয় না ইহাই অনেকের বিশ্বাস। যাহারা স্বদেশী জিনিসের আদর করে, এই দৃষ্টান্তে তাহারা কি বলিয়া সাফাই দিবে, তাহা আমি বলিতে পারি না।

দিব।—সকলে তাহা করে না। স্বদেশী জিনিসের প্রাচুর্য্য হইলে, স্বদেশী জিনিসের গৌরব সকলে বুঝিলে, ঐ প্রথা উঠিয়া যাইবে।

গিরি।—এসো বাবা, একটু নরম হইয়াছ, ইহাও মঙ্গল। কি কারণে ঐ সকল উপদ্রব, তাহাও আমি বলিব, দেশের দোষ আমি গোপনে রাখিব না। আজকাল কলিকাতা সহরে বিশুদ্ধ গাভী-দুগ্ধের বড়ই অনাটন। ধূর্ত্ত গোয়ালারা পচা পুকুরের জল মিশাইয়া, এক একরকম ফুট দিয়া, বেশী দরে দুগ্ধ বিক্রয় করে; তাহাও সময়মত সকলে পায় না; দেশের দুগ্ধ অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। কেন কমিয়াছে, তাহাও বলি ঃ—সাহেব লোকের উদরের অনুরোধে এতদ্দেশে অসংখ্য গাভীবৎস দিন দিন জবাই হইতেছে, কশাই অপেক্ষাও ঘোর কশাই গোয়ালারা টাকার লোভে কশাইয়ের হস্তে ভাল ভাল গাভীবৎস বিক্রয় করিতেছে; সাহেবেরা নবীন নবীন বৎস-মাংস ভালবাসে,

গোয়ালারাও আবার দুগ্ধপোষ্য বৎসগুলিকে অনেক অধিকমূল্যে কশাইয়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া ফুকো দিয়া গাভী দোহন করে; ফুকো দেওয়া যে কি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা, তাহা যাঁহারা জানেন না, তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার। অনেক কারণে এ দেশের গাভীর সংখ্যা অল্প হইতেছে, দুগ্ধ অল্প হইতেছে, সেই অল্প দুগ্ধ আবার নানা প্রকারে বিকারপ্রাপ্ত হইতেছে। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশে একটী গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহার একস্থানে লেখা আছে;—

(ওগো মা!) কর্ গো মানা, কর্ গো মানা!
মা তোর রাঙা ছেলে যেন মোদের
চোক রাঙে না, চোক রাঙে না॥
এরা ধোরে ধোরে দিচ্চে পেটে
আস্ত ভগবতীর ছানা,
ও মা, সকল গরু ফুরিয়ে গেলে
দুগ্ধ খেতে আর পাব না, আর পাব না!"

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কবিবর যে দৈববাণী করিয়াছিলেন, অধুনা তাহার প্রত্যক্ষ ফল ফলিতেছে। কাজে কাজেই এখন গোয়ালিনী মার্কা গাঢ় দুগ্ধ এবং নানা প্রকার বিলাতী ফুড আমদানী না করিলে চলে না, কাজে কাজেই নূতন নূতন বিলাতী পুষ্টিকর দ্রব্যের আবির্ভাব।

দিব।—আপনি কেবল পুরাতন কথাই তুলিতেছেন। যখন স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয় নাই, তখন যাহা যাহা হইয়াছিল, তাহা যে চিরদিন বজায় থাকিবে, এমন মনে করা ভুল।

গিরি। নূতন পুরাতন আমি বুঝি না। আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তুমি টীকা করিতেছ, সেটা ভাল নয়; যাহা যাহা আমি বলি, পুরাতনই হোক্, আর নূতনই হোক্, অগ্রে মন দিয়া শ্রবণ কর, তাহার পর টীকা করিও।

দিব। আচ্ছা, চুপ করিলাম। আরো কি আপনি বলিতে চান, বলুন।

গিরি। আমাদের রাজপুরুষেরা পরম দয়ালু। অবলা জীবের প্রতি কোনরূপ নিষ্ঠুরতা না হয়, সেই উদ্দেশে তাঁহারা একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন, সেই সভার নাম "পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণী সভা।" সেই সভার মহিমায় পশু পক্ষী-গণের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণের জন্য এক একদল ইন্‌স্‌পেক্টার নিযুক্ত আছেন; গাড়ীর গরু অথবা গাড়ীর ঘোড়ার অঙ্গে কোন প্রকার ক্ষতচিহ্ন থাকিলে গাড়োয়ানগণকে ধরিয়া পুলিসে দেওয়া হয়, জবাই করিবার জন্য মোরগ মুরগী কিনিয়া লইয়া যাইবার সময় মোরগ মুরগীর মাথা যদি নীচু দিকে ঝুলিয়া থাকে, তাহা দেখিলে নিষ্ঠুরতা নিবারণী সভার দূতেরা সেই প্রকারের পক্ষীবাহক মুসলমানগণকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিসে দেয়; কোন পদস্থ সাহেবের খানসামা হইলে বেকসুর খালাস পায়, আসামী গরিব হইলে নিশ্চয়ই জরিমানা হয়। একবার হাওড়ার এলাকার এক বাজারে একজন মেছুনী কাঁকড়ার দাড়া ভাঙ্গিয়া বিক্রয় করিতেছিল, হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট সেই মেছুনীর ২০৲ টাকা জরিমানা করিয়াছিলেন; হাইকোর্টে মোশন হইয়াছিল, হাইকোর্টের জজেরা ম্যাজিষ্ট্রেটের রায় বাহাল রাখিয়াছিলেন। অসীম দয়ার কার্য্য! ওদিকে ত এই,

এদিকে যে সকল নিষ্ঠুর গোয়ালা ফুকো দিয়া গাভী দোহন করে, দলে দলে ইন্‌স্পেক্টার ঘুরিলেও সে সকল গোয়ালা প্রায়ই ধরা পড়ে না ; দু-একজন যদি দস্তুরমত বকসিশ দিতে নারাজ হয়, তবেই বিভ্রাট ! ইন্‌স্পেক্টরেরা তাহাদিগকে পুলিসে চালান দেন, বিচারে পঞ্চাশ ষাট্ অথবা একশত টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হয় ; তাহা ছাড়া, সকলেই অব্যাহতি পাইয়া যায়। নিষ্ঠুরতা-নিবারণী-সভার দয়ার কার্য্য আরো আছে। কশাইয়েরা যখন ঝাঁকঝাঁক গাভীবৎস বন্ধন করিয়া সহরের রাস্তা দিয়া লইয়া যায়, বাছুরগুলির মুখে তখন জাল বাঁধা থাকে, পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হইলেও সম্মুখবর্ত্তিনী গাভীর স্তনদুগ্ধ পান করিতে পায় না। সাক্ষাৎ পিশাচরূপী কশাইয়েরা সেই বাছুরগুলিকে জোরে জোরে টানে, রাস্তার ইষ্টক-প্রস্তরে বাছুরগুলির মুখ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রক্তপাত হয়। নিষ্ঠুরতা-নিবারণী-সভার হুজুরেরা তাহা দেখিয়াও দেখিতে পান না। সাহেব লোকেরা যে সকল জীবকে গর্ভস্থ করিবেন, জবাই করিবার অগ্রে সেই সকল জীবের প্রতি নিতান্ত নৃশংসাচার হইলেও হুজুরেরা হয় ত নিষ্ঠুরতা বলিয়া বিবেচনা করেন না ! সহরের দৃষ্টান্তে মফঃস্বলে এক একটী প্রসিদ্ধ মহকুমাতেও পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা-নিবারণী সভার সৃষ্টি হইয়াছে। এক বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের এক রাত্রে রাণাঘাটে চূর্ণীনদীর তীরে প্রায় তিনশত গাভীবৎস একদড়ীতে বাঁধা ছিল, সেই রাত্রিতে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হয় ; অবলা জীবগুলি দারুণ শীতে কাঁপিয়া অনাহারে একস্থানে দাঁড়াইয়া ছিল ; কশায়েরা নিকটের কোন দোকনে মনের সুখে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইয়াছিল, পরদিন বেলা ছয় দণ্ডের সময় সেই

সকল অবশাঙ্গ গরুবাছুর নির্দ্দিষ্ট স্থানে চালান হয়; অনেকগুলি আধমরা! সেখানকার নিষ্ঠুরতা-নিবারণী-সভা সেই দারুণ ব্যাপারের কোন খবর রাখেন নাই।

দিব। আপনার কি আর কিছু বলিবার আছে?

গিরি। (সবিস্ময়ে) এ সকল দৃষ্টান্ত কি তোমার কাছে সামান্য বলিয়া বোধ হইল?

দিব। সামান্য বোধ হইল না, কিন্তু যখনকার কথা, তখন আমাদের স্বদেশী আন্দোলন উদ্ভাবিত হয় নাই।

গিরি। কলিকাতা সহরে কশাইদিগের নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রায় অনেক রাস্তায় দৃষ্টিগোচর হয়; পূর্ব্বেও যেমন ছিল, এখনও সেইরূপ। এখন ত স্বদেশী আন্দোলনের উদ্ভাবন হইয়াছে, এখন কি তাহা তোমরা নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতেছ? এক একটী হৃষ্টপুষ্ট গাভী চারি পাঁচজন লোকে কশাইয়ের হস্তে প্রহার সহ্য করিতে করিতে হিন্দুপল্লীর মধ্য দিয়া আকর্ষিত হয়;—মুখ বাঁধা, শিং বাঁধা, নাসারন্ধ্রে রক্তধারা, সর্ব্বাঙ্গে গোবর মাখা, সে অবস্থা দর্শন করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়; এক একটী গাভী যদি দৈবাৎ কশাইদিগকে পদাঘাত ও শৃঙ্গাঘাত করিয়া, নিকটস্থ কোন ধর্ম্মশীল হিন্দুর বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে, বাড়ীর কর্ত্তা তখন হয় ত কশাইদিগকে প্রহার করাইয়া সম্ভবমত মূল্য দিয়া আশ্রিত গাভীকে আশ্রয় দেন; ধর্ম্মপরায়ণ এক একজন মাড়োয়ারী ভদ্র লোক উচিতমূল্য দিয়া কশাইয়ের হস্ত হইতে অনেক গাভীবৎসকে উদ্ধার করেন। বৌদ্ধধর্ম্মে ও জৈনধর্ম্মে জীবহিংসা নিষিদ্ধ, সেই কারণে তাঁহাদের ঐরূপ সদ্ব্যবহার; [হিন্দুধর্ম্মে কি গোহত্যা নিষিদ্ধ

নয়? বল দেখি দিবু, তোমরা এখন যে ধর্ম্মের সেবা করিতে শিখিতেছ, সেই পবিত্র ধর্ম্মে কি ঐ প্রকার প্রাণীহত্যা নিষিদ্ধ নয়?—অবশ্যই নিষিদ্ধ। তবে কেন তোমরা সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতেছ না? কেবল গরিবের কাপড় পুড়াইয়া, জিনিস তছরূপ করিয়া, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাইয়া বাহাদুরি করিবার চেষ্টা করিলেই কি স্বদেশী আন্দোলন সুসিদ্ধ হইবে?

দিব। একে একে আমরা সকল কার্য্যে মন দিব। একেবারে লম্ফ দিয়া পর্ব্বতে আহোরণ করা যায় না।

গিরি। দেখ, কথায় তোমাদের আঁটিয়া উঠা ভার। জ্যাঠামিটা তোমরা বিলক্ষণ অভ্যাস করিয়াছ। তোমাদের শিবেন্দ্রনাথ একটু আগে আমাকে বলিয়াছিল, আপনি সাগর লঙ্ঘন করিতেছেন। তখনি আমি বুঝিয়াছিলাম, আমাকে হনুমান বলা হইল, কিন্তু তখন আমি কিছু বলি নাই, এখন আবার তুমি লম্ফ দিয়া পর্ব্বতে উঠিবার দৃষ্টান্ত দেখাইলে। দেখ বাপু, তোমরা লম্ফ-ঝম্ফের অভ্যাসটা ছাড়, যে কার্য্যে ব্রতী হইতেছ, সেই কার্য্যেই মন দাও; লম্ফ-ঝম্ফ করিলে সব দিক নষ্ট হইয়া যাইবে। শেষে হয় ত তোমাদিগকে ঋষ্যমুক পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়া লুকাইয়া থাকিতে হইবে।

অকস্মাৎ যেন সাপের লেজে পা পড়িল। ব্রহ্মজ্ঞানী হইবার পূর্ব্বে দিবেন্দ্রনাথ কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়িয়াছিল, ঋষ্যমুক পর্ব্বতের নাম শুনিয়াই গর্জ্জিয়া উঠিল;—যেন চপলাপ্রবাহে দাঁড়াইয়া উঠিল; পশ্চাতে চাহিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "দেখ হে দেখ, শুন হে শুন, এই দাম্ভিক মল্লিকটা আমাদের সকলকে বানর বলিয়া গালাগালি দিল।"

নিকটেই জীবেন্দ্রনাথ বসিয়াছিল, তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া ঘুসি পাকাইতে পাকাইতে আরক্তবদনে উগ্রস্বরে বলিয়া উঠিল, "কি! বানর?—আমরা সব বানর? তুমি কে? মল্লিক—মল্লিক—কোথাকার মল্লিক? পূর্ব্বে আমরা তোমাকে কখন দেখিও নাই, তোমার নামও কখন শুনি নাই, হঠাৎ এই ভদ্রলোকের বাড়ীতে আসিয়া তুমি আমাদের বানর বল? এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার? দিবেন্দ্র আমার প্রাণ;—প্রাণের চেয়েও বড়,—প্রাণের বন্ধু,—আমাদের সকলকেই তুমি বানর ঠাওরালে?" (একটু চিন্তা করিয়া) কি বলিব, তুমি নিজ মুখে পরিচয় দিয়াছ, হরিহরবাবু তোমার কুটুম্ব; তাহা না হইলে এখনই তোমায় দেখাইতাম মজা!"

সেই মজলিসে প্রায় পঁচিশজন লোক ছিলেন, তাহার মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক লোক স্বদেশী আন্দোলনের বন্ধু, বাকী অর্দ্ধেক আংশিক বিপক্ষ। যাঁহারা পক্ষে ছিলেন, তাঁহারা সকলেই উগ্র-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জোরে জোরে গলাবাজি আরম্ভ করিলেন।

গিরিজাবাবুও উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার দলের লোকেরাও কটিবন্ধন পূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইলেন; গলাবাজী হইতে হইতে হাতাহাতি হইবার উপক্রম; বাড়ীর কর্ত্তা তখন অন্দর-মহলে অন্য কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, স্বদেশী-আন্দোলনে পক্ষ বিপক্ষ কোন দলের সহিত তাঁহার সহানুভূতি ছিল না, বৈঠকখানায় বিকট চীৎকার-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, তিনি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিলেন; কি সূত্রে হাঙ্গামা উপস্থিত, তাহা না শুনিয়াই গলবস্ত্র হইয়া মিনতিবচনে উভয় পক্ষকেই থামাইয়া দিলেন।

মজলিস ভঙ্গ হইল। সকলে চলিয়া যাইবার পর হরিহর বাবু কিয়ৎক্ষণ সেইখানে থাকিয়া গিরিজা বাবুকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "বেয়াই মশাই! কাজটা তোমার ভাল হয় নাই। ছেলে-ছোকরার সঙ্গে রাগারাগী করা তোমার উচিত হয় না। দেখিতেছি, এখনও তুমি হাঁপাইতেছ; এখন আর তোমার বাড়ীতে গিয়া কাজ নাই, আমার বাড়ীতেই চল, বাড়ী যাওয়া যদি একান্ত আবশ্যক বোধ কর, খানিকক্ষণ ঠাণ্ডা হইয়া সন্ধ্যার পরে যাইতে পার; আমি বরং তোমাকে গাড়ী করিয়া বাড়ীতে রাখিয়া আসিব; আর যদি বাড়ীতে কোন বিশেষ কার্য্য না থাকে, তবে আজ আমার বাড়ীতে রাত্রি যাপন করিবে।"

বাড়ীর কর্ত্তার নিকট বিদায় লইয়া হরিহর বাবুর সঙ্গে গিরিজা বাবু সে বাড়ী হইতে বাহির হইলেন।

একাদশ কল্প।

স্বদেশী প্রস্তাব,—দ্বিতীয় বৈঠক।

বহুবাজারের বৈঠকের সাত মাস পরে মাঘ মাসে দ্বিতীয় সপ্তাহে শ্যামবাজারের একটী অপ্রকাশ্য গলির মধ্যে প্যারীমাধব পাঠকের বাড়ীতে দ্বিতীয় বৈঠক। সে বৈঠকটীও বৈকালে বসিয়াছিল। পূর্ব্বে বলা হয় নাই, পূর্ব্বকথিত গিরিজাশেখর মল্লিকের বাড়ী শ্যামবাজারে; তিনিও সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সভ্যসংখ্যা দ্বাদশ জন মাত্র। তন্মধ্যে সাত জন স্বদেশী পক্ষ, অবশিষ্ট পাঁচ জন কতক কতক বিপক্ষ।

গৌরচন্দ্রিকার পর তর্কবিতর্ক আরম্ভ হইল। বহুবাজারের বৈঠকে যে সকল কথা আলোচনা হইয়াছিল, সেইভাবে কতকগুলি কথার বাগ্‌বিতণ্ডা হইবার পর গিরিজাবাবু কথা তুলিলেন, মঙ্গলকার্য্যে যদি দলাদলি আরম্ভ হয়, তাহা হইলে সে কার্য্যে সিদ্ধিলাভ নিতান্ত দুরূহ হইয়া উঠে, আমাদের দেশে ঐক্যের অভাব; পিতা-পুত্রে, সহোদরে-সহোদরে, স্ত্রী-পুরুষে অনৈক্য দেখা যায়; একটা কোন শুভানুষ্ঠানে সকলের ঐক্যভাব থাকা বড় আবশ্যক।

স্বদেশী পক্ষের মধ্যে একটী বাবু ছিলেন, তাহার নাম মোক্ষদাচরণ সেনগুপ্ত। দিব্য গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া, তিনি বলিলেন, "যাহা আপনি বলিতেছেন, তাহা অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত;

ঐক্যবিরহে এতাদৃশ কার্য্য কদাচ সুসম্পন্ন হইতে পারে না ; কিন্তু আমাদের ঐক্য হইয়াছে ; বন্দে মাতরম্ মন্ত্রে সকলেই দীক্ষিত ; কেবল আমাদের মধ্যেই ঐক্য আসিয়াছে, তাহাও নয় ; শিক্ষিত মুসলমান ভ্রাতারাও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেছেন। এরূপ ঐক্য আমরা বহুদিন দেখি নাই। ইহাতেই আশা হইতেছে, অবশ্যই আমরা সিদ্ধমনোরথ হইতে পারিব।"

গিরিজা।—হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য হইয়াছে, শুনিতেছি বটে কিন্তু এই ঐক্য কতদিন থাকিবে, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। হিন্দুর প্রতি এদেশের মুসলমানগণের চির-বিদ্বেষ ; এক পক্ষের বিদ্বেষে দ্বিতীয় পক্ষও ঠাণ্ডা থাকিতে পারে না, সম্পূর্ণ বিদ্বেষভাব না আসুক, অনেক বিষয়ে মতভেদ ও কার্য্যভেদ হইয়া থাকে।

মোক্ষদা।—এবারে আর সেরূপ হইবে না। যাঁহারা বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের আস্বাদন পাইয়াছেন, তাঁহাদের মন টলিবে না ; সকলেই আমরা একযোগে দেশের কল্যাণ সাধন করিতে পারিব।

গিরিজা।—বন্দে মাতরম্ মন্ত্রটী কি ?—ভক্তিপূর্ণ মাতৃভূমির সেবা করা,—ভক্তিভাবে মাতৃপূজা করা। এ মন্ত্রটী যে বঙ্কিম বাবু শিখাইয়া দিয়াছেন, এমন কথা বলা যায় না। বহু প্রাচীন ঋষিবাক্য আছে,—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" সেই মহামন্ত্রের মহিমা থাকিতেও দেশের মধ্যে কতদূর অনৈক্য ঘটিয়াছে, কত অনর্থ বাধিয়াছে, মাতৃভূমির প্রতি কত লোকের অনাদর ও অবহেলা জন্মিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে লোমহর্ষণ উপস্থিত হয়।

মোক্ষদা।—যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা স্বতন্ত্র কথা, এখন যাহা হইতেছে, যেরূপ ভাবগতিক দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আর অনৈক্য ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

গিরিজা।—সম্ভাবনা নাই বলিতেছ, কিন্তু ইতিমধ্যেই বিষম দলাদলি উপস্থিত হইয়াছে। সৌরাষ্ট্রনগরে এ বৎসর কন্‌গ্রেস্ বসিয়াছিল, কন্‌গ্রেস্‌টী "জাতীয় মহাসমিতি" নামে পরিচিত। গত বাইশ বৎসরকাল এই সমিতির কার্য্য এক প্রকার নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইয়াছে। কিন্তু এ বৎসর ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে ভয়ঙ্কর গোলযোগ ঘটিয়াছে। বিলক্ষণ দলাদলি বাধিয়াছে। কেবল বাঙ্গালীর কথা নহে, মহাসমিতিতে ভারতের নানা দেশের লোক একত্রিত হন। দুই একটী সাহেবও হিতাভিলাষে যোগ দেন। বলিতে হৃদয় কম্পিত হয়, সেই সমিতিতেই ঘোরতর দলাদলি! গঙ্গাধর তিলক, রাসবিহারী ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেশহিতৈষী লোক যেখানে সম্মিলিত, সেখানে দলাদলি হওয়া বড়ই পরিতাপের বিষয়। সমিতির মধ্যে দুটী দল।—এক দলের আখ্যা নরম, দ্বিতীয় দলের আখ্যা গরম। নরম দল বক্তৃতা করিয়া ইংরাজ গভর্ণমেন্টের নিকটে সম্ভবমত ক্ষমতা চাহিয়া লইতে অভিলাষী; গরম দল বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের সাধনায় নিজে নিজেই স্বাধীনতা লাভে অভিলাষী! দুইদলে কথা কাটাকাটী করিয়া দলাদলি করেন নাই, লাঠী, চেয়ার, এমন কি, পাদুকা পর্য্যন্ত ছোড়াছুড়ি হইয়াছিল; পুলিস আসিয়া সভা ভঙ্গ করিয়া না দিলে, শান্তিরক্ষার চেষ্টা না করিলে, হয় ত দুই একটী প্রাণীর প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িত। বলুন দেখি,

এ প্রকার দলাদলি যেখানে ঘটিয়াছে, সেখানে অপর সাধারণের ঐক্য বজায় থাকিবার আশা কতদূর ?

মোক্ষদা।—দলাদলি অবশ্য মিটিয়া যাইবে, অবশ্যই সামঞ্জস্য হইবে। বড়লোকের হিতাহিত বিবেচনাশক্তি আছে। দলাদলি করিয়া তাঁহারা কখনই বেশীদিন পৃথক হইয়া থাকিবেন না, কখনই স্বদেশের কল্যাণে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিবেন না।

যাঁহারা যে পক্ষের লোক, হস্ত উত্তোলন করিয়া তাঁহারা সেই পক্ষের সিদ্ধান্তেই সায় দিলেন। নিশ্বাস ফেলিয়া গিরিজা বাবু বলিলেন, "আপনারা যাহাই বলুন, যাহাই করুন, লক্ষণ দেখিয়া আমার কিন্তু বড়ই আক্ষেপ হইতেছে। দেশের মঙ্গলের জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে দলাদলি, এটা আমি অশুভ লক্ষণ মনে করি। লোকের দোষে ভাল চেষ্টা মন্দ হইয়া দাঁড়ায়, জানি না, ইহা কি প্রকার ভবের খেলা ?"

মোক্ষদা।—ভবের খেলা সন্দেহ নাই, কিন্তু নূতন প্রকার ভবের খেলা, আমি স্বীকার করি না। খেলাতে ভাল-মন্দ থাকেই থাকে, জয়-পরাজয় থাকেই থাকে ;—আগা-গোড়া ভাল খেলা কিম্বা আগা-গোড়া মন্দ খেলা এই ভব-সংসারে দৃষ্ট হয় না। সুরাটে জাতীয় সমিতিতে একটা অপ্রিয় ঘটনা হইয়াছে, ভ্রম ভঞ্জন হইলে তাহা সুধরাইয়া যাইবে, এমন আশা আমরা অবশ্যই রাখি।

গিরি।—আশা আপনারা অবশ্যই রাখিতে পারেন, আমিও আশা রাখি, জগৎ-সংসারে সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ অবিচ্ছেদে আশার দাস, আশার দাসী ;—একটা অপ্রিয় ঘটনায় পুনরায় প্রিয় ঘটনার আশা আছে ; কিন্তু একটা ত নয়, দলাদলির দৃষ্টান্ত

অনেক। যাঁহারা সমাজ দর্শন করেন, তাঁহারা সকলেই দলাদলির ইতিহাস অবগত আছেন। সমাজের দৃষ্টান্ত এখন উল্লেখ করিবার সময় নয়, যাহা ঘটিতেছে, তাহা ধরিয়াই আপনাকে আমি একটু বুঝাইব। বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোক শ্লাঘা করিয়া বলিয়াছেন, হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য হইয়াছে, হিন্দু-মুসলমানে "বন্দে মাতরম্" বলিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতেছে, তবে আর কার্য্যসিদ্ধি হইবার বিঘ্ন কোথায়? হাঁ, হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য হইয়াছে; কিন্তু সে ঐক্য কতদিন স্থায়ী হইবে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। ঢাকার একজন নবাবের মন্ত্রণায় অথবা আদেশে পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষতঃ ময়মনসিংহ জেলায় যে প্রকার অনর্থ ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা বোধ হয় আপনি বিস্মৃত হন নাই। সে প্রকার ঐক্য যদি শুভকর হয়, তবে অশুভ কাহাকে বলে, তাহা আমি সহজ বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিব না।

মোক্ষদা।—যাহাদের শিক্ষার অভাব আছে, তাহারা মঙ্গলামঙ্গল বুঝিতে পারে না; যাহারা অশিক্ষিত লোকদিগকে কোন পথে নাচাইয়া দেয়, তাহাদের অবশ্যই কোন প্রকার স্বার্থ থাকে; যাহারা সেই স্বার্থপর লোকদিগের উত্তেজনা মতে মাতিয়া উঠে, তাহাদিগকে আমি মানুষের মধ্যেই গণনা করি না; তাহাদের দলাদলিতে আমাদের কোন প্রকার অনিষ্ট হয়, ইহাও আমি স্বীকার করি না। বাস্তবিক বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ উপলক্ষে দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে, ইহাই আমার বিশ্বাস।

গিরি।—(হাস্য করিয়া) তবে কেন আপনারা লর্ড

কর্জ্জনের নিন্দা করিয়াছিলেন? এখন যে উৎসাহে আপনারা দেশের মঙ্গলে উৎসাহিত হইয়াছেন, লর্ড কর্জ্জনের ঐ প্রস্তাব হইবার পূর্ব্বেও ত সেইরূপ উৎসাহ দেখাইতে পারিতেন; তাহা আপনারা দেখান নাই। অঙ্গচ্ছেদ, অঙ্গচ্ছেদ বলিয়া একটা তুফান উঠিয়াছিল। বাস্তবিক তাহা স্মরণ করিলেও হাস্যের উদয় হয়।

মোক্ষদা।—অঙ্গচ্ছেদের নামে আপনার হাস্যের উদয় হয়, এটা আমি ভাল করিয়া বুঝিলাম না।

গিরি।—হাস্যের উদয় না হইয়া কিসের উদয় হইলে আপনি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেন? পয়গম্বর মহম্মদ নবির দৌহিত্র হাসেন হোসেনের শোচনীয় মৃত্যুর পর মুসলমানেরা যে প্রকার বুক চাপড়াইয়া, চুল ছিঁড়িয়া ক্রন্দন করিয়াছিল, এখনও সেই উপলক্ষে মুসলমান জাতি মহরম পর্ব্বে যেরূপ শোক প্রকাশ করে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদে সেইরূপ বুক চাপড়াইয়া ক্রন্দন করিলেই কি বর্ত্তমান অবস্থাটা আপনার বুঝিবার সুবিধা হয়?

মোক্ষদা।—আপনি কি বলিতেছেন? বুক চাপড়াইয়া ক্রন্দন করাই কি আমাদের কার্য্য দেখিতেছেন?

গিরি।—নহে ত কি? যে দিনটীতে বঙ্গবিভাগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই দিনটীকে মহা বিষাদের দিন মনে করিয়া আপনারা অনেক প্রকার শোকলক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন। ঘরে ঘরে উপবাস আরম্ভ হইয়াছে; রন্ধন পর্য্যন্ত বন্ধ। ইহা কি বিষাদের লক্ষণ নহে?

মোক্ষদা।—আমাদের জন্মভূমিকে দুইখণ্ডে বিভক্ত করা

নিশ্চয়ই বিষাদের হেতু। লর্ড কর্জ্জন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া আমাদের বিষাদের কারণ জন্মাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

গিরি।—(হাস্য করিয়া) সেটা আপনাদের বুঝিবার ভ্রম। জন্মভূমির অঙ্গচ্ছেদ, এটা বাস্তবিক কি ব্যাপার, তাহা কি আপনি আমাকে বুঝাইতে পারেন? লর্ড কর্জ্জন কি বঙ্গের অর্দ্ধাঙ্গ-ছেদন করিয়া, সেই অঙ্গটী মাথায় করিয়া সমুদ্র-পারে চলিয়া গিয়াছেন? ভূমি-লক্ষ্মীর অঙ্গচ্ছেদ কি প্রকার? মনে করুন, অখণ্ডমণ্ডলাকার পৃথিবী; সেই পৃথিবী পূর্ব্বে তিনখণ্ডে বিভক্ত ছিল, তাহার পর কলম্বস্ আর একখণ্ড আবিষ্কার করাতে চারিখণ্ড হইয়াছে। সেই চারিখণ্ড আবার কত খণ্ডে বিভক্ত, ভূগোলশাস্ত্র তাহা বুঝাইয়া দেয়। সকল খণ্ডের কথা এখানে আমি তুলিব না, আমাদের ভারতভূমি কত খণ্ডে বিভক্ত আছে, তাহা গণনা করিয়া দেখুন। ইংরাজেরা আপনাদের শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডের সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। বোম্বাই-প্রেসিডেন্সি, মান্দ্রাজ-প্রেসি-ডেন্সি, বঙ্গ-প্রেসিডেন্সি, উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ, পঞ্জাব-প্রদেশ ইত্যাদি ইত্যাদি, যখন এই সকল বিভাগ হয়, তখন কি দেশের লোকেরা ভারতের "অঙ্গচ্ছেদ অঙ্গচ্ছেদ" বলিয়া কাঁদিয়া ভাসা-ইয়া ছিলেন?

মোক্ষদা।—আপনি বেশী কথা বলিতেছেন। মূলকথা ছাড়িয়া তর্ক বাড়াইবার অভিপ্রায়ে আপনি বিস্তর শাখাপল্লব সংগ্রহ করিতেছেন। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদে কতকটা মন্দফল হইবার আশঙ্কা আছে, কিন্তু যেটা শুভফল, সেইটাই বুঝিয়া লইতে হয়। দেশের লোকেরা স্বদেশী বস্ত্র প্রস্তুতকরণে আগ্রহবান

হইয়াছেন, স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করিবার জন্য সকলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছেন, স্বদেশী জিনিসের কারবারে অনেকেরই মতি হইয়াছে, ইহাই শুভলক্ষণ।

গিরি।—শুভলক্ষণ, ইহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, এত মূর্খ আমি নহি। তবে কি না, কারবারে বঙ্গবাসীর মতের স্থিরতা নাই, নিজের নিজের কার্য্যের উপরেও অনেকের বিশ্বাস নাই। কতকগুলি কারবারী লোকের ধারণা হইয়াছে, বাঙ্গালীর নামে কারবার খুলিলে সাধারণ খরিদ্দারের ততটা ভক্তি দাঁড়ায় না; সেই ধারণার বশে কতিপয় বাঙ্গালী দোকানদার আপনাদের দোকানের মাথায় মাথায় ইংরাজী নামের সাইনবোর্ড ঝুলাইতেছেন। ব্রাউন এণ্ড কোং, ক্যাটারিং এণ্ড কোং, ব্লাকম্যান এণ্ড কোং, হোয়াইটম্যান এণ্ড কোং, রেডম্যান এণ্ড কোং ইত্যাদি দর্শন করিয়া মনে হয়, হয় ত সাহেব, কিন্তু যাঁহারা ভিতরের খবর রাখেন, তাঁহারা জানেন, সাইনবোর্ডের নীচে কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি বিরাজিত। এখন বিবেচনা করুন, আত্মবিশ্বাসে যাঁহাদের মন টলে, শীঘ্র কি তাঁহারা সাহেবী কারবার কমাইয়া দিতে সমর্থ হইবেন?

মোক্ষদা।—যাহারা ঐরূপ সাইনবোর্ড দেয়, তাহাদের কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান নাই। ইংরাজেরা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই কারবার শিক্ষা করে, সুতরাং তাহারা কারবারী জাতি; মহাবীর নেপোলিয়ান সাধারণ ইংরাজ জাতিকে "দোকানদারের জাতি" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন;—দোকানদারের জাতির সহিত কারবারে প্রতিযোগীতা করা আজিকার দিনে অন্যজাতির সাধ্য নয়, সেই কথাই আমি বলিতেছি। আরও বলিতেছি,

ভবের খেলায় অনেক প্রকার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনার সম্মিলন আছে। ভব-রঙ্গভূমিতে নাগরদোলা ঘুরিয়া থাকে ;—উত্থান আর পতন। আমরা বাঙ্গালী, আমরা যদি সেই নাগরদোলায় ঘূরিতে ঘূরিতে ক্রমশঃ উর্দ্ধদিকে উঠিতে পারি, তাহা হইলেই মঙ্গল। স্বদেশী কারবারে হিংসাদ্বেষপরিশূন্য হইয়া, দলাদলি ত্যাগ করিয়া, বাহাদুরী লইবার আশা ভুলিয়া, আমরা যদি ক্রমশঃ মঙ্গলের দিকে ধাবিত হইতে পারি, তবে আমরা একদিন বাঙ্গালী জাতির গৌরব বাড়াইতে পারিব, বাঙ্গালীর নামে গৌরবপতাকা উড়াইতে পারিব, এই বিশ্বাসের উপর স্থির থাকিয়া, যাহাতে আমরা কায়মনে মাতৃপূজা করিতে পারি, তাহারই চেষ্টা করা উচিত ; তাহা হইলেই বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের সাধনা সার্থক হইবে ; সকলকেই আমরা বুঝাইতে পারিব, জয় লাভ করাই প্রশংসনীয় ভবের খেলা।

মজলিসে লোক যতগুলি উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই তখন দাঁড়াইয়া উঠিলেন ; করজোড়ে উর্দ্ধমুখে চাহিয়া সকলেই সমস্বরে বলিলেন, "বন্দে মাতরম্।" গৃহমধ্যে প্রতিধ্বনিত হইল, "বন্দে মাতরম্।" সকলেই একবাক্যে উচ্চারণ করিলেন, সংসারে জয়লাভ করাই উচ্চ অঙ্গের ভবের খেলা।

মজলিস্ ভঙ্গ হইল। গিরিজাশেখরের সহিত কোলাকুলি করিয়া সকলেই সানন্দে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন।

দ্বাদশ কল্প।

ধর্ম্মের জয়।

পাঠক মহাশয়েরা দর্শন করিয়াছেন, হলধরপুরে হরকান্ত রায়ের ধর্ম্মের সংসারে কিছুদিন চক্র পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, সেই পরিবর্ত্তনে কিছুদিনের জন্য সেই সংসারে দুর্ভাগ্যের ছায়া পড়িয়াছিল; সেই ছায়া অপগত হইয়া পুনরায় সৌভাগ্য-সূর্য্যের উদয়। সেই সময় হইতে বাইশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। বঙ্গাব্দ ত্রয়োদশ শত বিগত, চতুর্দ্দশ শতাব্দী সমাগত। সূর্য্যকান্তবাবু ধর্ম্মবলে মা কমলার প্রসন্নতা লাভ করিয়াছেন; নষ্ট সম্পত্তিগুলি উদ্ধার করিয়াছেন, কনিষ্ঠ সহোদরকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া স্বগৃহে আনয়ন করিয়াছেন; চন্দ্রকান্তের দ্বিতীয়বার বিবাহ হইয়াছে, পুত্র জন্মিয়াছে, যে সকল পুত্র-কন্যার বিবাহের বয়স হইয়াছিল, তাহাদের বিবাহ হইয়াছে, সারদা-সুন্দরী পুত্রের বিবাহ দিয়া নববধূর মুখ দেখিয়াছেন, কন্যাটীর বিবাহ দিয়া উপযুক্ত জামাতা প্রাপ্ত হইয়াছেন; সূর্য্যকান্তবাবু পূর্ব্ববঙ্গ প্রদেশের একটী জেলায় একখানি নূতন জমিদারী খরিদ করিয়াছেন, সেই জমিদারী সারদার স্বামী শচীন্দ্রশেখরের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে; জনার্দ্দন ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র সিদ্ধেশ্বর জমিদারী সেরেস্তায় কিতাবতী কার্য্যে নৈপুণ্য লাভ করিয়া শচীন্দ্রের জমিদারীর নায়েব হইয়াছেন, শচীন্দ্রশেখর জমিদার হইয়াছেন, রাধারাণী, সারদাসুন্দরী ও শচীন্দ্রশেখর সপরিবারে

হলধরপুরে পরমসুখে বাস করিতেছেন; জনার্দ্দন ঠাকুরের দুটী বিধবা পুত্রবধূ সূর্য্যকান্তবাবুর বাড়ীতেই সুখে রহিয়াছেন। সিদ্ধেশ্বর ইতিপূর্ব্বে একবার পরমহংসপুরে গিয়া পৈতৃক ভদ্রাসনখানি একজন প্রতিবাসী ব্রাহ্মণকে বিক্রয় করিয়াছেন, গৃহে যে সকল সামান্য জিনিস-পত্র ছিল, সেইগুলি আর শালগ্রামশিলাটী হলধরপুরে লইয়া আসিয়াছেন। সকলেই সুখী।

জটাধারী বিশ্বাস চিরজীবনের জন্য দায়মালে গিয়াছিল, সে আর ফিরিয়া আইসে নাই, মরিয়াছে কি বাঁচিয়া আছে, তাহারও সংবাদ নাই। উমানাথ তরফদার, ভবশঙ্কর সেন আর তাহাদের সঙ্গী নয়জন দশ দশবৎসর জেল খাটিয়া দেশে আসিয়াছিল; ঘুঘুর বাসায় আগুন লাগিয়াছে, তাহাদের ঘর বাড়ী বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, স্বগ্রামে থাকিবার স্থান না পাইয়া, ফরিদপুর জেলায় এক জঙ্গল মধ্যে একটা ডাকাতের দলে ভর্ত্তি হইয়াছিল, ডাকাতী করিয়া ধরা পড়াতে আবার কারাগারে প্রবেশ করিয়াছে; জটাধারীর পুত্র প্রাণনাথ বিশ্বাস সাতবৎসর পরে কারাগার হইতে খালাস পাইয়া কোথায় গিয়াছে, সংবাদ নাই। পাপের প্রায়শ্চিত্ত যে প্রকারে হয়, পুণ্যের পুরস্কার যে প্রকারে হয়, পাঠকগণ এই আখ্যায়িকায় ক্রমে ক্রমে তাহা দর্শন করিবেন। এক্ষণে আর দু-একটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়াই আমরা আখ্যায়িকার উপসংহার করিব।

ত্রয়োদশ কল্প।

ইহারা কে ?

১৩১৪ সাল, ১৯শে মাঘ, রবিবার। এইদিন অর্দ্ধোদয় যোগ। মাঘ মাসের অমাবস্যাতে রবিবার পড়িলে, সেইদিন ব্যতীপাত যোগ ও শ্রবণা নক্ষত্র হইলে অর্দ্ধোদয় যোগ হইয়া থাকে, এবৎসর তাহাই হইয়াছিল। সূর্য্যকান্তবাবু ভ্রাতার সহিত স্বপরিবারে এই যোগে কালীঘাটে আদি-গঙ্গায় স্নান করিবার সংকল্পে ১৫ই মাঘ তারিখে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, পটলডাঙ্গার নিকটে একখানি প্রশস্ত বাড়ী ভাড়া লইয়া বাস করিতেছিলেন, যোগের দিন তাঁহারা সকলেই কালীঘাটে যান।

চন্দ্রকান্তবাবু ইতিপূর্ব্বে কোন প্রকার যোগে কালীঘাটে গঙ্গাস্নান করেন নাই, অর্দ্ধোদয় যোগে কালীঘাটে মহা জনতা; সেই সমারোহ দেখিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল জন্মে; স্নান, আহ্নিক, দান, পূজা ইত্যাদি সমাধা করিয়া, আহারাদির পর তিনি কালীমন্দির হইতে ভবানীপুরে বলরাম বসুর ঘাট পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করেন। বেলা যখন চতুর্থ ঘটিকা অতীত, সেই সময় তিনি একাকী বাহির হন। শীতকাল, অঙ্গে জামাযোড়া, তাহার উপর মূল্যবান কাশ্মীরী শাল, মস্তকে একটি সূক্ষ্ম তাজ, তাহার উপর দিয়া দাড়ীর নীচে পর্য্যন্ত একটী রেশমীর কম্ফর্টার বাঁধা, চক্ষু ও নাসিকা ভিন্ন মুখের সর্ব্বাংশই ঢাকা; হস্তে একগাছি গজদন্তমণ্ডিত সুরঙ্গিণ যষ্টি।

কালীঘাট রোডের সহিত যেখানে বলরাম বসুর ঘাট রোড মিলিত হইয়াছে, চন্দ্রকান্তবাবু জনতা ভেদ করিয়া, সেইস্থানে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে এক ভিখারিণী তাঁহার নিকটে আসিয়া "বাবা, একটী পয়সা, বাবা, একটী পয়সা" বলিতে বলিতে ক্রন্দন করিতে লাগিল। চন্দ্রকান্তবাবু অনেকক্ষণ তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন; অনেকক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া যেন তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইল; আপন মনে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এই স্ত্রীলোকটিকে পূর্ব্বে যেন কোথাও দেখিয়াছি। কে এ? মস্তকের কেশগুলি রুক্ষ রুক্ষ, শরীর জীর্ণ শীর্ণ, পরিধানে ছিন্ন মলিন বস্ত্র, মুখ বিশুষ্ক, তথাপি যেন কতকটা চেনা চেনা বোধ হইতেছে। কে এ—আবার যেন কি তাঁহার মনে হইল; আবার তিনি ভাবিলেন, সেই বটে। হয় সেই স্ত্রীলোক, না হয় ত এক চেহারার দুইজন হওয়াই সম্ভব; দুএর এক নিশ্চয়ই। আমি পূর্ব্বে ইহাকে কোথাও দেখিয়াছি, কিন্তু কোথায়, তাহা ঠিক মনে হইল না। তিনি ভাবিতেছেন, এমন সময়ে কালীঘাটের দিক হইতে আর একটী স্ত্রীলোক আকাশ পানে হাত তুলিয়া তাঁহার নিকটে ছুটিয়া আসিল; "ধনপুত্রে লক্ষ্মী লাভ হোক বাবা! অর্দ্ধোদয় যোগ বাবা! আমি বড় গরীব বাবা! একটী পয়সা দাও বাবা!" এই সব কথা বলিতে বলিতে সেই স্ত্রীলোক বিস্তর কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল।

চন্দ্রকান্তবাবু তাহার মুখপানে চাহিয়া যেন একটু চমকিয়া উঠিলেন; ভাবিলেন, কি আশ্চর্য্য! এটা কি মায়ারাজ্য? ইহাকেও যেন আমি কোথাও দেখিয়াছি মনে হইতেছে ঠিক একরকম চেহারা! এক চেহারার দুইজন স্ত্রীলোক।—না, ঠিক

সেই!—দুটী ভিখারিণীই যেন আমার পূর্ব্বের চেনা।—কারা এরা?—ভাবিতে ভাবিতে ঘন ঘন চক্ষু ফিরাইয়া বারম্বার দুইজনের শুষ্ক মুখ বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিলেন;—যে স্ত্রীলোকটী শেষে আসিল, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া অকস্মাৎ অস্ফুটস্বরে আপনাআপনি বলিয়া উঠিলেন, না,—না,—ভুল নয়;—ঠিক সেই,—ঠিক সেই মালাবতী।

চতুর্দ্দিক হইতে অনেক লোক ভিড় করিয়া আসিতেছিল; অনেকেই ভিখারী, অনেকেই ভিখারিণী; চন্দ্রকান্তবাবু অন্য-মনস্কভাবে তাহাদের সম্মুখে দুই-একটা করিয়া পয়সা ছড়াইয়া দিতেছিলেন, ভিখারীরা তাহা কুড়াইয়া লইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু পূর্ব্বকথিত দুটী স্ত্রীলোককে বাবু তখন কিছুই দিলেন না, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বারবার তাহাদের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; ভাবনার স্রোত প্রবল হইল। তিনি পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন, চেনা,—অবশ্য চেনা, এক চেহারার দুইজন লোক হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বদা সেরূপ দেখা যায় না, ইহারা দুইজন, ইহাদের মত আরও দুইজন ছিল, কিম্বা এখনও হয় ত আছে, এমনও মনে করিতে পারি না; যাহাদিগকে আমি দেখিয়াছিলাম, ইহারাই তাহারা. তাহাতে আর ভুল নাই। যখন আমি দেখিয়াছিলাম তখন ইহাদের বয়স অল্প ছিল, এখন যেন প্রাচীনা হইয়াছে দুরবস্থায় পড়িলে মানুষকে যত প্রাচীন দেখায়, বাস্তবিক তত প্রাচীন তাহারা নয়; ইহাদের বয়ঃক্রম বোধ হয় যেন পঞ্চাশ বৎসর, কিন্তু মুখের ভাব দেখিলে বোধ হয়, এখনও পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই, দুই-পাঁচ বৎসর বাকী আছে। আমার মনে হইতেছে,

আমি যখন কলিকাতায় ছিলাম,সেই সময়ে দেখাশুনা হইয়াছিল, এটাও বিশ বৎসরের অধিক দিনের কথা; নিশ্চয়ই তাহারা এই। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে চঞ্চল চক্ষু ঘুরাইয়া তিনি আরও দুইবার সেই দুইজনের মুখপানে দৃষ্টিস্থাপন করিলেন। দক্ষিণ দিক হইতে যে স্ত্রীলোকটী শেষে আসিয়াছিল, ভাল করিয়া তাহার মুখ দেখিয়া তিনি কিছু বিমনা হইলেন; পুনর্ব্বার মৃদুকণ্ঠে আপন মনে বলিলেন, ওঃ! সত্যই সেই মালাবতী। ইহাকে দেখিয়া আমার কষ্ট হইতেছে। শীঘ্র শীঘ্র তাহাকে বিদায় করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে পকেট হইতে তিনি একটী টাকা বাহির করিলেন।

এই অবসরে শেষোক্ত স্ত্রীলোকটী প্রথমা স্ত্রীলোকের দিকে চাহিল, এতক্ষণ চাহিয়া দেখে নাই, এইবার প্রথম দৃষ্টিপাত; দেখিবামাত্র যথাসাধ্য দ্রুতপদে ছুটিয়া আসিয়া সেই স্ত্রীলোকের কণ্ঠধারণ পূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "দিদি, তুমিও এখানে এসেছ? কখন এসেছ?—কবে এসেছ?—কোথায় রয়েছ?—বিধাতা আবার তোমাকে আমার চক্ষের কাছে এনে দিলেন!" প্রথমা স্ত্রীলোকের চক্ষেও জল পড়িল।

বাবু যাহাকে মালাবতী মনে করিতেছিলেন, হস্তসঙ্কেতে তাহাকে নিকটে ডাকিয়া তাহার হস্তে একটী টাকা দিলেন, উদাসভাবে বলিলেন, "চলে যাও, বড় ভিড়, লোকের চাপনে মারা যাবে,— চলে যাও।"

অল্পক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া সজলনয়নে একবার বাবুর দিকে আর একবার সেই প্রথমা রমণীর দিকে চাহিতে চাহিতে বাবুকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে দ্বিতীয় ভিখারিণী চলিয়া গেল,

দেখিতে দেখিতে ভিড়ের ভিতর মিশাইয়া গেল, বাবু আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। এইবার প্রথমা ভিখারিণীর কথা। পায়ে পায়ে নিকটবর্ত্তী হইয়া বাবু তাহাকে বলিলেন, "এখানে অনেক লোক, তুমি যদি আমার সঙ্গে গঙ্গার ঘাটের দিকে যাও, তোমাকে আমি গুটিকতক কথা জিজ্ঞাসা করি। আমার বোধ হইতেছে, যেন তোমাকে পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়া থাকিব। গঙ্গার ঘাটে যাইতে পারিবে কি?"

ভিখারিণী তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। বাবু তাহাকে সঙ্গে করিয়া বলরাম বসুর ঘাটের চাঁদনীর নিকট লইয়া গেলেন। সেখানে তখন বেশী লোক ছিল না; ভিখারিণীকে একধারে বসাইয়া, নিজেও একটু তফাতে বসিলেন; সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

ভিখারিণী কাঁদিল। সান্ত্বনা করিয়া বাবু তাহাকে দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, আশ্বাস দিয়া, পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

অশ্রুপাত করিতে করিতে গদগদস্বরে,—গদগদ অথচ ক্ষীণস্বরে ভিখারিণী বলিল, "আর কেন বাবা!—আর কেন নাম জিজ্ঞাসা কর?—নামে আর কি দরকার?—নাম আমার ডুবে গেছে!—নাম আমার নাই। দুদিন পেটে অন্ন নাই।"

বাবু বলিলেন, "কেঁদো না; তোমার অন্নের সংস্থান যাতে হয়, আমি তার উপায় কোরে দিব; তুমি কি কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে চাকরী কোত্তে রাজী আছ?"

কাঁদিয়া ভিখারিণী বলিল, "বাবা গো! তুমি আমার ধরম বাপ! পরমেশ্বর তোমাকে কাঙ্গালিনীর প্রাণরক্ষা কর্‌বার

জন্য পাঠিয়েছেন? আমার চক্ষে তুমিও একটী দেবতা! চাকরী যদি পাই, তবে ত বেঁচে চাই!"

বাবু বলিলেন, "তবে আমার সঙ্গে চল—কলিকাতায় চল; উত্তম আশ্রয় পাবে; বেশী কাজ-কর্ম্ম কিছুই কত্তে হবে না, ছোট ছোট ছেলেদের লালন-পালন কর্‌বে,—আদর-যত্ন কর্‌বে, ঘরের দুই একটা সামান্য সামান্য কাজ কর্‌বে, আর কিছুই নহে; বেশ থাক্‌বে।"

ভিখারিণী বাবুর পদধূলি লইতে যাইতেছিল, নিষেধ করিয়া বাবু বলিলেন, "আর এখানে বেশী দেরী কর্‌বার দরকার নাই, সন্ধ্যা হয়ে এলো, এইবেলা একটু আলো থাক্‌তে থাক্‌তে যাওয়া যাক।"

এক দিনের জন্য সূর্য্যকান্তবাবু কালীঘাটের গঙ্গাতীরে পাথুরেপটীতে ছোট একখানি বাড়ী ভাড়া লইয়াছিলেন, পরিবারেরা সকলেই সেই বাড়ীতে আছেন; ভিখারিণীকে লইয়া চন্দ্রকান্তবাবু সেই বাড়ীতে গমন করিলেন। সূর্য্যকান্তবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ স্ত্রীলোকটী কে? চন্দ্রকান্তবাবু উত্তর করিলেন, "ভদ্রলোকের কন্যা, কষ্টে পড়েছে, আশ্রয় দিব বোলে সঙ্গে কোরে এনেছি।"

বড়বাবু আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, ভিখারিণীকে লইয়া চন্দ্রকান্তবাবু বাসার একটী নির্জ্জন ঘরে প্রবেশিলেন। উভয়ে একস্থানে বসিয়া কথোপকথন করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, হঠাৎ কি মনে করিয়া চন্দ্রকান্তবাবু একবার উঠিয়া অন্য ঘর হইতে কতকগুলি খাদ্যসামগ্রী আনিয়া ভিখারিণীকে খাইতে দিলেন। ভিখারিণী দুই দিনের পর প্রচুর ভক্ষ্যদ্রব্য

প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হইল, সেইগুলি ভক্ষণ করিয়া এক ঘটী জল খাইয়া ঠাণ্ডা হইল। বাবু তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "নামটী তুমি বলিলে না, কিন্তু অনুমানে অনুমানে আমি তোমাকে চিনিয়াছি। কাঁদিও না, কাতর হইও না, তোমার কষ্ট থাকিবে না, দুর্ভাবনা ত্যাগ কর; যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক ঠিক উত্তর দাও।"

সন্ধ্যা হইল। যে ঘরে তাঁহারা বসিয়াছিলেন, একজন বালক সেই ঘরে একটী প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া গেল। ভিখারিণীর সহিত ছোটবাবুর কথোপকথন আরম্ভ হইল। আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে বাবু নিজের মাথার টুপি ও কম্ফর্টার খুলিয়া ফেলিয়া স্থিরনেত্রে ভিখারিণীর মুখপানে চাহিয়া গম্ভীরবদনে গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ দেখি,—স্মরণ করিয়া দেখ দেখি, আমাকে কি চিনিতে পার?"

ভিখারিণী প্রথমে শিহরিয়া উঠিল, তাহার পর স্পষ্টই যেন কাঁপিল, তাহার পর দরদরধারে তাহার চক্ষে জল পড়িল।

বাবু বলিলেন, "বুঝিয়াছি, তুমি এতক্ষণের পর আমাকে চিনেতে পারিয়াছ, পূর্ব্ব কথা ভুলিয়া যাও, তুমি ডাইমনকুমারী, মাতা-পিতার নববাসন্তী, সে পরিচয় আর তোমাকে দিতে হইবে না; কলিকাতা পরিত্যাগের পর তোমার জীবনে কি কি ঘটনা হইয়াছে, সংক্ষেপে সংক্ষেপে তাহা আমাকে শুনাও, আমি তোমার উপস্থিত কষ্ট নিবারণ করিব অঙ্গীকার করিয়াছি, সে অঙ্গীকার অবশ্যই আমি পালন করিব।"

যথার্থই নববাসন্তী, ওরফে ডাইমনকুমারী, ভিখারিণীর এই সত্য পরিচয়। চন্দ্রকান্তবাবুর প্রত্যেক প্রশ্নে থামিয়া থামিয়া,

মধ্যে মধ্যে নিশ্বাস ফেলিয়া, এক একবার কাঁদিয়া,—এক এক-বার অশ্রু মার্জ্জন করিয়া, স্তম্ভিতস্বরে ডাইমনকুমারী অনেকগুলি কথা বলিল। খাপছাড়া খাপছাড়া কথা; সে তখন যে সকল কথা বলিল, পাঠক মহাশয়েরা তাহার সামঞ্জস্য রাখিতে পারি-বেন না, অতএব তাহার সারাংশ আমরা আমাদের নিজের ভাষায় বুঝাইয়া দিতেছি।

জানবাজার হইতে দার্জ্জিলিং পর্ব্বতে যাত্রা, মাতা পিতা ভ্রাতা প্রভৃতির সহিত কিছুদিন পর্ব্বতবাস, তাহার পর একরাত্রে তাহাদের বাসাবাড়ীতে আটজন ডাকাত প্রবেশ করে, বাড়ীতে যাহারা ছিল, তাহাদের সকলকেই কাটিয়া ফেলে, যথাসর্ব্বস্ব লইয়া যায়। ডাইমনকুমারী সে রাত্রে বাসায় ছিল না; তাহা-দের বাসার কিঞ্চিৎ দূরে একটী বাবু পরিবার লইয়া বাসা করিয়াছিলেন, সেই বাবুর পরিবারের সহিত ডাইমনের আলাপ হইয়াছিল, যে রাত্রে ডাকাতী হয়.সেই দিন সন্ধ্যাকালে ডাইমন-কুমারী সেই বাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণে গিয়াছিল, রাত্রে আর বাসায় ফিরিয়া যায় নাই, ডাকাতেরা তাহাকে দেখিতে পায় নাই, তাহাতেই তাহার প্রাণরক্ষা হইয়াছে। সে রাত্রে ডাই-মনের গলায় একছড়া হার, আর দুই হাতে দুগাছা বালা ছিল, তাহাই মাত্র সম্বল। পরদিন প্রভাতে বাসার নিকটে উপস্থিত হইয়া পাল্কী হইতে নামিয়া, ডাইমন দেখিতে পায়, চারিদিকে পুলিসের লোক, চারিদিকে দর্শকলোক; ঘটনা কি, তাহা জানিতে পারিয়া ডাইমনকুমারী কাঁদিতে কাঁদিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া তথা হইতে পলায়ন করে। লজ্জার কথা হইলেও ডাই-মনকুমারী চন্দ্রকান্তবাবুর নিকটে লজ্জা ত্যাগ করিয়া সেই কথা

বলিয়াছিল। কলিকাতা ত্যাগ করিবার সময় সে পঞ্চমাস গর্ভবতী ছিল, তিনমাস পর্ব্বতবাসের পর তাহার পিতা একজন ধাত্রী ডাকাইয়া কি এক প্রকার ঔষধ সেবন করান, তাহাতেই গর্ভপাত হইয়া গিয়াছে।

কথাগুলি বলিবার সময় মধ্যে মধ্যে এক একবার ডাইমনের স্বরস্তম্ভ হইয়াছিল। কথা সমাপ্ত হইলে তাহার চক্ষের জলে অঙ্গের ছিন্নবস্ত্র সিক্ত হইয়া গিয়াছিল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া মনে মনে কি ভাবিয়া, চন্দ্রকান্তবাবু শেষকালে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সব কথা কি তোমার স্মরণ হয় ?"

ডাইমন বলিল, "স্মরণ হইলেও সে সব কথা মুখে বলিতে আমার বুক যেন ফাটিয়া যায় ; তাহা আমি বলিতে পারিব না।" আরও কিয়ৎক্ষণ মৌন থাকিয়া বাবু দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সঙ্গে আমার দেখা হইবার পর সেই সে স্ত্রীলোকটী আমার কাছে ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছিল, তোমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কথা কহিয়াছিল, তাহাকে কি তুমি চেন ? কোথায় কিরূপে তাহার সঙ্গে তোমার দেখা হইয়াছিল, সে তোমার কাছে কিরূপ পরিচয় দিয়াছিল, তাহা কি তুমি আমাকে বলিতে পার ? তাহার নাম কি, তাহা কি তুমি শুনিয়াছ ?"

নেত্রদ্বয় মার্জ্জন করিয়া ডাইমন বলিল, "দার্জ্জিলিং পর্ব্বতে শোকাবহ ঘটনার পর নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া আমি রাণাঘাটে উপস্থিত হই, হাতের বালা বিক্রয় করিয়া রাস্তা-খরচ ও খোরাকী সংগ্রহ করিয়াছিলাম ; সেই স্ত্রীলোকের সঙ্গে রাণাঘাটেই আমার দেখা হয়, সেখানকার বাজারে একখানা চালাঘরে তিন

দিন তিন রাত্রি আমি বাস করি, সেই স্ত্রীলোককেও যত্ন করিয়া নিকটে রাখি; উভয়েরই সমান দুর্দ্দশা। তাহার মুখে শুনিয়াছি, একজন জমীদারের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল, সেই জমীদারের একজন মুহুরী তাহাকে ফুস্‌লাইয়া বাহির করিয়া কামরূপ কামাখ্যায় লইয়া যায়, তাহার পর সেই মুহুরী কোথায় চলিয়া গিয়াছে, সংবাদ নাই; মুহুরীর মা তাহাকে তাড়াইয়া দেয়, সেই অবস্থায় সে ভিক্ষা করিতে করিতে কলিকাতায় আসিতেছিল, রাণাঘাটে আমার সহিত সাক্ষাৎ। উভয়েই আমরা কলিকাতায় আসি; কোথায় থাকি, সেই ভাবনা উপস্থিত হয়। জানবাজারে যে বাড়ীতে থাকিতাম, সেখানা ভাড়াটে বাড়ী, সেখানে স্থান পাইব না, সুতরাং উল্টাডিঙ্গির নিকটে একজন স্ত্রীলোকের খোলার বাড়ীতে দুইজনেই আমরা একসঙ্গে কিছুদিন ছিলাম; সে স্ত্রীলোকের অঙ্গে একখানিও অলঙ্কার ছিল না; আমার হার বিক্রয় করিয়া দিন গুজরান হয়, তাহার পর উভয়েরই ভিক্ষা অবলম্বন। তাহার নাম আমাকে বলে নাই। অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, নাম বলিতে, মা-বাপের নাম বলিতে, গ্রামের নাম বলিতে, শ্বশুরবাড়ীর পরিচয় দিতে, ক্রমাগত মাথা নাড়িয়াছিল। উল্টাডিঙ্গি হইতে আমরা যখন সহরের ভিতর আসি, সেটা প্রায় তিন মাসের কথা. সেই সময় হইতেই দুজনের ছাড়াছাড়ি।

নিশ্বাস ফেলিয়া চন্দ্রকান্তবাবু ভাবিলেন, ওঃ! আমার অনুমান ঠিক!—অভাগিনী মালাবতী। সত্যই সেই মালাবতী! আমার বিবাহিতা পত্নী! হায় হায়! ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তাহার এই দুর্দ্দশা হইয়াছে! ঠিক হইয়াছে। পরমে-

শ্বরের বিচার এইরূপ। এই রকমেই অনেক পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।

মনের চিন্তা মনেই রহিল, মালাবতী মরে নাই; গল্প রচনা করিয়া দাদাকে যাহা তিনি বলিয়াছিলেন, তাহা অবশ্যই মিথ্যাকথা, মালাবতী বাঁচিয়া আছে, ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। আর তাহার কথা ভাবিবার দরকার নাই।

ভাবনা চাপিয়া রাখিয়া চন্দ্রকান্তবাবু কিঞ্চিৎ মৃদুস্বরে ডাইমনকে বলিলেন, "ডাইমন! না—না, আর আমি তোমাকে ডাইমন বলিব না,—ডাইমনের বাঙ্গালা অর্থ যাহা, আজ অবধি আমি তোমাকে সেই নামে ডাকিব; আজ অবধি তোমার নাম হইল হীরামতি। তুমি আমাদের বাড়ীতেই থাকিবে; এখন আমাদের কলিকাতার বাড়ী নাই, পল্লীগ্রামেই থাকি, রজনী প্রভাতে দেশে চলিয়া যাইব, তুমিও আমাদের সঙ্গে থাকিবে, কোন কষ্ট হইবে না। এইখানে একটু থাক, আমি আসিতেছি।"

এই বলিয়া চন্দ্রকান্তবাবু সে ঘর হইতে বাহিরে আসিতেছিলেন, চৌকাট পার হইয়াই দেখিলেন, একজন সরকারের সঙ্গে এক বোঝা কাঠ মাথায় করিয়া একটা মুটিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল; কাঠের বোঝাটা উঠানে ফেলিয়া পয়সা লইবার জন্য মুটেটা দাঁড়াইয়া রহিল; সেই সময় দুই দিকের প্রদীপের আলো তাহার মুখের উপর পড়াতে চন্দ্রকান্তবাবু স্পষ্ট দেখিলেন, চেনা মুখ। "আমার কাছে পয়সা আছে, এই দিকে আয়", এই বলিয়া মুটেকে তিনি নিকটে ডাকিলেন। মুটে

চৌকাঠের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরের ভিতর দিকে মুখ ফিরাইয়া চন্দ্রকান্তবাবু কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন, "এসো এসো! হীরামতি! দেখ এসে, কেমন চমৎকার মুটে দেখ! দেখিলেই হয় ত চিনিবে, বিদ্যাবাগীশ মুটে, ফটিকচাঁদ বিদ্যা-বাগীশ!"

হীরামতি উঠিয়া চৌকাঠের কাছে আসিল, মুটের দিকে চাহিল, কথা কহিল না, ঘৃণায় হস্ত সঞ্চালন করিয়া মুটেটাকে শীঘ্র শীঘ্র বিদায় করিয়া দিবার ইঙ্গিত করিল। মুটে তখন তাহার পূর্ব্ব ছাত্রী ডাইমনকুমারীকে চিনিতে পারিল কি না, বলা যায় না। চন্দ্রকান্তবাবু একটী সিকি ফেলিয়া দিলেন, মুটে সেইটী কুড়াইয়া লইয়া, মাথা হেঁট করিয়া চলিয়া গেল।

রাত্রিকালে আহারাদি করিয়া সকলে স্ব স্ব স্থানে শয়ন করিলেন। পরদিন প্রভাতে কলিকাতায় যাত্রা, সেই দিন অপরাহ্নে হলধরপুরে যাত্রা। সঙ্গে রহিল হীরামতি।

উপসংহার।

সকলে স্বদেশে স্বগৃহে উপস্থিত হইলেন। হীরামতি তাঁহাদের বাড়ীতেই রহিল, পরিবারস্থ সকলেই তাহাকে হীরামতি বলিয়া জানিলেন। একদিন পরে সরস্বতী পূজা, সে বৎসর সময় অভাবে ঘটা হইল না, তথাপি সম্ভবমত সমারোহে দেবী বীণাপাণির অর্চ্চনা হইল, অনেক লোকজন খাইল; রাত্রে যাত্রা কবি হইল না, কেবল একদল চণ্ডীর গান! রাত্রি একপ্রহর পর্য্যন্ত চণ্ডীমঙ্গল কীর্ত্তন করিয়া গায়কেরা সকলের সন্তোষ জন্মাইল।

হরকান্তবাবুর ধর্ম্মের সংসার সর্ব্বসুখে সমুজ্জ্বল। সারদাসুন্দরীর ধর্ম্মব্রত বর্ষে বর্ষে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ধর্ম্মের সংসারে কমলার কৃপা হয়, সূর্য্যকান্তবাবু সেই কৃপায় বর্ষে বর্ষে নূতন নূতন জমিদারী খরিদ করিতে লাগিলেন; কোন প্রকারেই কোন প্রকার অভাব রহিল না, সকলের মুখেই সানন্দ হাস্য, সকলের মনেই বিমালানন্দ বিরাজিত।

পাঠক মহাশয় এই আখ্যায়িকার প্রথমে এক প্রকার ভবের খেলা দর্শন করিয়াছেন, এখন এই উপসংহারে দর্শন করুন, কেমন বিচিত্র বিচিত্র ভবের খেলা! ভবের খেলার সকল অঙ্গই আশ্চর্য্য, এই আখ্যায়িকার খেলাগুলিও তরঙ্গে তরঙ্গে আশ্চর্য্য। যিনি এই ভবসংসারের অধীশ্বর, যাঁহার ইচ্ছায় এই সমস্ত ভবের খেলার সৃষ্টি, সেই ইচ্ছাময় ভবেশ্বরের শ্রীচরণে সহস্র সহস্র প্রণিপাত।

সম্পূর্ণ।